জালিয়ানওয়ালাবাগ

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
মণীন্দ্র মিত্র

আলোক চিত্র
লেখক

ছয় টাকা॥

শ্রীযুক্তা আশাদেবী আর্যনায়কম

করকমলেষু

জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতিফলক
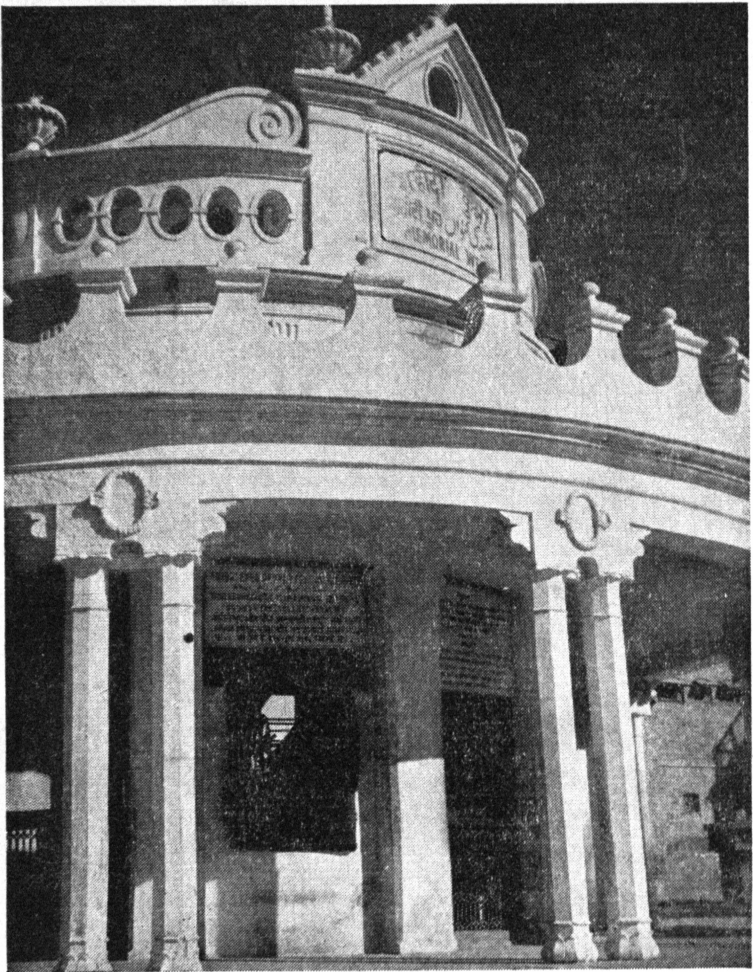
শহীদ কূপ ঃ জালিয়ানওয়ালাবাগ
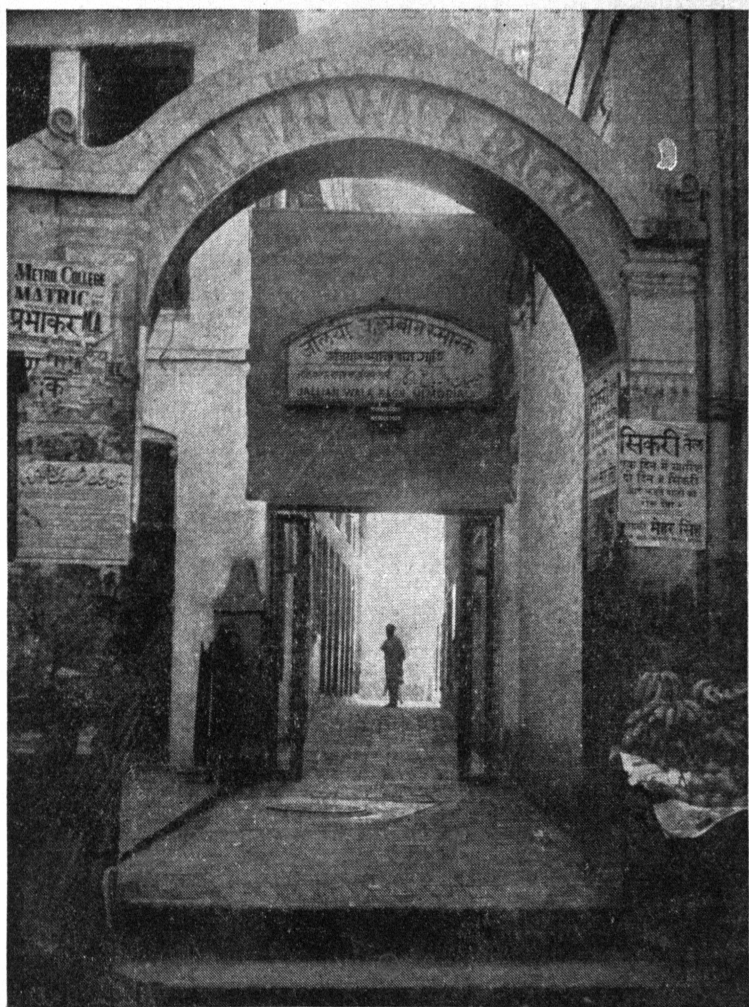
জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবেশ পথ

স্বতন্ত্রতা-কি-জ্যোতি : জালিয়ানওয়ালাবাগ

॥ ১ ॥
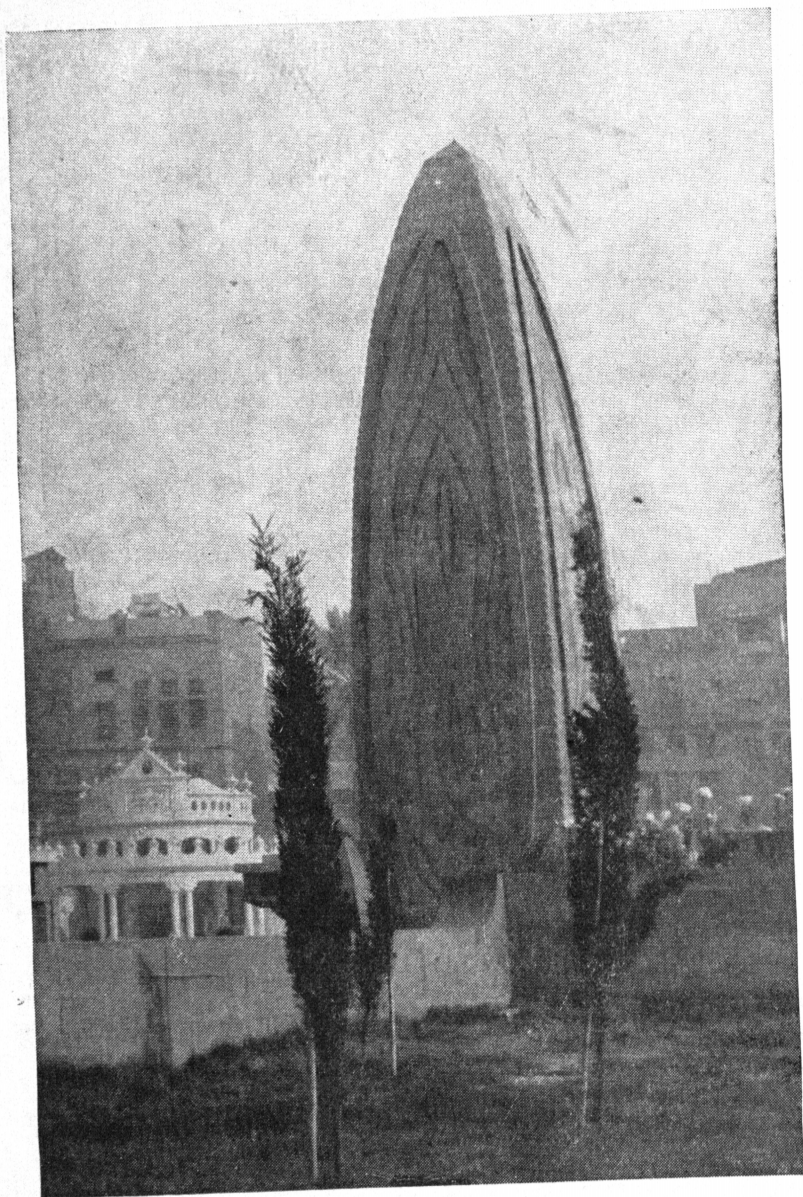
অমানিশার অন্ধকার নেমেছে সর্বনাশা প্রান্তরে।

জুড়িয়েছে দিনের দাহ. ফুরিয়েছে আর্তনাদ আর কোলাহল। এখন স্তব্ধতার বুকে মৃদু হাওয়া দিয়েছে। কালো আকাশ জুড়ে রহস্য-হাসি হাসছে তারার দল।

আর অগণিত মৃত আর মুমূর্ষুর দল পড়ে আছে ঐ প্রান্তরে।

চারপাশে ঘিঞ্জি মহল্লা। সরু সরু গলি। ছোট বড়ো দোকান-পাট। একতলা দোতলা ঠাসাঠাসি বাড়ি। সেই সব বাড়ির পিছনের দেয়াল জোড়া-জোড়া। চারদেয়ালের মাঝখানে বুকচাপা আয়তক্ষেত্র।

এখন একটি বাড়িরও দরজা খোলা নেই, একটি বাতিও জ্বলছে না কোনো দোকানে। একটি লোকও চলছে না পথে। কথা বলছে না কেউ,—বুকফাটা কান্না আর প্রচণ্ড আতঙ্ককে বুকেরই মধ্যে চেপে রেখে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে,—ঠকঠক করে কাঁপছে। বন্দুকের গুলির আওয়াজ হঠাৎ হঠাৎ নৈঃশব্দ্য আর অন্ধকারের বুকে এসে বিঁধছে,—সেই আওয়াজে চমকে চমকে উঠছে সারা মহল্লার বুক।

জনপ্রাণী নেই। গলির কোণে ঝগড়া করছে কটা কুকুর। রাস্তার ঝাপসা আলোয় তাদের নেকড়ের মতো দেখাচ্ছে। ঝগড়া করছে খাদ্য নিয়ে। নতুন খাদ্য, প্রিয় খাদ্য,—সহজে জোটেনা। মানুষের টাটকা মৃতদেহ।

সেই পথে সেই অন্ধকারে একলা চলেছে এক নারী। বিস্রস্ত বসন, খালি পা। ওড়নায় ঢাকা মুখ। ত্রস্ত পদে আলুথালু হয়ে চলেছে,—আবছা আলোয় দেখা যায় না তার পাণ্ডুর গালের অশ্রুধারা। চলেছে আর অস্ফুটস্বরে সে বলছে,—

মেরে লাল, মেরে লাল!

পথের কোণে ঘরের দাওয়ায় খাটিয়ায় বসে ছিল কজন লোক।

ফিসফিস করে কথা বলছিল। একজন ফুঁ দিচ্ছিল কলকেতে। কলকের আলোয় দেখা যাচ্ছিল তার বলিরেখাঙ্কিত মুখ, তার পাকা দাড়ি।

হঠাৎ কলকেটা নামিয়ে বুড়োটা ছুটল। দৌড়ে গিয়ে চেপে ধরল ঐ একাকিনীর হাত।

কোথা যাও? মরবে নাকি?

ছোড় দো, ছোড় দো মুঝে!

ছেড়ে দেব? পাগল হয়েছ নাকি? শিগগির আমার ঘরে এসে ঢোকো! জান্ দেবে নাকি? দেখলেই গুলি করবে,—জানো না?

ম্যয় জানতি হুঁ। লেকিন—আমাকে যেতেই হবে।

যেতেই হবে? চাপা ধমক দিয়ে উঠল বুড়ো। কোথায় যেতে হবে?

বাগকে অন্দর,—মেরে লালকে পাস্।

ছিনিয়ে নিল হাত। ফিরিয়ে নিল মুখ। আবার চলতে লাগল আগের মতো।

মাথার ওড়না খসে পড়েছে, জড়িয়ে নিয়েছে কোমরে। চলেছে নিঃসঙ্গ,—দ্বিতীয় কোনো পায়ের শব্দ নেই। অন্ধকার নির্জন গলি মুমূর্ষু সরীসৃপের মতো। দুপাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে ফিসফিস কথা,—অস্ফুট কান্নার শব্দ। সে শব্দ শুনে দাঁড়াবার সময় নেই। দূরে মাঝে মাঝে কোথাও গুলি ছুটছে, সে শব্দ কানেই বুঝি পৌঁছচ্ছে না।

গলি এসে পৌঁছলো সেই সর্বনাশা প্রান্তরের দক্ষিণ কোণে। খাড়া উঁচু দেয়াল, এককোণে একটু ফাঁক, সেই ফাঁকের কিনারে গলির শেষ। প্রান্তর নয়,—বীভৎস শ্মশানক্ষেত্র। এই রাত্রে এই নির্জনে ঐ ভয়াল শ্মশানে কে থাকে? এমন সাহস কার?

সাহস ঐ নিঃসঙ্গ নারীর। তাকে যে যেতেই হবে,—না গিয়ে তার উপায় নেই। ঐখানে অগণিত মৃত আর মুমূর্ষু মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ

পড়ে আছে। এই তমসায় সেই পুঞ্জ পুঞ্জ দেহের মধ্যে একটি দেহ তাকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে নিতে হবে।

সে দেহ তার প্রিয়তমের। সেই দেহকে জড়িয়ে ধরে তাকে কাটাতে হবে অতন্দ্র সারারাত।

সেই কালরাত্রির অভিজ্ঞতার কথা বলছিল রতনদেবী। বিচারকের সামনে নয়। বিচারের আশা কে করে? বলছিল পরপদানত দুর্ভাগা স্বজাতির কজন সমব্যথী মানুষের সামনে।

ঘরের কাজ তখন সবে আমার সারা হয়েছে,—এমন সময় আকাশ-ফাটা আওয়াজ আমার কানে এল। বন্দুকের আওয়াজ,—ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটছে যেন কোথায়। আমি চমকে উঠলাম। দাওয়া পার হয়ে ছুটে নেমে এলাম উঠোনে। পুরুষজন কেউ ঘরে নেই,—আরো দুটি মেয়েছেলে ছুটে এসে দাঁড়াল আমার পাশে। কী হয়েছে, হয়েছে কী? গলির মুখে এসে দাঁড়ালাম,—আর্ত লোক দিশেহারা হয়ে ছুটে আসছে, আর্তনাদ করছে,—তাদের বিভ্রান্ত চিৎকারের ভাষা শুনে কিছু বুঝতে পারছি নে।

যখন বুঝতে পারলাম, তখন দেখি সারা উঠোন লোকে গিজ গিজ করছে। তারা এ কোণে ও কোণে উবু হয়ে বসে আছে, দুহাতে কান চেপে ধরে ঠকঠক করে কাঁপছে, আর সেই ভিড়ের মধ্যে মেয়েদুটি চেপে ধরে আছে আমাকে। আমি শুনলাম আমার গলা,—আমি চিৎকার করছি।

যাব আমি, আমাকে ছেড়ে দাও। আমার স্বামী আছে ওখানে, আমার স্বামীকে দেখতে আমি যাব।

মুঠো করে ধরে আছে আমার গলায় জড়ানো ওড়না। কেউ আমাকে যেতে দেবে না,—এক পা বার হতে দেবে না ঘর থেকে। এ যে পাগলের দুঃসাহস!

আমি আর ছটফট করিনি। চুপ করে বসে রইলাম সেই ভয়ার্ত

ভিড়ের এক কোণে। একটু পরে মেয়েছুটি সরে গেল। আস্তে আস্তে ঘনিয়ে এল অন্ধকার আমি তখন অলক্ষ্যে বার হলাম। কোনো দিকে না তাকিয়ে চললাম লক্ষ্যপথে। ঐ বাগ,—ঐখানে আমার স্বামী আছে।

নির্জন গলি পার হয়ে পৌঁছলাম বাগের মধ্যে। অসংখ্য মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে,—মানুষের লাল রক্তে কাদা-কাদা মাটি। সেই সমস্ত মৃতদেহেব মধ্যে আমার স্বামীকে আমি খুঁজে পেলাম। স্বামী নয়,—স্বামীর মৃতদেহ।

আমি সেই মৃতদেহকে চিনতে পারলাম। ডুকরে কেঁদে উঠলাম একবার,—তারপরই কে যেন মুখ চেপে ধরল। চারধারের ঐ সব মৃত আর অর্ধমৃতের দল,—মনে হোলো তারা যেন আমার শোক দেখে ব্যঙ্গ করে এখনই হেঁকে উঠবে,—

আ ছেনাল জেনানা. শুধু তোরই স্বামী মরেছে, আর কারুর মরেনি?

তাই স্বামীর বুকে লুটিয়ে কাঁদতে আমি আর পারলাম না। শুকনো চোখে তার রক্তমাখা দেহের পাশে চুপ করে বসে রইলাম।

আমার মতো আরো কয়েকজন এসেছিল,—মৃতদেহ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল। চেনা লোকের দেহ খুঁজে পেলেই বা কী হবে,—সেই সব দেহকে তুলে নিয়ে যাবার উপায় কই? লোকজন কই, খাটিয়া কই, সময় কই? ঘুরে ফিরে চলে গেল,—যাবার আগে আমার কাছে এসে বললে,—

রাত আটটার পর আর কেউ বাইরে থাকতে পারবে না,—সরকারী হুকুম। মি ঘরে চলো।

আমি বললাম,—তোমরা এগোও, আমি এখুনি যাচ্ছি।

কিন্তু কেমন করে যাব? আমার ঘরে খাটিয়া আছে, নরম বিছানা আছে। আর আমার স্বামী পড়ে আছে রক্তমাখা মাটির

উপর,—তাকে একলা ফেলে কোন্ প্রাণে আমি চলে যাব? তাছাড়া নড়বার ক্ষমতাও যে পাচ্ছিনে! হঠাৎ শোকের আঘাতে আমার পা দুটো যেন পাথর হয়ে গেছে। শোকের পাথর-ভার দেহে মনে নিয়ে আমি আমার স্বামীর পাশে চুপ করে বসে রইলাম।

অন্ধকার নেমে এল। গ্রীষ্মরাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার। আকাশে আর আলোর আভাস মাত্র নেই। একে একে তারা ফুটছে। গাছ, পাঁচিল আর বাড়ি একাকার হয়ে যাচ্ছে কালোয়,—অদূরে বাড়ির পিছনের জানালায় টিমটিম করে জ্বলছে কয়েকটা বাতি। অনেকক্ষণ পরে সেই ঘন আলো ছায়ায় দেখি ছায়ামূর্তির মতো কে যেন এগিয়ে আসছে। জীবন্ত চলন্ত একটা মানুষ দেখে চমকে উঠে দাঁড়ালাম। সেও বোধহয় আমাকে দেখে চমকে উঠল। চাপা গলায় বললে,—

কে তুমি? এখানে রয়েছ কেন?

আমি তেমনি চাপা গলায় বললাম,—আমার কাজ আছে। তুমি আমার একটু উপকার করবে?

জড়াজড়ি একগাদা মৃতদেহের মাঝখানে আমার স্বামীর দেহ হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। অনেক দেহের রক্ত একসঙ্গে মাখামাখি। আমি বললাম,—

এই দেহটিকে একটু ধরো!

কে হয় তোমার?

আমার আপন জন।

লোকটির সঙ্গে ধরাধরি করে সেই প্রিয় দেহটিকে আমি তুললাম। একপাশে একটু শুকনো জায়গায় সরিয়ে আনলাম। সারা পিঠ জুড়ে চাবড়া চাবড়া রক্ত, চিৎ করে শোওয়াতে সেই বীভৎস রক্তকলঙ্ক ঢাকা পড়ল। মুখের রক্ত গড়িয়ে রক্তধারা নেমে শুকিয়ে উঠেছিল। ওড়না দিয়ে সেই রক্তের দাগ মুছিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম।

লোকটি মৃদু গলায় বললে,—তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে ?

আমি বললাম,—না, আমি থাকব।

একটু চুপ করে থেকে বললে,—

বেশ, তাই থাকো.—ভগবান তোমার সঙ্গে থাকুন।

কতোক্ষণ বসেছিলাম মনে নেই। হঠাৎ পাশে একটি দেহ একটু নড়ে উঠল। একটি ঘাড় যেন একটু বাঁকল,—আমার চোখে পড়ল ভয়ার্ত নিস্প্রভ জীবন্ত দুটি চোখ। একটি বালক,—তখনো বেঁচে আছে। আমি তাড়াতাড়ি তার পাশে গেলাম।

ঠোঁটদুটি একটু নড়ল। অস্ফুটস্বরে বললে,—

একটু জল !

জল ? জল কোথায় পাব এখানে ? এখানে তো শুধু রক্ত ! আমি তাড়াতাড়ি উঠলাম। পা টিপে টিপে এগোলাম। বাগের কিনারে বাজারপাড়া। সেখানে কোনো বাড়ি থেকে একটু জল যদি পাই। এক আঁজলা জলের জন্যেই বুঝি বেচারীর প্রাণটা এখনো অপেক্ষা করছে !

একটা জানলায় একটু ফাঁক,—এক চিলতে আলো। জানালার ধারে যে বসেছিল, সে সাবধানে মুখ বাড়াল। চাপা হিসহিসে গলায় বললে,—

কে তুমি, কোথায় চলেছ ?

আমি বললাম,—

একটু জল !

জল ? জল নিয়ে কী করবে ?

বাগের মধ্যে একটা ছেলে,—জিন্দা আছে এখনো। তেষ্টায় তার বুক ফাটছে !

ঐ বাগ থেকে তুমি আসছ ? আবার ফিরে যাবে ওখানে ?

তাই যাব। ছেলেটাকে জল খাওয়াতে হবে যে !

মাথা খারাপ হয়েছে তোমার! এতো রাত্রে পথে পথে ঘুরছ। মরবার শখ হয়েছে বুঝি! শিগগির অন্দর যাও!

জল দেবে না এক লোটা?

পাগল! তোমাকে জল দেওয়া মানে তো তোমাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া। পালাও, পালাও বলছি! না, দাঁড়াও, দরজা খুলছি। আশ্রয় নেবে?

না দরকার নেই।

জল পেলাম না। ছেলেটার হয়তো শুকিয়ে মরতে বেশি দেরি নেই। তবু আমাকে যেতেই হবে। দূরে শব্দ পেলাম, ভারি পায়ের শব্দ। আমি আবার অন্ধকার গলি মাড়িয়ে বাগের মধ্যে গেলাম। মৃত্যু-ময়দানে নতুন করে মরবার ভয় নেই।

কটা মানুষ তখনো কাতরাচ্ছে,—ছটফট করছে একটা ঘা-খাওয়া মহিষ। পাঁচিলের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকেছে কুকুরের পাল। তারা মড়া শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে বন্য শৃগালের মতো। আধমরা কোনো লোক হঠাৎ নড়ে চড়ে উঠলে কেমন হঠাৎ ভয়ে কেঁউ কেঁউ করে উঠছে।

আমি আবার ঘুরে ঘুরে আমার স্বামীর কাছে গেলাম। কাছে একটা বাঁশের খুঁটি পেয়েছিলাম,—সেটাকে হাতে রাখলাম কুকুর তাড়াবার জন্যে। তারপর স্বামীর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বসে রইলাম প্রত্যূষের প্রতীক্ষায়।

আমার আশেপাশে অস্ফুট আর্তনাদ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম,—ক্রমে সে সব মরণাহত মানুষের ক্ষীণ বিকৃত কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে এল। দূরে কয়েকটা ম্লান আলো চোখে পড়েছিল,—সে সব আলো একে একে নিবে গেল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল। অসংখ্য মৃত মানুষের সেই কৃষ্ণ প্রান্তরে আমি শুধু জেগে রইলাম,—আর জেগে রইল কালো আকাশের তারার দল।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখের সেই কালরাত্রি। অমৃতসর

শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগের মধ্যে সেই রাত্রি একলা অতিবাহিত করেছিল ঐ নারী,—ঐ সদ্য বিধবা রতনদেবী। তাকে ঘিরে ছিল শত শত নিরীহ মানুষের মৃতদেহ,—যাদের কয়েক ঘণ্টা আগে নৃশংস আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে পালে পালে হত্যা করা হয়েছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই হত্যাকাণ্ডের অমানুষিক বীভৎসতার তুলনা নেই।

॥ ২ ॥

পরাধীন জাতি, পরপদানত দেশ। সেই দেশের উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব। তার এক প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর অমৃতসর। সেদিন সকালবেলা বৃটিশ সেনানায়ক নিজে বেরিয়েছিলেন শহরের পথে। সঙ্গে অধীনস্থ কয়েকজন সামরিক ও পুলিশ কর্মচারী। পিছনে পিছনে একজন ঢুলী।

শহরের বিভিন্ন মহল্লার বিভিন্ন মোড়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। সচকিত মানুষরা সরে গিয়েছিল দূরে দূরে। ঢোল বাজিয়ে কিছু লোক জড়ো করা হয়েছিল, তাদের কানে শোনানো হয়েছিল সেনানায়কের ঘোষণা।

সভা বে-আইনি, শোভাযাত্রা বে-আইনি, এমন কি একসঙ্গে চারজন মানুষের জমায়েত বে-আইনি। প্রজারা এমনি বে-আইনি কাজ যদি করে, তাহলে প্রয়োজন হলে সশস্ত্র উপায়ে তার শাস্তি দেওয়া হবে।

দ্বিপ্রহর পার হোলো। আবার পথে বার হলেন সেনানায়ক। এবার আর ঘোষণা নয়,—শাস্তি। সামনে ঘোড়ার পিঠে দুজন সশস্ত্র পুলিশ, তারপর সামরিক অফিসারদের খোলা মোটর। ঠিক তার পরেই মেশিনগান বসানো একজোড়া সাঁজোয়া গাড়ি। আগে চলেছে নব্বই জন সৈনিক—দু-দলে ভাগ করা করা। এক দলের কোমরে সুতীক্ষ্ণ ছোরা, অন্য দলের হাতে বন্দুক সৈন্যরা ধীর কদমে মার্চ করছে,—রোদে-পোড়া পাথুরে রাস্তা কাঁপিয়ে এগিয়ে চলেছে সামরিক শোভাযাত্রা।

বাজার ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে চলল। তারপর হঠাৎ এক কর্কশ সামরিক নির্দেশে শোভাযাত্রা থামল। এবার যেতে হবে একটা সরু গলির মধ্যে। দুধারে বাড়ি,—মাঝখানে হাত পাঁচেক

চওড়া সংকীর্ণ গলি। তার মধ্যে সাঁজোয়া গাড়ি ঢুকবে না। অফিসাররা গাড়ি থেকে নামলেন। গলির মধ্যে তাঁরা ঢুকলেন। তাঁদের পিছনে পিছনে দু-সারিতে সৈন্যরা এগোলো। মেশিনগান আর সাঁজোয়া গাড়ি খাড়া রইল বড়ো রাস্তার মাঝখানে।

চারদিকে একতলা দোতলা বাড়ির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে কুড়ি বাইশ বিঘে এবড়ো খেবড়ো জমি। নামেই বাগ—আসলে খানিকটা নোংরা ভূমিখণ্ড। কাঁচা মাটির অমসৃণ আয়তক্ষেত্র,—বাগান নেই, ফোয়ারা নেই, রাস্তা নেই, গেট নেই। এখানে ওখানে কয়েকটা বুড়ো ঝাঁকড়া গাছ,—একধারে আছে একটা কূপ,—মাঝামাঝি জায়গায় একটা সমাধি। সমাধির সামনে একটা দেয়াল।

সাঠেওয়ালা বাজার থেকে বড়ো রাস্তা পার হয়ে ঐ সরু গলিটা ঢুকেছে। ঐ গলিটাই বাগে ঢুকবার পথ,—বাগের উত্তর দিকে গিয়ে পৌঁছেছে। সে দিকটা একশো গজ চওড়া। চাতালের মতো কিছু উঁচু সমতল জায়গা। তারপর হাত দশেক নিচু বাকি মাঠটা। চাতাল থেকে ঢালু নেমে গেছে। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ,—চারদিকেই বাড়ির সারি। গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেসি। ঐ গলি ছাড়া বাগে ঢুকবার আর কোনো রাস্তা নেই।

এর নাম জালিয়ানওয়ালাবাগ। ঐ সরু গলি দিয়েই সারিবদ্ধ অস্ত্রধারী সৈন্যরা আসছে। তাদের কানে আসছে জনকণ্ঠের গুঞ্জন। সেনানায়ক খবর পেয়েছেন যে তাঁর আদেশ নগরবাসীরা অমান্য করেছে। এই জালিয়ানওয়ালাবাগে বহু লোক জমায়েত হয়ে সভা করছে। অন্যায়কারীদের শাস্তি দিতে তিনি এসেছেন।

উঁচু চাতালের উপর সার দিয়ে দাঁড়াল সৈন্যদল। বন্দুকধারীরা আগে, ছুরিকাধারীরা পিছনে। সেনানায়ক দেখলেন, মাঠ নয়, জনসমুদ্র যেন। তবে স্থির সমুদ্র। অধিকাংশ লোকই মাটির উপর উঁচু হয়ে বসে আছে। অনেকের কাঁধে শিশু। একটু উঁচু মঞ্চে

দাঁড়িয়ে একজন বক্তৃতা দিচ্ছে। তার হাত মুখ নাড়া দেখা যাচ্ছে,—কিন্তু কী বলছে তা শোনা যাচ্ছে না।

মাথার উপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন কর্কশ শব্দ করে উড়ে গেল। সেনানায়কের প্রথম নির্দেশে সৈন্যরা বন্দুক তাগ করে হাঁটু গেড়ে বসল। দ্বিতীয় নির্দেশের সঙ্গে গুলি ছুড়ল জনতার উপর।

সৈন্যরা চাতালে জমায়েত হবার সঙ্গে সঙ্গে জনতার অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছিল তাদের উপর। চঞ্চলতা জেগেছিল স্তব্ধ জনসমুদ্রে। কেউ কেউ কাঁধের শিশুকে মাটিতে নামিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। গুঞ্জন উঠেছিল,—সেপাই এসেছে, সেপাই এসেছে!

যিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তাঁরও চোখ পড়েছিল। তিনি উদ্বিগ্ন শ্রোতাদের আশ্বস্ত করতে চাইলেন। হাত তুলে বললেন,—

আপনারা বিচলিত হবেন না। সৈন্য এসেছে, তাতে কী হয়েছে? আমরা শান্ত, আমরা নিরস্ত্র,—সৈন্যরা আমাদের মারবে না!

সামনা-সামনি যারা দাঁড়িয়ে উঠেছিল, তাদের লক্ষ্য করে তিনি আবার বললেন,—

ওরা আমাদের শুধু ভয় দেখাতে চায়। আমরা ভয় পাব না।

সৈন্যরাও তাদের সেনানায়কের নির্দেশ ভুল বুঝেছিল। ভেবেছিল ভয় দেখানোই বুঝি কাজ। পরবর্তী নির্দেশে সে ভুল ভাঙল।

তারা এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়েছিল মানুষের মাথার উপর দিয়ে। বক্তা চিৎকার করেছিলেন,—

উঠো না, কেউ উঠে দাঁড়িয়ো না। চুপ করে থাকো, ওরা ফাঁকা আওয়াজ করছে।

মাটিতে লাফিয়ে নেমে তিনি একটা শাদা রুমাল নাড়তে নাড়তে ছুটেছিলেন সৈন্যদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সেনানায়কের চিৎকার শোনা গিয়েছিল,—

আকাশে ছুঁড়ে গুলি নষ্ট করছ কেন? এই জন্যে কি তোমাদের আনা হয়েছে? নিচু করো বন্দুকের তাগ। হ্যাঁ এইবার চালাও গুলি!

এইবার চলল গুলির মতো গুলি। একেবারে মাটি ঝাঁট দিয়ে গুলি ছুটতে লাগল। আর গুলির ঘায়ে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল মানুষ। কারোর বুকে, কারোর পিঠে, কারোর পেটে, কারোর পায়ে।

প্রথম ঝাঁকেই একদল মানুষ লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভয়ে উন্মাদ হয়ে উঠল জনতা। তারা দিশেহারা হয়ে ছুটতে লাগল। কিন্তু সারা বাগভর্তি লোক, ছুটবে কোথায়,—ঠাসাঠাসি ভিড়, নড়বে কোথায়? এমনি ভিড়ের মধ্যে গুলি করার বড়ো সুবিধে। তাগ ভুল হয় না,—একটি গুলিও নষ্ট হয় না।

দ্বিতীয় রাউণ্ড গুলি ছোটার সঙ্গে জনতার চাপ ভেঙে পড়ল পিছন দিকে। দুটি বিরাট তরঙ্গ পিছনে দুধারে দুটি শীর্ণ ফাঁকের উপর। সেই ফাঁক দিয়ে পালাবার ব্যর্থ ব্যাকুল প্রচেষ্টা।

সেনানায়ক শান্ত গম্ভীরভাবে অবস্থাটা দেখছিলেন। তিনি সৈন্যদের হুকুম দিলেন,—

কার্যকরী ভাবে তাগ করো। গুলি নষ্ট কোরো না। যেদিকে ভিড় ঘন, সেইদিকে ফায়ার করো।

শীর্ণ ফাঁক দিয়ে পালাবার উপায় নেই। ঝাঁক ঝাঁক গুলি আসছে,—ফাঁকের মুখে মৃতদেহের পাহাড় রাশি হচ্ছে। জনতা ছুটল পিছনের পাঁচিলে। যে যাকে পাচ্ছে, মাটিতে উলটে ফেলছে, পদদলিত করছে, দেহের উপর চড়ে পাঁচিল ধরবার চেষ্টা করছে। সেনানায়কের নির্দেশে সেই পাঁচিলের দিকে বন্দুকের মুখ ঘুরল। আবার গুলি ছুটল কয়েক ঝাঁক।

এই ভয়াল মৃত্যু থেকে পালাবার কোনো রাস্তা নেই, মুক্তির কোনো উপায় নেই। মাটির নিচে আশ্রয় যদি পাওয়া যেত! অগভীর কূপটা ছিল,—তার মধ্যে একজন ঝাঁপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন,—আবার আর একজন। মৃত্যুতাড়িত আহত মানুষে কূপটা ভরে গেল। কয়েকজন নিরুপায় হয়ে সামনে ছুটে এল,—এল

একেবারে সৈন্যদের মুখোমুখি। গুলি লাগল সরাসরি তাদের মুখে মাথায়,—লুটিয়ে পড়তে লাগল চাতালের ঠিক নিচে। কয়েকজন ঢালু বেয়ে চাতালের উপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠল। সৈন্যরা বন্দুক ঘুরিয়ে নিল। বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে মাটিতে শুইয়ে দিল তাদের।

সরু সরু সুঁড়িপথ ছিল কয়েকটা,—দুই বাড়ির দুধারের দেয়ালের মাঝখানের এক চিলতে ফাক। সেইসব সুঁড়িপথের দিকে দৌড়ে ছিল জনতা। সুঁড়ির মুখে মুখে এতো ভিড়, এতো উন্মাদ ধাক্কাধাক্কি যে তা দিয়ে বাইরে যায় কার সাধ্য? মানুষের পায়ের চাপে মানুষ মরল। আর সেনানায়ক বিশেষ করে সেই পথের দিকেই গুলি চালালেন বেশি করে। যারা কোনোক্রমে পাঁচিলের উপর উঠেছিল, তাদের দিকে বিশেষ তাগ করে লক্ষ্যভেদ পরীক্ষা করল বন্দুকধারীরা। পলায়মান জনতা ঝাঁকে ঝাঁকে লুটিয়ে পড়ল। বন্দুকের নিনাদে আর শিকারের আর্তনাদে আকাশ ভরে গেল,—রক্তে রঞ্জিত হোলো মাটি।

গুলি চলল দশ থেকে পনেরো মিনিট। নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুবৃষ্টি। একবারও বিরাম নেই। সেনানায়ক লক্ষ্য করলেন গুলির রসদ ফুরিয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ চালালে সৈন্যদের বন্দুক সম্বল করে ফিরে আসতে হবে। তাঁর মনটা বড়ো ব্যথিত হোলো। বড়ো রাস্তার উপর সাঁজোয়া গাড়ি রয়েছে, তাতে মেশিনগান। এমন বিশ্রী সরু রাস্তা যে সাঁজোয়া গাড়ি দুটোকে ঢোকাতেই পারা গেল না। কাজেই লাগল না মেশিনগান দুটো! ও দুটোকে যদি কোনো রকমে চাতালের কাছে টেনে আনা যেত!

যাই হোক, এতো কম প্রস্তুতিতে এতো অল্প সময়ের মধ্যে যা হবার মন্দ হয়নি। খাঁচার মধ্যে পুরে ইঁদুর মারা হয়েছে! উচিত শিক্ষা হয়েছে! কতো লোক মরেছে? দুশো পাঁচশো হবে,—বেশী হলে আরো ভালো। কার গুণে দেখার দায়? ফিরে গিয়ে হিসেব নিলেই

চলবে ক-রাউণ্ড গুলি চলেছে। তার থেকে আজকের এই অভিযানের সার্থকতার একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া যাবে।

সেনানায়কের নির্দেশে সৈন্যেরা বন্দুক তুলে স্থানু হয়ে দাঁড়ালো। তার পর অ্যাবাউট টার্ণ। বড় রাস্তার মোড়ে এসে আবার সেনানায়ক গাড়িতে উঠলেন। আবার সৈন্যরা সার বেঁধে দাড়ালো সামনে পিছনে। সাঁজোয়া গাড়ি স্টার্ট নিল। শান্ত নির্লিপ্ত স্থির গতিতে সামরিক শোভাযাত্রা ফিরে চলল হেডকোয়াটার্সে। ততোক্ষণে সারা মহল্লায় শোকের কলরোল উঠেছে।

হেডকোয়াটার্সে ফিরে সৈন্যদের গুলির রসদ পরীক্ষা করে দেখা হোলো। দশ মিনিটে তারা এক হাজার ছশো পঞ্চাশ রাউণ্ড গুলি ছুড়েছে। বন্দুক ছুড়লাম কেন? খুন জখম করব বলেই তো! হতাহত হয়েছে কতো লোক?

অন্তত হাজার দেড়েক তো হবেই।

এই জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের যিনি পুরোধা তাঁর নাম রেজিন্যাল্ড্ এডোয়ার্ড হ্যারী ডায়্যার। বৃটিশ ব্রিগেডিয়ার জেনারাল।

অবিস্মরণীয় ঘটনা, অবিস্মরণীয় নাম। পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখ নেই, ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাস থেকেও ধীরে ম্লান হয়ে যাবে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে কখনো মুছবে না।

কেননা সেদিন বিকেলে জালিওয়ানওয়ালাবাগের প্রান্তরে অমৃতসর ও আশেপাশের যে পঁচিশ হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিল স্বাধীনতার কথা ভেবেই তারা এসেছিল। বৃটিশ বুলেটের নৃশংস ও অতর্কিত আঘাতে সেই রুক্ষ মাঠে যারা ছট্ফটিয়ে মরেছিল তারা মৃত্যুর আগে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নই দেখেছিল। স্বাধীনতার জন্যেই তারা মরেছিল। তারপর আটাশ বৎসরের সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। এই আটাশ বছর ধরে মুক্তি-সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে ভারতবাসী জালিয়ানওয়ালাবাগের নামপরিচয়হীন অমর শহীদদের স্মরণ করেছে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা। ভারতে ইংরেজ শাসনের কাল একশো নব্বই বছরের। স্বাধীন ভারত নূতন ইতিহাস রচনা করবে, ভারতের ইতিহাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মাত্র দুশো বছরের অধ্যায় ক্রমে ম্লান হয়ে আসবে। স্বাধীন ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাস যতো উজ্জ্বল যতো গৌরবময় হবে, পরাধীন যুগের পুরানো ইতিহাসের মূল্য ততো হ্রাস হবে। ক্লাইভ, হেষ্টিংস, ওয়েলেসলি, কর্ণওয়ালিশ, ডালহৌসি, ক্যানিং, কার্জন প্রভৃতি বিদেশী নাম ছাত্ররা জপমালার মতো মুখস্থ করবে না। কিন্তু একটি নাম ভুললে চলবে না। ব্রিগেডিয়ার জেনারাল ডায়ারের নাম। এ নাম বড়ো মূল্যবান।

অমৃতসরের পঁচিশ হাজার মানুষ সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগে জমায়েত হয়েছিল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। এই শাসন কতো হীন কতো নৃশংস হতে পারে কতো ভয়াল জিঘাংসামূলক হতে পারে তার পরিচয় দিয়েছিলেন জেনারাল ডায়ার। তাই নয়,—কতো মানবতাহীন কতো পৌরুষহীন হতে পারে তারও পরিচয় দিয়েছিলেন ডায়ার।

হত্যার অস্ত্র আস্ফালন করে ডায়ার চেয়েছিলেন পঁচিশ হাজার লোককে ভয় দেখাতে। সেই ভয় পঁচিশ কোটি মানবের প্রাণে রূপান্তরিত হয়েছিল ঘৃণায়। কাকে ঘৃণা করতে ডায়ার শিখিয়েছিলেন? ভয়কে ঘৃণা করতে, দুর্বলতাকে পরাধীনতাকে ঘৃণা করতে। হিংসাকে বর্বরতাকে ঘৃণা করতে।

অনেকদিন আগে থেকেই বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের সভায় মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে সেই বিক্ষোভকেই ভাষা দিয়েছিলেন জননেতা হংসরাজ। এই বিক্ষোভ ছিল দিকবিদিক

হারা,—এলোমেলো লক্ষ্যহীন। ডায়ারের গুলি কিন্তু এলোমেলো ছিল না,—প্রত্যক্ষ ছিল তার উদ্দেশ্য, স্থির ছিল তার লক্ষ্য। সেই গুলি সারা ভারতবাসীর বুকে আঘাত করেছিল,—সারা ভারতবাসীর এলোমেলো মনকে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে স্থির লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। সে উদ্দেশ্য আত্ম-অধিকার, সে লক্ষ্য স্বাধীনতা।

গুলি ছুটবার সঙ্গে সঙ্গে জালিয়ানওয়ালাবাগের লোক পালাবার জন্যে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। দৌড়োদৌড়ি করেছিল জ্ঞানশূন্য হয়ে। কিন্তু পালাবার কোনো পথ ছিল না,—না ডানপাশে না বাঁপাশে না পিছন দিকে। ডায়ার তা জানতেন। জানতেন জনতার মুক্তির একমাত্র পথ সামনের দিকে। আর বন্দুকধারী সৈন্য নিয়ে সেই সামনের পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলেন ডায়ার। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন শৃঙ্খলিত ভারতবাসীকে,—ভয় পেলে চলবে না, পালাতে গেলে মুক্তি মিলবে না। সামনেই পথ,—সেই পথের দিকে সমুখ ফিরে দাঁড়াতে হবে, মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে অকুতোভয়ে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের জনতা নিরস্ত্র ছিল। একটি লাঠিও ছিল ছিল না কারো হাতে। সেই নিরস্ত্র নিরীহ শান্ত জনতার উপর গুলি চালিয়েছিলেন ডায়ার। স্থির মনে দৃঢ়সংকল্প হয়ে তিনি একাজ করেছিলেন,—দ্বিধা করেননি, দ্বিরুক্তি করেননি। মুহূর্তের জন্য মনে হয়নি যে তাঁর এই কাজ মানবতার পরিপন্থী। হিংসার প্রচণ্ড অস্ত্রে তিনি অহিংসাকে পরাভূত করতে চেয়েছিলেন। বিনিময়ে তিনি ভারতবাসীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন অহিংসার অমোঘ অস্ত্র। যে অস্ত্রবলে ভারত জয়ী হয়েছে, স্বাধীন হয়েছে।

॥ ৩ ॥

১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। সরকারী হিসাব মতে ৩৭৯ জন নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল ১২০০ জন। লক্ষ লক্ষ মানুষের মতে এমন কাজ কোনো বীভৎস দানব ছাড়া কেউ করতে পারে না। এই হত্যালীলা ইংরেজ জাতের গভীরতম কলঙ্ক। এমনি জঘন্য কাজ ইংরেজ অতীতে আর একবার মাত্র করেছিল যখন তারা লাবু দেওয়ানকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল

আগস্ট মাসের রিপোর্টে জেনারেল ডায়ার লিখেছিলেন,—

জনতাকে সরাবার উদ্দেশ্যে আমাকে গুলি চালাতে হয়েছিল, অতএব জনতা ছত্রভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত আমি গুলি চালিয়েছিলাম। আমার কর্তব্য ছিল জনসাধারণকে উপযুক্ত নৈতিক শিক্ষা দেওয়া,—সেই কর্তব্য পালনে যতোটা গুলি চালানো প্রয়োজন বলে মনে করেছিলাম, তার অতিরিক্ত আমি করিনি। আমার হাতে সৈন্যসংখ্যা যদি আরো বেশি থাকত, তাহলে অবশ্য হতাহতের সংখ্যাও বেশি হোতো। কেন না শুধু ঐ বে-আইনি সভার ভিড় হটানোই আমার কাজ ছিল না। আমার কর্তব্য ছিল শুধু ঐ সভার লোকদের নয়, সারা পাঞ্জাবের লোকদের উপর উচিতমতো নৈতিক প্রভাব বিস্তার করা। এবং তা করা মিলিটারি পদ্ধতিতে। সেই পদ্ধতির কঠোরতা নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

হাণ্টার কমিটির সামনে ডায়ার উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,—

কী উদ্দেশ্যে আপনি গুলি চালান?

জনতাকে অপসারিত করবার উদ্দেশ্যে।

আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল?

না, আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

আপনি গুলি চালানো শুরু করার পর কি জনতা সরতে শুরু করল ?

নিশ্চয়, গুলি আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে।

তারপরেও কি আপনি গুলি চালিয়েছেন ?

হ্যাঁ, চালিয়েছিলাম।

জনতা যখন সরেই পড়ছিল, তাহলে আপনি গুলি চালনা বন্ধ করেননি কেন ?

যতোক্ষণ না জনতা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়, ততোক্ষণ গুলি চালিয়ে যাওয়াই আমার কর্তব্য ছিল। অল্পস্বল্প গুলি চালালে তার ফল যথোপযুক্ত হোতো না। কম করে গুলি চালালে গুলি চালানোই অন্যায় হোতো।

ডায়ার স্বীকার করেছিলেন যে জালিয়ানওয়ালাবাগের জনতা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিল,—এমনকি একটা লাঠি পর্যন্ত একজনেরও হাতে ছিল না।

এই কথার পর তাঁকে প্রশ্ন করা হোলো,—

আপনার কি মনে হয় না যে আপনি যদি শুধু মুখে ধমক দিতেন, তাহলেই ঐ নিরস্ত্র জনতা সভাভঙ্গ করে চলে যেত ?

ডায়ার বললেন,—নিশ্চয়ই, গুলি না চালিয়েই আমি ভিড় হটিয়ে দিতে পারতাম।

তবে তাই করলেন না কেন ?

ডায়ার গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—

তাতে সময় বেশি লাগত। তাছাড়া লোকেরা আমায় ঠাট্টা করত, অন্য সময় আবার জমায়েত হোতো। যার ফলে আমি নিজেই নিজেকে বোকা বানাতাম।

পরাধীন নিরস্ত্র অমৃতসরবাসীর কাছে বৃটিশ জেনারেল হাস্যাস্পদ হতে চাননি। সকালবেলা তিনি শহরে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করেছিলেন,—সভা করা চলবে না। তাঁর নির্দেশ যারা মানেনি,

তারা তাঁকে হাস্যাস্পদ করতে চেয়েছিল। তাই তিনি তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাতে ভবিষ্যতে কখনো তারা হাসতে না পারে।

তাই বলে সরকারী গুলির অনর্থক অপচয় করতেও তিনি চাননি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল,—

ভিড়ের মধ্যে গুলি করলে লক্ষ্য ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা খুব কম নয় কি ?

উত্তরে ডায়ার বলেছিলেন,—

ঠিকই বলেছেন, দু-এক ঝাঁক গুলির সঙ্গে সঙ্গেই লোক পালাতে শুরু করেছিল, বেশ কয়েকজনের গায়ে গুলি লেগেও ছিল। যেখানে ভিড়ের চাপ বেশি, সেই দিকেই আমি গুলি চালাতে নির্দেশ দিয়েছিলাম।

গুলি শুরু হবার পর কি আপনি লক্ষ্য করেছিলেন যে কিছু লোক প্রাণ বাচাবার জন্য মাটিতে শুয়ে পড়েছে ?

হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করেছিলাম।

আপনি কি সেই শুয়ে পড়া লোকদের উপর গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ?

তা হয়তো দিতে পারি। তবে শোয়া লোকের চেয়ে দাঁড়ানো লোক আরো ভালো লক্ষ্য। আমি দেখে দেখে লক্ষ্য বদলে বদলে গুলি চালানোর নির্দ্দেশ দিয়েছিলাম।

একজন সভ্য প্রশ্ন করেছিলেন,—

আপনি কি আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই গুলি চালিয়ে ছিলেন ?

ডায়ারের উত্তর,—

আপনার ভাষায় আপনি তা বলতে পারেন। আমি সামরিক দিক থেকে ব্যাপারটা বিচার করেছিলাম। আমার নির্দেশ যারা অমান্য করেছিল,—তাদের আমি শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম। তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার হয়েছিল।

আপনি চেয়েছিলেন সভার জনতাকে সরিয়ে দিতে,—এই তো?

ঠিক তাই। আমি প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলাম যে সভা যদি ভঙ্গ না হয় তাহলে প্রত্যেক লোককে আমি হত্যা করব। তাই ছিল আমার সামরিক দায়িত্ব।

ডায়ার কমিটির সামনে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন,—

আমার আফশোস যে রাস্তাটা সরু বলে মেশিনগানগুলোকে আমি নিয়ে যেতে পারিনি। তা যদি সম্ভব হোতো তাহলে আরো অনেক বেশি মানুষকে আমি শেষ করতে পারতাম।

ডায়ার মিথ্যা আস্ফালন করেন নি। শুধু মেশিনগানের অভাব নয়, '৩০৩ রাইফেলের গুলিরও অভাব হয়েছিল। গুলি ফুরিয়ে এসেছিল বলেই এই হত্যালীলা দশ পোনেরো মিনিটের বেশি স্থায়ী হতে পারেনি।

কিন্তু হত্যালীলা আরম্ভ করবার আগে ডায়ার কি কিছুটা চিন্তা করেছিলেন? না, তা তিনি করেন নি। কেননা চিন্তা করার দরকারই ছিল না। সামরিক শোভাযাত্রা সাজিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে যাবার আগেই তিনি মন স্থির করে নিয়েছিলেন। হত্যাকাণ্ডের পুরোপুরি পরিকল্পনা নিয়েই তিনি বাগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। এবং কাজও করেছিলেন পরিকল্পনা অনুযায়ী। পরিকল্পনার অঙ্গ হানি হয়েছিল অবশ্য, মেশিনগানগুলি তিনি ভিতরে নিয়ে যেতে পারেন নি। টোটা ফুরিয়ে এসেছিল বলে তিনি বন্দুকধারীদের স্তব্ধ হতে নির্দেশ দিতেও বাধ্য হয়েছিলেন। মাত্র হাজার দুই মানুষকে হতাহত করেই অভিযানে ক্ষান্ত হয়েছিলেন। মেশিনগান যদি জালিয়ানওয়ালা-বাগের চাতালে টেনে নিয়ে যেতে পারতেন, তাহলে বন্দুকের গুলির অভাবে তাঁর পরিকল্পনা খণ্ডিত হোতো না।

ডায়ার বলেছিলেন,—জালিয়ানওয়ালাবাগের চাতালে পৌঁছে আমাকে একটুও চিন্তা করতে হয়নি। আমি সঙ্গে সঙ্গে গুলির আদেশ দিয়েছিলাম।

জালিয়ানওয়ালাবাগের সভার বক্তা কী বলছেন তা শোনবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। সে বক্তৃতা হিংসাত্মক কি না তা বিচার করবার তাঁর দরকার ছিল না। তিনি এও লক্ষ্য করেছিলেন যে জনতা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র,—এই দেখে তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনার পরিবর্তন করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি।

তিনি জানতেন এই নিরস্ত্র জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ফাঁকা আওয়াজই যথেষ্ট। তাঁর সৈন্যরাও তাই জানত। তাই প্রথমে তারা জনতার মাথার উপর দিয়ে গুলি ছুঁড়েছিল। লোকজনও ভয়ার্ত হয়ে পালাতে শুরু করেছিল। কিন্তু তা ডায়ারের পূর্ব-পরিকল্পনার পরিপন্থী ছিল। তিনি সৈন্যদের ধমক দিয়ে জনতার গায়ে গুলি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুরো দশ মিনিট ধরে তিনি সৈন্যদের লক্ষ্য পরিচালনা করেছিলেন,—যাতে প্রত্যেকটি গুলি কার্যকরী হয়।

সকালবেলা ডায়ার ঘোষণা করেছিলেন,—

সভা নিষিদ্ধ, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ, এমন কি এক সঙ্গে চারজন লোকের জমায়েতও নিষিদ্ধ। প্রজারা যদি এই নিষেধ অমান্য করে, তাহলে প্রয়োজন হলে সশস্ত্র উপায়ে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগে সভা করে অমৃতসরের অধিবাসীরা নিষেধ অমান্য করেছিল,—আইন অনুসারে শাস্তি তাদের প্রাপ্য ছিল। ডায়ার ঘোষণা করেছিলেন,—যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সশস্ত্র উপায়ে তাদের তিনি শাস্তি দেবেন। কী অবস্থা হলে সশস্ত্র উপায়ে শাস্তির প্রয়োজন হবে তা ডায়ার নিজেই জানতেন। আর সশস্ত্র শাস্তির মাত্রা কী হবে তাও ছিল তাঁরই বিচার।

তিনি জানতেন যে জালিয়ানওয়ালাবাগের নিরস্ত্র জনতাকে সশস্ত্র উপায়ে শাস্তি দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অনেক লঘুতর শাস্তিতে তাদের শাসন করা চলত। জনতার মধ্যে কোনো উত্তেজনা বিশৃঙ্খলতা বা হিংসাপরায়ণতা তিনি দেখেননি। দেখার জন্যে অপেক্ষাও করেননি। অপরাধের মাত্রাভেদ অনুসারে শাস্তির মাত্রাভেদ

হয়ে থাকে। ডায়ারের ঘোষণায় শাস্তির মাত্রাভেদের উল্লেখ ছিল। এই ঘোষণা অনুসারে অপ্রয়োজনে সশস্ত্র উপায়ে শাস্তি দেবার কথা নয়। দ্বিতীয়ত উপায়েরও মাত্রাভেদ স্বাভাবিক। ডায়ার সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রবেশ করে উচিত কাজ করেছিলেন। মুখের কথায় তিনি জনতাকে সরিয়ে দিতে পারতেন,—এ তাঁরই ঘোষণা। তবু তাঁর নির্দেশে সৈন্যরা গুলি ছুড়েছিল। প্রথমবার ছুড়েছিল জনতার মাথার উপরে। এই ছিল জনতাকে শাস্তি দেবার যথেষ্ট সশস্ত্র উপায়। কেননা ডায়ারের কথা অনুসারে তাঁর জালিয়ানওয়ালাবাগে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল,—সভাকে ছত্রভঙ্গ করে জনতাকে হটানো।

কিন্তু ডায়ারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অন্য। সে উদ্দেশ্য আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা নয়। সে উদ্দেশ্য আইন অমান্যকারী জনতাকে ভয় দেখানো নয়,—যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়াও নয়।

ডায়ারের উদ্দেশ্য ছিল হত্যা,—ব্যাপক নরহত্যা। এই বীভৎস উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে এসেছিলেন,—পলায়নের একটিমাত্র পথ রুদ্ধ করে পৈশাচিক উল্লাসে শত শত নিরস্ত্র নিরীহ পরাধীন প্রজাকে হত্যা করেছিলেন।

॥ ৪ ॥

দশ-পোনেরো মিনিট মাত্র সময়।

এরই মধ্যে ৩৭৯ জন লোককে হত্যা করে আর প্রায় দেড় হাজার লোককে আহত করে ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। জনতা ছত্রভঙ্গ হোলো, মৃত আর মুমূর্ষুরা রক্তাক্ত প্রান্তরে পড়ে রইল।

সন্ধ্যার পর থেকেই কার্ফু। মৃতদেহগুলি সরাবার উপায় নেই, আহতদের শুশ্রূষা করবার উপায় নেই। অনেক মুমূর্ষ দেহ ক্ষতমুখ থেকে রক্ত ঝরিয়ে ঝরিয়ে নিস্প্রাণ হোলো। অনেক ক্লিষ্ট কণ্ঠ আর্তনাদ করে করে অন্ধকারে স্তব্ধ হোলো।

গুলির আঘাতে আহতদের শুশ্রূষা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা আপনি করেছিলেন?

না, আমি করিনি।

কেন করেন নি?

সে দায়িত্ব আমার ছিল না।

আপনি কি চিন্তা করেননি যে সন্ধ্যার পর কার্ফু ঘোষণা করার ফলে সারারাত নিহতদের মৃতদেহ সরানো যাবে না, আহতদের শুশ্রূষা করারও উপায় থাকবে না?

চিন্তা করেছিলাম বৈকি। এ সব কাজের দায়িত্ব যাদের তারা আমার কাছে আবেদন করলে আমি কার্ফুর কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল করে দিতে পারতাম।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এই দায়িত্ববোধই তাঁকে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কঠিন দায়িত্ব, তিক্ত অকরুণ দায়িত্ব,---কিন্তু তা পালনে

পরাঙ্মুখ হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই দায়িত্ব রক্ষার জন্যে কর্তব্যে যতোটুকু নিষ্ঠুর হওয়া দরকার ততোটুকুই তিনি হয়েছিলেন। তার বেশি নয়। অপ্রিয় কর্তব্য সাধন করতে গেলে এটুকু নিষ্ঠুরতা অপরিহার্য।

জালিয়ানওয়ালাবাগের বে-আইনি সভাকে পণ্ড করার মধ্যেই ডায়ারের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না। অমৃতসরে গুলি চালিয়ে তিনি সারা পাঞ্জাবকে নীতিশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। শুধু পাঞ্জাবই নয়,—ডায়ার চেয়েছিলেন সারা ভারতবাসীর চৈতন্য উৎপাদন করতে। সরকারী আইন লঙ্ঘন করলে কী শাস্তি হতে পারে তার জাজ্বল্যমান আদর্শ তিনি সারা পরাধীন দেশবাসীর চোখের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

আরো প্রয়োজন ছিল। মাত্র ক-দিন আগেকার ৩০ মার্চ তারিখের ঘটনা। সেই ঘটনা ভোলবার নয়। সেই দিনই সারা ভারতব্যাপী সুনির্দিষ্ট রাজদ্রোহিতার সূত্রপাত। এই রাজদ্রোহিতা সুপরিকল্পিত ভাবে সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হতে চলেছিল। ভারতে বৃটিশ শাসনের শিয়রে হিংসাত্মক গণবিদ্রোহের সর্বনাশা ঘন মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল। বজ্র-বিদ্যুৎপাতের মতো এক একটি হিংসামূলক ঘটনা স্থানে স্থানে চকিতে ঘটে যাচ্ছিল। ব্যাপক রাজদ্রোহ ও নিষ্ঠুর বিপ্লব এক গুপ্ত কেন্দ্রীয় শক্তির পরিচালনায় ত্বরিতগতিতে আগুয়ান হচ্ছিল। দেশব্যাপী সেই বিপ্লবকে ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগের নিদর্শন দিয়ে চূর্ণ করেছিলেন। শুধু শাসকশক্তিকে তিনি রক্ষা করেছিলেন তাই নয়,—দেশব্যাপী প্রজাকুলকেও তিনি রক্ষা করেছিলেন। নইলে অচিরে সারাদেশে রক্তের বন্যা বয়ে যেত। যে সংঘর্ষ শুরু হোতো তার তুলনায় বাষট্টি বছর আগেকার সিপাহী বিদ্রোহ কিছুই না। রোগীর কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গে অস্ত্রোপচার নিষ্ঠুর কর্তব্য সন্দেহ নেই,—কিন্তু সেই অস্ত্রোপচারই সারা দেহে রোগের সংক্রমণকে নিবারিত করে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে ডায়ার ও

তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের এই ছিল সবচেয়ে জোরালো যুক্তি। বৃটিশ রাজের প্রজাবৎসলতার তুলনা নেই। দুর্বল অশক্ত অশিক্ষিত ও পশ্চাৎবর্তী কালো মানুষদের প্রতি পৃথিবীর শ্বেতকায় জাতির যে মানবিক দায়িত্ব আছে,—এই দায়িত্ববোধ ইংরেজ জাতির মতো এতো গভীরভাবে হৃদয়ংগম করেছে কে? এই ইংরেজ প্রভুই তো ভারতবর্ষে ঠগী দমন করেছে, শিশুহত্যার বিরুদ্ধে আইন করেছে, সতীদাহ নিবারণ করেছে। ছোটবড়ো রাজারাজড়ার অসংখ্য অত্যাচার থেকে বিপন্ন প্রজাকুলকে রক্ষা করার জন্যে একটি মাত্র রং-এ সারা দেশের মানচিত্রকে রঞ্জিত করেছে। রেল লাইন পেতেছে, টেলিগ্রাফের খুঁটি পুঁতেছে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। সবই প্রজার কল্যাণের জন্যে। সবই ভারতের উন্নতির জন্যে।

কিন্তু যতোক্ষণ সে প্রজা, ততোক্ষণ তাকে পালনের দায়িত্ব। শুধু পালন নয়, প্রয়োজন মতো শাসনও। সেই জন্যেই আইন-আদালত,—পুলিশ। কিন্তু প্রজাকে প্রজা হয়ে থাকতে হবে। কায়মনোবাক্যে রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।

প্রজা যদি বিদ্রোহী হয়,—তখন সে শত্রু। শত্রুদমন আর প্রজাপালন এক নয়। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়,—তাকে পরাস্ত করতে হয়। সে কাজ সেনানায়কের।

সেনানায়কের সেই নিষ্ঠুর কর্তব্যভার পড়েছিল ডায়ারের উপর। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান চালিয়েছিলেন,—এই অভিযানে দ্বিরুক্তির অবসর নেই, দ্বিধা করা অন্যায়। কালক্ষেপন বিপজ্জনক।

প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষায় কে বলে বৃটিশ সরকার পরাঙ্মুখ? প্লেগদমন করেছেন সরকার, সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন অভিযান চালিয়েছেন সরকার,—প্রতীচ্য চিকিৎসা, মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল এ সব তো সরকারেরই অবদান। সবই তো প্রজার মঙ্গলের জন্যে,—বিদ্রোহীর জন্যে নয়, রাজদ্রোহী শত্রুর জন্যে নয়।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে অমৃতসর শহর সামরিক

কর্তৃত্বের অধীনে ছিল। যদিও সামরিক শাসন সেদিন সেখানে ঘোষিত হয় নি। সেদিন অপরাহ্ণে বিদ্রোহীদের পরাভূত করেছিলেন ডায়ার। বিদ্রোহ-দমনের প্রকৃষ্ট উপায় হিসেবে তিনি সন্ধ্যার পর থেকে কার্ফু ঘোষণা করেছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের রণক্ষেত্রে সে রাত্রে শত শত পরাজিত বিদ্রোহীর ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে ছিল। নিহতের সৎকার আর আহতের শুশ্রূষার কোনো উপায় ছিল না। অন্ধকার পথে পথে বন্দুকধারী সৈন্যরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। ঘরের বাইরে যাকে দেখবে তাকে গুলি করে মারবে,—এই ছিল নির্দেশ।

জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রান্তরে সে রাত্রে অনেক অর্ধমৃত লোকও পড়ে ছিল। একাধিক গুলিতে আহত হয়েও সঙ্গে সঙ্গে মরেনি। মৃতদেহের গাদার মধ্যে পড়ে ছটফট করেছিল। কাদামাখা রক্তাক্ত দেহ টেনে টেনে বুকে হেঁটে এগোবার চেষ্টা করেছিল। ক্ষতমুখ থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছিল,—বুক ফেটে গিয়েছিল তৃষ্ণায়। রক্তকাদা-ভরা শীতল মাটি চেটেছিল বিশুষ্ক জিভ দিয়ে। তারপর কখন জুড়িয়েছিল সব যন্ত্রণা। শান্ত হয়েছিল সব দাহ। পড়েছিল শেষ নিঃশ্বাস।

তাদের অনেকে হয়তো বাঁচত। যদি তৃষ্ণা মিটত, শুশ্রূষা হোতো, চিকিৎসা হোতো। কিন্তু সে দায় ডায়ারের ছিল না। সে করুণা রাজদ্রোহীর জন্য নয়,—বিদ্রোহী সেই মমতা আশা করতে পারেনা।

বিদ্রোহ-বিধ্বংসী বীর নায়ক ডায়ারের সৈনিক জীবন খুব কর্মবহুল ছিলনা। প্রকৃত পক্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগই তাঁর জীবনের অদ্বিতীয় কীর্তি। একুশ বছর বয়সে তিনি স্যাণ্ডহারস্ট থেকে পাশ করেন ও ওয়েস্ট সারে রেজিমেণ্টে যোগ দেন। পরের বছর বর্মার যুদ্ধে যান ও বছর খানেক পরে ভারতবর্ষে আসেন। বাকি একত্রিশ বছর সৈনিক জীবনের প্রায় তাঁর পাঞ্জাব পদাতিক সৈন্যদলে কাটে। পাঁচ বছর পরে তিনি ক্যাপটেন হন, দশ বছর পরে মেজর। প্রথম মহাযুদ্ধের

সময় তিনি কর্ণেল হন, ও বৃটিশ-বিরোধী জার্মান প্রচার প্রতিহত করবার কাজ নিয়ে আফগানিস্থানে যান। প্রথম মহাযুদ্ধেও তাঁকে লড়াই করতে হয়নি। কিন্তু আফগানিস্থানের দায়িত্ব নিশ্চয়ই তিনি ভালো-ভাবেই সমাধা করেছিলেন। মহাযুদ্ধের পর অস্থায়ীভাবে তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের পদ লাভ করেন ও জালন্ধরের ৪৫নং ব্রিগেডের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

সুদীর্ঘ ত্রিশ-একত্রিশ বছর ধরে ডায়ার ভারতের সামরিক বিভাগে ছিলেন। উত্তরোত্তর তাঁর পদোন্নতি হয়েছিল,—কিন্তু এতো বছরের মধ্যে একদিনও তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়নি,—বন্দুক ছুড়তে হয়নি এক-বারের জন্যেও।

তাছাড়া এই সামরিক পেশাই ভারতের সঙ্গে ডায়ারের একমাত্র যোগসূত্র নয়। ভারতবর্ষে তিনি বিদেশী ইংরেজ ছিলেন না। ভারতই তাঁর জন্মভূমি। ডায়ার পরিবার তিন পুরুষ ধরে ভারতবাসী।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিন্যাল্ড ডায়ার ১৮৬৭ সালে সিমলাতে জন্মগ্রহণ করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে প্রথম ভারতবর্ষে আসেন তাঁর পিতামহ। ডায়ারের বাপ সিমলা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। সিমলাতে তাঁর এক ভাঁটিখানা ছিল,—ঢালাও মদের কারবার ছিল তাঁর। তাঁর নটি ছেলেমেয়ে,—রেজিন্যাল্ড ডায়ার ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র।

রেজিন্যাল্ড ডায়ারের বাল্যজীবন সিমলাতেই কেটেছিল। জীবনের প্রথম সূর্য তিনি ভারতের আকাশেই দেখেছিলেন। শৈশবের প্রথম চঞ্চলতা ভারতের মাটিতেই,—বাল্যের প্রথম শিক্ষা ভারতের বিদ্যালয়েই। ভারতবর্ষেই তিনি বিবাহ করেন। তাঁর পুত্রও ভারতের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হন।

রেজিন্যাল্ড ডায়ার ভারতীয় ভাষাও জানতেন অনেকগুলি। উর্দু ফারসি ভাষা তিনি কষ্ট করে শিখেছিলেন,—উর্দু তো তিনি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিলেন। হিন্দুস্তানী ভাষায় তিনি খাস হিন্দুস্তানীর

মতো কথা বলতে পারতেন। পাঞ্জাবী ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তাঁর দিশী পরিচারকরা বলত,—সাহেবকে লুকিয়ে কোনো কথা বলার জো নেই, সাহেব সব ধরতে পারেন।

এই ডায়ারই জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালিয়েছিলেন। ভারতবাসী তাঁর অপরিচিত ছিলনা,—বয়সে তিনি অপরিণত ছিলেন না। জালিয়ানওয়ালাবাগেব হত্যাকাণ্ডের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চান্ন। তাঁর বয়স তাঁর অভিজ্ঞতা,—ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর তিন পুরুষের সম্পর্ক,—এসব মানসিক দুর্বলতা মাত্র। এই দুর্বলতা তাঁকে অভিভূত করেনি,—কর্তব্যনিষ্ঠা থেকে বিচলিত করেনি। রক্তাক্ত মারণযজ্ঞের প্রতিজ্ঞা থেকে ভ্রষ্ট করতে পারেনি।

সে প্রতিজ্ঞা ভারতব্যাপী আসন্ন গণবিপ্লবকে চূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা। ৩০শে মার্চ রাজধানী দিল্লী শহরে হিংসাত্মক বিপ্লবের আহ্বান নাকি উঠেছিল, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা ভারত সাম্রাজ্যে প্রলয়-কাণ্ডের গর্জন নাকি জেগেছিল,—সেই প্রলয়কে রোধ করার দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ডায়ার,—তাই সার্থক তাঁর জালিয়ানওয়ালাবাগের যুদ্ধজয়।

ডায়ারের মতে যে বিপ্লবে সারা ভারতে রক্তগঙ্গা বইত,—সেই বিপ্লবের আহ্বান করেছিলেন কে? কে ছিলেন তাঁর নেতা?

ডায়ার তাঁকে দেখেননি। ডায়ার চেনেননি তাঁর স্বরূপ, বোঝেননি তাঁর শক্তির উৎস, তাঁর অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা। ডায়ার কল্পনাও করতে পারেননি যে নিরস্ত্র নিরীহ মানুষের উপর গুলি চালিয়ে সেই বিচিত্র বিপ্লবীর উদ্যমকে রোধ করা যাবে না।

তিনি গান্ধী। সত্যাগ্রহ তাঁর বর্ম, অহিংসা তাঁর অস্ত্র। তিনি মৃত্যুঞ্জয়।

॥ ৫ ॥

৩০শে মার্চ, ১৯১৯।

বিপ্লবের প্রথম আহ্বান। স্থান ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী। সম্রাটের মুখ্য প্রতিনিধি ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের ঠিক চোখের সামনে।

সেই আহ্বান সারা ভারতে ছড়িয়ে গেল সাত দিনের মধ্যে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূব থেকে পশ্চিমে।

দিল্লী থেকে বোম্বাই, বোম্বাই থেকে আমেদাবাদ, আমেদাবাদ থেকে অমৃতসর।

ডায়ারের কানে এসেছিল, কিন্তু ভাষা বোঝেননি। চোখেও কিছু দেখেননি। ধারণা করেছিলেন,—কিন্তু সে ধারণা ভ্রান্ত।

ঘটনার এক বছর পরে ডায়ার আর্মি কাউন্সিলের কাছে লিখিত বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন যে জালিয়ানওয়ালাবাগে তিনি এক হিংস্র ও যুদ্ধমান জনতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি স্থির বুঝেছিলেন যে অমৃতসরের ঘটনা নিতান্ত স্থানীয় গুণ্ডামী নয়,—প্রদেশব্যাপী এক প্রচণ্ড বিপ্লবের অঙ্গ। আর অমৃতসর ছিল এই বিপ্লবের কেন্দ্র। জালিয়ানওয়ালাবাগের সভা এই বিপ্লবের ঘোষণা। জালিয়ানওয়ালা-বাগের সভায় যারা উপস্থিত ছিল তারা শাসনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করতে এসেছিল। ডায়ার বলেছিলেন,—আমি এক সামরিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার ভাগ্য আমি সেদিন সেই মহাবিদ্রোহকে ধ্বংস করতে পেরেছিলাম।

ডায়ার ভুল বুঝেছিলেন। বিপ্লব সন্দেহ নেই,—৩০শে মার্চ বিপ্লবেরই সংকেত। কিন্তু এই বিপ্লবের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি,—উপলব্ধি করবার মতো জ্ঞানবুদ্ধি তাঁর ছিল না। এই

বিপ্লবকে দমন করতেও তিনি পারেননি,—সে শক্তির অধিকারী তিনি ছিলেন না।

৩০শে মার্চের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল সারা দেশের আকাশ জুড়ে,—পৌঁছেছিল সমগ্র ভারতের কোণায় কোণায়। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান নয়,—অহিংস সত্যাগ্রহের। এ আহ্বানের ভাষা বৃটিশ সেনানায়ক ডায়ারের বোঝবার কথা নয়। এ আহ্বান করেছিলেন গান্ধীজী।

এই সত্যাগ্রহের মন্ত্র গান্ধীজীর প্রাণে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায়,—ডারবানে ফিনিক্স আশ্রমে। এই মন্ত্রকে অস্ত্র করে অন্ধকার আফ্রিকায় বছরের পর বছর গান্ধীজী অহিংস সংগ্রাম করেছিলেন শ্বেত মানুষদের দম্ভ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি এই সংগ্রামের পরীক্ষা করেছিলেন চম্পারণে আর খেদায়। এবার তিনি ডাক দিলেন সমস্ত ভারতবাসীকে।

৩০শে মার্চের গণবিপ্লবের এই হোলো গান্ধীজীর নির্দেশ—

এইদিন সম্প্রদায় ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীকে হরতাল পালন করতে হবে। এই হরতালই হবে সত্যাগ্রহের সূচনা।

সত্যাগ্রহের মূলমন্ত্র অহিংসা। আত্মশুদ্ধি সত্যাগ্রহের প্রাথমিক প্রস্তুতি।

আত্মশুদ্ধির জন্য এইদিন হিন্দুমুসলমান সমস্ত দেশবাসী উপবাস করবেন ও নিবিষ্ট চিত্তে প্রার্থনা করবেন।

হিংসা নয়, যুদ্ধ নয়,—আত্মশুদ্ধি, উপবাস ও প্রার্থনা,—৩০শে মার্চের এই ব্রতনির্দেশ। সমস্ত ভারত এই নির্দেশ পালনে সাড়া দিয়েছিল।

পাঁচ বছর আগেকার ঘটনা। প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ। এমন যুদ্ধ সারা পৃথিবীতে আগে আর কখনো হয়নি। পৃথিবীর প্রতিটি

মহাদেশের আকাশে এর বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হয়েছিলেন। এ যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধ,—সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ। প্রধান দুই পক্ষ পৃথিবীর দুই শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি,—বৃটেন আর জার্মানী।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহার্ঘতম উপনিবেশ ভারতবর্ষ,—বৃটিশ রাজমুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন। এ রত্ন যদি খসে পড়ে তাহলে বৃটিশের সব গর্ব ধূলিসাৎ হবে,—সিংহ পরিণত হবে কেশরহীন বক্রলাঙ্গুল শৃগালে। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় সেই আশঙ্কা বৃটেনকে করতে হয়নি, বৃটেনের বিপদ-বিড়ম্বনার সুযোগ ভারতবর্ষ নেয়নি। নেবার কল্পনাও করেনি। সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হয়ে অকুণ্ঠচিত্তে তার দুঃখবেদনার অংশভাগী হয়েছিল। বৃটেনের জয়ে নিজের জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটেনকে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছিল ভারতবাসী। শুধু সামন্ত রাজা, বাণিজ্যপতি বা সরকারী আমলাগোষ্ঠী নয়,—অসংখ্য সাধারণ মানুষ। যুদ্ধকালে করভার বাড়ল। জিনিষপত্রের দাম বাড়ল,—সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট বাড়ল। কিন্তু সেই দুর্দৈব সাধারণ মানুষ হাসিমুখে সহ্য করল। প্রত্যক্ষভাবে ও স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগ দিল হাজার হাজার ভারতবাসী। তারা বিদেশে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাটের হয়ে যুদ্ধ করল,—প্রাণ দিল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সমস্ত ব্যয় তো ভারতবর্ষ বহন করলই। তাছাড়া বিনা বাধায় কোটি কোটি টাকা দিয়ে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করল।

ভারতরক্ষার জন্যে ইংরেজ সৈন্যসংখ্যা তো মুষ্টিমেয় হোলোই,—ইংরেজ অফিসাররাও যুদ্ধের কাজে ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হোলো,—তাদের কাজ নবনিযুক্ত ভারতীয় অফিসাররা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে লাগল। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য তখন ভারতীয়ের বিশ্বাস ও শুভেচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ভারতের শ্রেষ্ঠ সহায়তা তখন আভ্যন্তরীন শান্তি। সেই শান্তি বিন্দুমাত্রও বিঘ্নিত হয়নি।

প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতের শিল্পোদ্যমের পরিব্যাপ্তি। সেই সঙ্গে শ্রমিকের শোষণ। ভারতবাসীর যেটুকু মৌলিক অধিকার ছিল,—

যুদ্ধের প্রয়োজনে তা খর্ব হোলো। ভারতরক্ষা আইন জারী হোলো,—কণ্ঠ রুদ্ধ হোলো সংবাদপত্রের। যুদ্ধের শেষ বৎসরে সারা উত্তর ভারত জুড়ে দারুণ দুর্ভিক্ষ হোলো,—সেই সঙ্গে এল ইনফ্লুয়েঞ্জার মড়ক। এই দুর্ভিক্ষ আর মড়কে বিনা প্রতিকারে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মরতে লাগল।

জাতীয় চেতনার মন্ত্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পনেরো বছর আগে বলেছিলেন,—

আমরা ভারতবাসীরা এক মহান্ ও স্বাধীন সাম্রাজ্যের নাগরিক। পৃথিবীর উদারতম সংবিধানের ছায়া আমাদের মাথার উপর। এই সংবিধানের প্রসাদে সাম্রাজ্যের সব নাগরিকই সমান,—ইংরেজের যে অধিকার সে অধিকার আমাদেরও। ইংরেজের যে সুযোগ-সুবিধা, তা আমাদেরও প্রাপ্য। কিন্তুপ্রকৃত পক্ষে তার কানাকড়িও আমাদের ভাগ্যে জোটে না।

জাতীয় নেতারা ভেবেছিলেন মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় বৃটেন যদি উত্তীর্ণ হতে পারে তাহলে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধের অধিকারকে সে আপন উদারতায় প্রসারিত করবে। আপন ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করবার ব্যাপকতর দায়িত্ব ভারতবাসী লাভ করবে।

প্রথম মহাযুদ্ধ যেদিন ঘোষিত হোলো সেদিন একদল ভারতীয় নেতা লণ্ডনে উপস্থিত। সম্রাট-সকাশে দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার আরজি নিয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন। তাঁদের পুরোধা ছিলেন পঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়। তাঁরা নির্দ্বিধায় বৃটিশ সরকারকে জানালেন যে সমগ্র ভারতবাসী তাদের সর্বক্ষমতা ও দেশের সব সম্পদ দিয়ে সম্রাটকে সাহায্য করবে অচিরে জয়লাভের প্রত্যাশায়। মহাযুদ্ধ চলল—বছরের পর বছর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বৃটিশের প্রতি আনুগত্য ও সহযোগিতা ঘোষিত হোলো। যুদ্ধান্তে ১৯১৮ সালের দিল্লী কংগ্রেসে এক বিশেষ প্রস্তাবে মহাযুদ্ধের সফল সমাপ্তি ও বিশ্বশান্তির জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হোলো।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে চার বছর কাটল,—কিন্তু বিশ্বে শান্তি কী করে আসবে ? এ যুদ্ধ তো শান্তির জন্যে নয় ! গণতন্ত্রের জন্য নয়, জাতীয় আত্ম-অধিকারের জন্যে নয়! এক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আর এক সাম্রাজ্যবাদের লড়াই,—উপনিবেশবাদকে কায়েম করবার জন্যে লড়াই। এই যুদ্ধে বৃটেনের উদ্দেশ্য অতি অল্প কথায় অতি স্পষ্টভাবে জেনারেল স্মাট্‌স্ বর্ণনা করেছিলেন। প্রথম উদ্দেশ্য জার্মান উপনিবেশবাদকে ধ্বংস করা, যাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পৃথিবীব্যাপী শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। দ্বিতীয়, তুর্কী সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে তার বিভিন্ন অংশ ছিনিয়ে নেয়া, যাতে একটা শক্ত তুর্কী-জার্মান আঁতাত ভবিষ্যতে না গড়ে উঠতে পারে,—যাতে মধ্য ও দূরপ্রাচ্যের বৃটিশ উপনিবেশবাদের গায়ে আঁচড় না লাগে।

সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে শক্তির লড়াই, লোভের লড়াই। জাতীয়তার অভ্যুত্থান এ লড়াই-এর লক্ষ্য নয়। জার্মানী হেরেছিল,—জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে তার ইয়ুরোপীয় সাম্রাজ্যকে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছিল, তার আফ্রিকার সাম্রাজ্যকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বৃটেন জিতেছিল,—তাই বহির্বিশ্বে তার বিভিন্ন উপনিবেশের মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কেউ বলেনি। নতুন পৃথিবীর নায়ক উইলসন সমুদ্রপার থেকে শান্তি সম্মেলনে এসেছিলেন,—শান্তি ও মানবতার আদর্শ নিয়ে। ইয়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদের ক্রুর হিংস্র স্বরূপ দেখে তিনি চমকে উঠেছিলেন। শান্তির চৌদ্দ দফা সর্ত নিয়ে তিনি এসেছিলেন অনেক আশায় অনেক প্রেরণায়। তাঁর ইয়ুরোপীয় মিত্ররা একটি সর্তও মানেনি,—পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। আটলান্টিকের জলে প্রতিটি সর্ত বিসর্জন দিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন আমেরিকায়।

যুদ্ধ শেষ হোলো,—ভারতবাসী যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে রইল। মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিক শোষণ, দুর্ভিক্ষ,—সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষ তখন দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় এসে

পৌঁছেছে। মহামারীতে একশো চল্লিশ লাখ লোক উজাড় হয়ে গিয়েছে।

মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় থেকেই দেশবাসীর মনে হতাশা ও ব্যর্থতাবোধ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। বশংবদ উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যাঁরা রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে সরকারকে সাহায্য করবার জন্যে আগুয়ান হয়েছিলেন,—তাঁদের খাতির ক্রমেই কমে আসছিল। স্বেচ্ছাসৈনিকদের স্রোতে ভাঁটা পড়তে না পড়তে সৈন্যদলে জোর করে ঢোকাবার চাপ বেড়ে উঠেছিল। দরিদ্র জনসাধারণের শোষণের মাত্রাও বাড়ছিল। সামান্যতম মুখর প্রতিবাদকে আটক করা হয়েছিল ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজালে।

যে সব ইংরেজ অফিসার যুদ্ধের সময় দেশীয় কর্মচারীদের হাতে কাজের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল তারা এবার ফিরে এল। আবার জাঁকিয়ে বসল তাদের পুরোণো গদীতে। তারা যুদ্ধে জিতেছে,—জার্মানীকে হারিয়ে দিয়েছে। তাদের গর্বের সীমা নেই, ঔদ্ধত্যের সীমা নেই। দিনে দিনে এই ঔদ্ধত্য ভারতীয় আমলা ও প্রজাদের অতিষ্ঠ করে তুলল।

যুদ্ধের পর আর একদল মানুষও ভারতবর্ষে ফিরল : তারা ছাঁটাই হওয়া ভারতীয় সৈনিক। বৃটিশ শক্তিকে খাড়া রাখবার জন্যে পৃথিবীর নানা ফ্রণ্টে তারা রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে লড়েছে। ফিরল তাদের দুর্ভিক্ষে আর মহামারীতে উজাড় হওয়া গ্রামে,—তাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন পরিবারে। অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে,—অনেক জ্বালা নিয়ে।

উচ্চ সমাজের আশাভঙ্গ, শ্রমিক-কৃষকের দুর্দশা আর সৈনিকের অন্তর্জ্বালা,—যুদ্ধশেষে ভারতীয় প্রজার প্রতি বিজয়ী বৃটেনের এই উপহার।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পদানত জাতির বিশ্বস্ত নেতারা সাম্রাজ্যবাদী প্রভুকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই আশায় যে প্রভু হয়তো

সদয় হবেন। আশা অতি সামান্য,—পরাধীনতার শৃঙ্খলভার কিছুটা হয়তো লঘু হবে, নিজের ভালোমন্দের ভার কিছুটা নিজের হাতে পাওয়া যাবে। সুযোগে সম্মানে প্রভুর দেশবাসীর কিছুটা সমকক্ষ হওয়া যাবে। পরাধীন মানুষ মানুষ নয়,—কিছুটা মনুষ্যত্ববোধ প্রাণের মধ্যে ফিরিয়ে আনা যাবে।

এই আশা যে কতোদূর মিথ্যা মরীচিকা তা ভারতের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রমাণ করেছে। এই আশার পিছনে বিন্দুমাত্র সত্যতাও যদি থাকত তাহলে ১৯৪৭-এর পূর্ববর্তী ত্রিশ বছরের ইতিহাসে বেদনার ও দুঃখবরণের এতো বিচিত্র অধ্যায় রচিত হোতো না।

সমুদ্রপারের বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভাবলেন বশংবদ নেতাদের কিছুটা হাত করা দরকার। একটু প্রবোধ দিতে হবে, সামান্য পিঠ চাপড়াতে হবে,—দুচারজনকে না হয় খাতির করে এক টেবিলে বসাতে হবে। বৃটেনের ভারতমন্ত্রী তখন মনটেগু আর ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্স্ফোর্ড। মনটেগু কয়েক মাসের জন্য ভারত ভ্রমণে এলেন। তারপব ভারতের শাসন-সংস্কারের যে প্রস্তাব করলেন তা মনটেগু-চেম্স্ফোর্ড রিপোর্ট নামে খ্যাত।

শাসন-সংস্কারের এই দাক্ষিণ্য কিন্তু বিনামূল্যে নয়। মূল্য যাচাই করবার ভার নিলেন ভাইসরয় লর্ড চেম্স্ফোর্ড। তাঁর আমন্ত্রণে সার সিডনি রাওলাট নামে এক বৃটিশ বিচারক ভারতে এলেন। তাঁর সঙ্গে আর চারজন সরকারী কর্মচারী যোগ দিলেন। এই কমিটিকে বলা হোলো দেশের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অনুসন্ধান করতে ও এই ষড়যন্ত্র কী করে দমন করা যায় তার উপায় নির্ধারণ করতে।

মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজাল এবার সরাতে হবে। প্রেস আইনের কড়াকড়ি কমাতে হবে। সাধারণ মানুষ আর মূক হয়ে থাকবে না। তাদের কণ্ঠরোধের জন্য নূতন উপায় বার করতে হবে। তাদের অসন্তোষকে চাপা দিতে হবে,

আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে হবে। একমাত্র সমর্থ দমননীতির দ্বারাই তা সম্ভব।

সরকারী গোয়েন্দা দপ্তরের নথিপত্র রাওলাট কমিটির সামনে মেলে ধরা হোলো। তাঁরা দ্রুতবেগে পাতার পর পাতা ওলটালেন। তারপর কালবিলম্ব না করে তাঁদের পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। রাওলাট কমিটির রিপোর্ট পড়ে সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। শাসন-সংস্কারের পাশাপাশি দমননীতির এক বীভৎস পরিকল্পনার পরিচয় পেয়ে বিক্ষোভের বন্যা বয়ে গেল। লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডও দেরি করলেন না। তিনি রাওলাট কমিটির সুপারিশ অনুসারে দমনমূলক আইন পাশ করলেন।

রাওলাট আইনে স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা। এই রাওলাট আইনের ফলে আমাদের জাতীয়তাবাদের নবজন্ম। এ আইন আইন নয়,—পাশব শক্তির অপব্যবহার,—এই জাগ্রত ধারণা থেকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নববিকাশ।

ভারতরক্ষা আইনের বিভিন্ন জবরদস্তিকে এই রাওলাট আইনে পুঞ্জীভূত করা হোলো। রাজদ্রোহমূলক ও বিপ্লবাত্মক অপরাধ বলে সরকার যাকে নির্ণীত করবেন সেই অপরাধে ন্যায়বিচারের বাহ্যিক রীতিটুকুর প্রয়োজনও এই আইনের ফলে রইল না। এমনি অপরাধের বিচার করবেন যে বিচারকরা তাঁদের জুরির মত নেবার প্রয়োজন নেই, সাক্ষী ডাকবার প্রয়োজন নেই। তাঁরা গোপনে তাঁদের বিচারশালা বসাতে পারবেন,—অপরাধীকে আত্মরক্ষার সর্ব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে শাস্তিবিধান করতে পারবেন এবং তাঁদের দেওয়া দণ্ডের উপর কোনো আপীল চলবে না।

এই হোলো আইনসিদ্ধ বিচারের প্রহসন। রাওলাট আইনের বিনা বিচারের ব্যবস্থাগুলি আরো মর্মান্তিক। বিনা ওয়ারেণ্টে যে কোনো লোককে গ্রেপ্তার করা, জেলে বন্দী করা বা স্বগৃহে অন্তরীণ করা চলবে। বিনা পরোয়ানায় যে কোনো স্থানে খানাতল্লাসী করা

চলবে,—সন্দেহমাত্রে জামানত দাবী করা বা নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে হাজিরা দেবার হুকুম করা চলবে।

পরবর্তী কালে স্বাধীনতা আন্দোলনকে খর্ব করার জন্যে বৃটিশ সরকার আরো যে সব চণ্ডনীতি গ্রহণ করেছিলেন, বে-আইনি আইনের শৃঙ্খলে যে ভাবে জাতীয়তাবোধকে রুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন,—সে তুলনায় রাওলাট আইন কিছুই না। কণ্টক-অরণ্যের তুলনায় কুসুম-উদ্যান। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দীর্ঘ চার বছর ধরে সারা ভারতবর্ষ এই রাওলাট আইনের জন্যে নির্দ্বিধায় দুঃখবরণ করেনি। স্বৈরাচারী প্রভুর স্বরূপের এই নতুন পরিচয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল আপামর জনসাধারণ।

রাওলাট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ শুরু হোলো। দেশের সর্বত্র অসংখ্য সভাসমিতির মাধ্যমে এই প্রতিবাদ মুখর হোলো। এই রিপোর্ট অনুসারে কালবিলম্ব না করে সরকার আইন প্রণয়ন করতে চলেছেন জেনে দেশবাসীর বিরাগ আরো প্রখর হোলো। জাতীয় নেতারা বড়লাটকে অনুরোধ করলেন,—এমনি আইন হবে হটকারিতা মাত্র। তাঁরা বললেন,—দেশাত্মবোধ অপরাধ নয়,—এই দেশাত্মবোধকে বৃটিশ সরকার স্বীকার করেই শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব এনেছেন। এখন এই বে-আইনি আইন দেশবাসীকে আইন-ভঙ্গের পথে প্ররোচিত করবে।

ভারত-সচিব মনটেগু অবস্থাটা উপলব্ধি করলেন। কয়েকমাস আগেই তাঁর শাসন-সংস্কার পরিকল্পনা প্রস্তাবিত হয়েছে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি কিছুটা তৃপ্ত করতে পারবেন এই তাঁর আশা। তিনি বুঝলেন এখন যদি এমন একটা কঠোর দমন-আইন হয় তাহলে শাসন-সংস্কারের শুভ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিনি পর্যন্ত ভারতের বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে উপদেশ দিলেন এই আইন পাশ না করতে। বড়লাট তা শুনলেন না। রাওলাট বিল যখন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সামনে এল, তখন সমস্ত

বেসরকারী ভারতীয় সদস্য এই বিলের বিরুদ্ধাচরণ করলেন,—চারজন সদস্য এই অন্যায় আইনের প্রতিবাদে সদস্যপদ পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু এতো প্রতিবাদ উপদেশ ও অনুরোধ কোনো কাজে লাগল না। সরকারী সদস্যদের ভোটে পাকা হোলো অ্যানার্কিক্যাল অ্যাণ্ড রেভোলিওশনারী ক্রাইমস্ অ্যাক্ট। রাওলাট আইন নামে কুখ্যাত।

শাসকের বিধান অতি সহজ। কিন্তু ইতিহাসের যিনি বিধাতা তাঁর বিধান বড়ো বিচিত্র। দেশের সমস্ত জনমতকে অগ্রাহ্য করে সরকার এই আইন প্রণয়ন করেছিলেন। ভারত-সচিব থাকেন অনেক দূরে, ইংল্যাণ্ডে,—অনেক সমুদ্রের পারে। বড়লাট থাকেন দেশের খোদ রাজধানীতে। অনেক প্রত্যক্ষ তাঁর অভিজ্ঞতা, অনেক স্পষ্ট তাঁর ধারণা। শাসন-সংস্কার আর রাওলাট আইন,—পাশাপাশি নরম-গরম ব্যবস্থা। বড়লাট ভেবেছিলেন ফল ভালই হবে। নরম-পন্থীরা খুসি হবে, গরমপন্থীরা জব্দ হবে। আর দেশের সাধারণ মানুষ তো অনড় আর মূক। তারা যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই পড়ে থাকবে নিশ্চুপ হয়ে।

সে যুগে রাজনীতিতে দু-জাতীয় লোকের উৎসাহ। এক জাতীয় যারা শিক্ষিত ও অভিজাত, শাসন-সংস্কারে তারা কিছুটা পরিতৃপ্ত হবেই। আর এক জাতীয় লোক যারা সন্ত্রাসবাদী। যারা গুপ্ত সমিতি করে হিংসাত্মক কাজের মধ্যে দিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে শাসনযন্ত্রকে বিকল করবার চেষ্টা করে। রাওলাট আইন তাদের শিকড় শুদ্ধ উপড়ে আনবে। সাধারণ মানুষ তো দারিদ্র্যে-দুর্দশায় রোগে-শোকে অনড় হয়ে আছেই,—তাদের অনড়তা কোনো চিন্তার কারণই নয়।

শাসকগোষ্ঠী ভাবতেই পারেননি যে এই দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলবে দেশের সাধারণ মানুষ। সাধারণ প্রজাগোষ্ঠীর মাঝখান থেকে জন্মলাভ করবে এক আশ্চর্য নেতৃত্ব। যে নেতৃত্বের আহ্বানে মূক হবে বাচাল, পঙ্গু হবে চলৎচঞ্চল। নেতৃত্বের

সেই তড়িৎ-স্পর্শে স্পন্দিত হবে আসমুদ্র হিমাচল। এই রাওলাট আইনই ভারতের জনসমুদ্রের বুকে স্বাধীকার-বোধের জোয়ার জাগিয়ে তুলবে।

রাওলাট আইনের মেয়াদ ছিল তিন বছর। ইতিহাসের বিধাতা তর্জনী তুলেছিলেন এই আইনের বিরুদ্ধে। এই তর্জনী-বিধান উপেক্ষা করে এই আইন তিন বছরে একবারও মাথা তুলতে পারেনি। তিন বছরের মধ্যে একবারের জন্যেও এই আইন একটি মাত্র ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। অনেক লাঠি চলেছিল, অনেক গুলি চলেছিল,—অনেক রক্ত ঝরেছিল। নৃশংস শাসক-সেনানীর নিষ্ঠুর অস্ত্রে অনেক নিরীহ নিরস্ত্র প্রজা নির্ভয়ে করেছিল আত্মবলিদান। কিন্তু রাওলাট আইন জারী হয়নি।

এক নূতন বিপ্লবপন্থায় এই কালসর্পকে তার কোটরের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই বিপ্লবের আশ্চর্য মহৎ রূপের ক্রমবিকাশ দেখেছিল সারা পৃথিবী। সেই বিপ্লবের নাম সত্যাগ্রহ। সেই বিপ্লবকে যিনি নেতৃত্ব দান করেছিলেন তিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মহামানব,—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

॥ ৬ ॥

সাবরমতী আশ্রম।

আমেদাবাদ শহরে অদূরে সাবরমতী নদীর তীরে। সেই আশ্রমে বসে খবরের কাগজে রাওলাট কমিটির রিপোর্ট গান্ধীজী পড়লেন। কমিটির সুপারিশগুলি পড়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আশ্রমের সঙ্গীরাও কাগজের এই রিপোর্ট পড়েছিলেন। তাঁরা ছুটে এলেন গান্ধীজীর কাছে। বললেন,—এখুনি আপনাকে কিছু করতে হবে।

গান্ধীজী তখন খুবই অসুস্থ। একটু সুস্থ হয়ে কয়েকদিন পরে তিনি আমেদাবাদে গেলেন। সেখানকার প্রিয় অনুচরদের সঙ্গেও কথা হোলো। কিছু একটা করতে হবে। এতো বড়ো অন্যায় মাথা হেঁট করে মেনে নেওয়া অসম্ভব।

কিন্তু কী করা যায়? বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর হাতে সব ক্ষমতা। আইন তার, আদালত তার, পুলিশ তার, সৈন্য তার। বিচারের প্রহসন তার, বিনা বিচারে শাস্তিদানের অধিকার তার। এ এমন আইন যার ফলে বৈপ্লবিক চক্রান্তের অছিলায় যে কোনো লোককে যে কোনো শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কী অপরাধ তা জানারও অধিকার নেই প্রজার,—তার শুধু অধিকার শাস্তিভোগের! এ এমন আইন যাতে নেই আর্জি, নেই উকিল, নেই আপীল। এই আইনের আক্রমণকে প্রতিরোধ করার উপায় কী?

এক উপায় অনুরোধ-উপরোধ। শিক্ষিত জনমত এই আইনের প্রতি বিরাগ প্রকাশে নিশ্চুপ হয়ে থাকেনি। সভাসমিতির মাধ্যমে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের মন্তব্যের মাধ্যমে সরকারের কাছে অনেক অনুরোধ করা হয়েছে। তবু সরকার টলেননি।

আর এক উপায় হিংসাত্মক সন্ত্রাসবাদ। বঙ্গব্যবচ্ছেদের যুগ থেকে সন্ত্রাসবাদের শুরু। ১৯০৮ সালে প্রথম সন্ত্রাসবাদী হত্যা। এমনি

হত্যা শুধু যে শাসকশ্রেণীকে বিচলিত করে তাই নয়,—সাধারণভাবে ভারতবাসীও এমনি গোপন হিংস্র পদ্ধতিতে বিরূপ। তাছাড়া সন্ত্রাসবাদের শহীদদের প্রতি সাধারণ মানুষের মমত্ববোধ ও গুপ্ত সমিতির প্রতি রোমান্টিক আকর্ষণ থাকলেও শাসকের ব্যাপক দমননীতিকে এই পন্থায় টলানো যাবে না। বরং রাওলাট আইনের বেড়াজাল সন্ত্রাসবাদীদের ঘিরতে কসুর করবে না।

বৃটিশ শাসকরা সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টাকে যতো ঘৃণাই করুক না কেন, শুধু তাদের জন্যে এ আইনের প্রয়োজন হয়নি। প্রয়োজন হয়েছিল গণমানুষের আন্দোলন প্রচেষ্টাকে দমন করবার জন্যে। শাসকের ক্ষমতার অপব্যবহারের যে কোনো সমালোচনা, শ্রমিকের বিক্ষোভ, কৃষাণের কান্না, মধ্যবিত্তের ব্যর্থতাবোধ—সব কিছুকে চাপা দেবার জন্যে এই আইন রচিত হয়েছিল। দেশের জনসমাজের জাগ্রত মনকে কারারুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল এই আইনের।

গান্ধীজী চিন্তা করলেন আর এক উপায়ের। এক অভিনব অস্ত্র দিয়ে তিনি যুদ্ধ করবেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী এনেছিলেন এই অস্ত্র। এই অস্ত্রের নাম সত্যাগ্রহ।

এই অস্ত্রের শক্তি কতোটুকু? পরীক্ষা হয়েছে মাত্র চম্পারণে আর খেদায়, আমেদাবাদের মালিক-শ্রমিক বিরোধে। সে সব নিতান্ত স্থানীয় সমস্যা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের বিরোধ। এ সমস্যা সারা দেশব্যাপী। একদিকে ভারত সরকার, অপর দিকে দেশের প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাবোধ।

সেই মানুষকেই গান্ধীজী ডাক দেবেন,—সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কৃষক, সেই শোষণ-তাড়িত শ্রমিক সেই হতাশা-জর্জর মধ্যবিত্ত। সত্যাগ্রহের ব্রতদীক্ষায় দীক্ষিত করে তাদের নিয়ে আগুয়ান হবেন। আত্মঅধিকার সকল মানুষের রক্ষাকবচ,—সেই অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সকল মানুষের অঙ্গীকার।

মিথ্যা অন্ধকার, আলোক সত্য। ভারতের জাতীয় জীবনে গান্ধীজীর আবির্ভাব সূর্যোদয়ের মতো। সূর্যের আলোকের মতো নির্ভয় জ্যোতির্ময় তাঁর সত্যাগ্রহ। তিনি মিথ্যাকে দূর করেছেন। চিত্তকে নির্ভয় করেছেন,—জাতিকে পথ দেখিয়েছেন। অনেক আত্মানুসন্ধানের তপস্যায় সে পথ তিনি একলা আবিষ্কার করেছেন,—আর সেই আবিষ্কৃত পথে দুর্গমের তীর্থযাত্রায় আহ্বান করেছেন জাতিকে।

করতে হবে,—কিছু করতে হবে। নিশ্চল হয়ে বসে থাকলে চলবে না, গণচিত্তকে ভীতি-পল্বলের গভীরে অবলুপ্ত করে দিলে চলবে না। কর্মের সহজ সরল সত্য পথের সন্ধান দিলেন গান্ধীজী।

আমেদাবাদ থেকে বোম্বাই। ইতিমধ্যে গান্ধীজী বড়লাটকে লিখিত অনুরোধ করেছেন রাওলাট কমিটির সুপারিশমতো কোনো দমনমূলক আইন তিনি যেন সৃষ্টি না করেন। কিন্তু সেই অনুরোধের কোনো ফল হয়নি। রাওলাট বিল রচিত হয়েছে,—আইন হিসেবে জারী হবার জন্যে প্রস্তুত। বোম্বাইতে গান্ধীজী তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচরদের ডাক দিলেন। তাঁদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর সত্যাগ্রহ সভা। সত্যাগ্রহ সভার কর্মীরা নেতার নির্দেশে অঙ্গীকার করল,—

আমরা আমাদের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে বিশ্বাস করি যে এই রাওলাট বিল বেআইনি,—স্বাধীনতা ও ন্যায়নীতির পরিপন্থী। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তা ব্যক্তির যে মৌলিক অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই অধিকারকে এই বিল ধ্বংস করতে উন্মুখ। অতএব আমরা এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছি যে এই বিল যদি আইনে পরিণত হয় এবং যতোদিন না পর্যন্ত সে আইন রদ হয়, ততোদিন আমরা ন্যায়সঙ্গত উপায়ে এই আইন মান্য করতে অস্বীকার করব। এক্ষেত্রে, সত্যাগ্রহ সভা যদি অন্য কোনো আইন অমান্যের নির্দেশ দেন সেই নির্দেশও আমরা মানব। এই সঙ্গে আমরা এও প্রতিজ্ঞা করছি যে এই সংগ্রামে আমরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সত্যকে অনুসরণ করব,—জীবন, মানুষ বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো হিংসাচরণ করব না।

সত্যাগ্রহ ও অহিংসা,—সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতের এই দুই অস্ত্র গান্ধীজীর দান। এই অস্ত্রের শক্তি যে কতো মহান তা শাসকবৃন্দ বুঝতেই পারেনি। ১৯১৯ এর ১৮ই মার্চ তারিখে রাওলাট আইন পাশ হোলো।

বোম্বাই থেকে মাদ্রাজ। মাদ্রাজে গেলেন গান্ধীজী। নেতাদের অনুরোধে সভাসমিতির বক্তৃতায় কোনো ফল হয়নি, সত্যাগ্রহ সভার অঙ্গীকারপত্রে টলানো যায়নি। কিন্তু এখনো ডাক দেওয়া হয়নি জনসাধারণকে। জনগণকে ডাক দিতে হবে,—সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণমানবের চেতনাকে সংঘবদ্ধ করতে হবে।

মাদ্রাজ থেকে গান্ধীজী তাঁর আহ্বান ঘোষণা করলেন। সেই আহ্বান প্রতিধ্বনিত হোলো সারা দেশে। সারা দেশ সাড়া দিল।

বিচিত্র সেই আহ্বান। ৩০শে মার্চ দেশব্যাপী হরতাল। সেদিন অন্য কোনো কাজ নয়। শুধু সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি। সত্যাগ্রহ বড়ো কঠোর প্রতিজ্ঞা, বড়ো কঠিন ব্রত। অহিংসা এই ব্রতের মূলমন্ত্র। আত্মশুদ্ধি এর প্রাথমিক প্রস্তুতি। ৩০শে মার্চ সমস্ত দেশবাসী আত্মশুদ্ধির জন্য উপবাস করবেন,—আত্মবিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করবেন। এ প্রার্থনা পরমেশ্বরের কাছে,—সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের যিনি পরমাত্মা,—তাঁর কাছে।

এই সর্বভারতীয় হরতালের দিন পরে পরিবর্তিত হয়েছিল। ৩০শে মার্চের বদলে ৬ই এপ্রিল। কিন্তু দিল্লী এই পরিবর্তনের খবর পায়নি। রাজধানী দিল্লীতে হরতাল পালিত হোলো ৩০শে মার্চ তারিখেই। তারপর সর্বভারতীয় হরতালে সারা দেশ উদ্বুদ্ধ হোলো ৬ই এপ্রিল।

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা ৩০শে মার্চ ১৯১৯। সেদিন রাজধানী নিশ্চল হয়ে গেল। বিদেশী শাসকের সমস্ত ভেদ-

চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিল্লীর সমস্ত হিন্দুমুসলমান হরতাল পালন করল। জনসভা হোলো।

হরতালের দিন শোকদিবস। এইদিন সংযমপালনের দিন। এইদিন সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য কাজকর্ম বন্ধ থাকবে। সমস্ত লোক সৎচিন্তায় ও সদালোচনায় দিন অতিবাহিত করবে। বিকেলবেলা সভায় যোগ দেবে। এই হোলো হরতালের নির্দেশ।

শাসকের হিংস্র স্বরূপ সেদিনই উদ্ঘাটিত হোলো।

দুপুরবেলা নিরস্ত্র জমায়েতের উপর গুলি আর মেসিনগান চলল। হতাহতের দেহগুলি পর্যন্ত আটকে রাখা হোলো।

বিকেলবেলা পঞ্চাশ হাজার লোকের জনসভা। সেই সভায় বক্তৃতা দিলেন আর্যসমাজের বিখ্যাত নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। কয়েকঘণ্টা আগে নিরীহ লোকের উপর গুলি চলেছে,—অগ্নিগর্ভ জনতা। স্বামীজীর বক্তৃতায় জনগণ শান্ত হোলো। তিনি তাদের অবিচলিত ধৈর্যে অহিংসাব্রত পালনে উপদেশ দিলেন,—নির্দেশ দিলেন সভার শেষে কোনো প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে নিজের নিজের ঘরে ফিরে যেতে।

ফেরার পথে চকের মোড়ে বাধা। সংযত জনতা, সংযত নেতা,—অসংযত পুলিস আর মিলিটারি। শান্ত শোভাযাত্রা চলেছে,—শোভাযাত্রাকে পরিচালনা করছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। দুপুরের ঘটনার কথা তখন সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। বিক্ষুব্ধ জনতা পাছে কোনো হিংসাত্মক কাজ করে বসে তাই স্বামীজীর এই সাবধানতা। তিনি সভাস্থল থেকে জনতাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে যাবেন,—তারপর যে যার বাড়ি যাবে।

ক্লক টাওয়ারের সামনে শোভাযাত্রা আটক হোলো। গুর্খা সৈন্যরা বন্দুক হাতে মোতায়েন। ভিড়ের দিকে উদ্দেশ্য-করে গুলি ছুড়ল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছুটে গেলেন বন্দুকধারী সৈন্যদের দিকে। একলা তিনি তাদের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন,—

নিরীহ নিরস্ত্র লোকদের উপর কেন তোমরা গুলি ছুড়ছ ?

একজোড়া রাইফেল তাঁর দিকে উদ্যত হোলো। কর্কশ গলায় এক গুর্খা সৈন্য বললে,—

তোমাকে গুলি করে মারব।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পরণে গৈরিক সন্ন্যাসীর পোশাক। তিনি বুকের উত্তরীয় সরিয়ে দিয়ে বললেন, -

এই আমি দাঁড়িয়ে আছি,—মারো আমার বুকে গুলি।

সঙ্গে সঙ্গে আট দশটি রাইফেল খাড়া হোলো। পিছনের লোকেরা চিৎকার করে উঠল,—

না, স্বামীজী না, আপনি সরুন। আমরা দাড়াই ওদের সামনে।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হাত উঁচু করে জনতাকে শান্ত করলেন। শান্ত হাসি হেসে তাদের মনে করিয়ে দিলেন অহিংসার প্রতিজ্ঞা। তারপর আবার ঘুরে দাঁড়ালেন বন্দুকের মুখোমুখি।

মারো, আগে গুলি মারো আমার বুকে।

স্তব্ধ ভয়ংকর কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর ছুটে এল এক বৃটিশ অফিসার।

বন্দুক নামাও,—সে হাঁক দিল,—গুলি করার হুকুম দিয়েছে কে ?

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মৃদু হাসলেন। হিংসার নিষ্ঠুর অস্ত্র এই মুহূর্তে অহিংস সত্যাগ্রহের কাছে পরাজিত হয়েছে। অপসারিত হোলো বাধা। স্বামীজী এগোলেন,—তার পিছনে পিছনে অগ্রসর হোলো অহিংস শোভাযাত্রা।

৬ই এপ্রিল তারিখে সবভারতীয় হরতাল। গান্ধীজী সেদিন বোম্বাইতে। হিন্দুমুসলমান পুরুষনারী হাজার হাজার বোম্বাইবাসী সেদিন জমায়েত হোলো চৌপট্টির সমুদ্রতীরে। সমুদ্রস্নানের পর শোভাযাত্রা ও জনসভা। সভায় বক্তৃতা দিলেন গান্ধীজী ও সরোজিনী নাইডু। দিল্লীতেও এদিন আবার হরতাল পালিত হোলো। হরতাল

শুধু বোম্বাই আর দিল্লীতে নয়। সারা ভারতের সমস্ত ছোট বড়ো শহরে। আমেদাবাদের সমস্ত দোকানপাঠ কলকারখানা বন্ধ রইল। কলকাতায় হরতালের সভায় যোগ দিল লক্ষ লোক।

৬ই এপ্রিলের হরতাল। শোভাযাত্রা ও জনসভাকে নিষিদ্ধ করে হুকুম জারী হোলো কেবল পাঞ্জাবে। হুকুম দিলেন পাঞ্জাবের গভর্ণর ও-ডায়ার। সার মাইকেল ও-ডায়ার সাত বছর ধরে পাঞ্জাব শাসন করেছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁব অবসর গ্রহণের কথা। দিল্লীর ৩০শে মার্চের ঘটনায় তিনি উৎসাহিত হলেন। লাহোরের স্থানীয় নেতাদের ডেকে এনে ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাদের ধমক দিলেন। বললেন, ৬ই এপ্রিলের হরতালের ব্যাপারে যদি কোনো গণ্ডগোল হয়, তাহলে তাঁদের তিনি কড়া শাস্তি দেবেন। সেই সঙ্গে কড়া হুকুম দিলেন,—সেদিন কোনো শোভাযাত্রা, কোনো সভা করা চলবে না।

গভর্ণর ও-ডায়ারের চোখের সামনে পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে লাহোর শহরে হরতাল প্রতিপালিত হোলো। সমস্ত কাজকর্ম দোকানবাজার বন্ধ রইল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বন্দুকধারী পুলিস ও মিলিটারি,—ইয়ুরোপীয় মহল্লার মুখে মেশিনগান। তবু সরকারী নির্দেশ অমান্য করে একাধিক শোভাযাত্রা ও জনসভা হোলো। রাওলাট আইনের উপযোগিতা জানিয়ে গভর্ণর নানা সদুপদেশভরা বিজ্ঞপ্তি ছড়িয়েছিলেন। লোকেরা ঘৃণা আর বিদ্রূপের অট্টহাস্য দিয়ে সেই সব সদুপদেশকে উড়িয়ে দিল,—বিজ্ঞপ্তির কাগজগুলিকে নিয়ে প্রকাশ্যে অগ্নিদাহ করল।

ও-ডায়ারের ধমককে ব্যর্থ করে অমৃতসর জালন্ধর প্রভৃতি পাঞ্জাবের অন্যান্য শহরেও শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হোলো। তবে ৬ই এপ্রিল সারা পাঞ্জাব জুড়ে কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না।

দুর্ঘটনার কথাও নয়। শুধু পাঞ্জাবে কেন, কোথাও নয়। এ আন্দোলন অহিংস আন্দোলন। তবে আবার এ আন্দোলন জনতার

আন্দোলন। তাই সত্যাগ্রহীদের চেষ্টা জনতা যাতে হিংসার পথে পা না বাড়ায়। সরকারেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত জনতা যাতে হিংসার কাজে প্ররোচিত না হয়। সরকার তা চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন হিংসা দিয়ে অহিংসার সঙ্গে যুদ্ধ করে অহিংসাকে পথভ্রষ্ট করতে।

দিল্লীতে হিংস্র ব্যাঘ্র রক্তের স্বাদ পেয়েছিল।

সত্যাগ্রহীরা বুঝতে পেরেছিলেন। দিল্লীর ঘটনা থেকে তাঁরা বুঝেছিলেন শাসকের নিষ্পেশন কতো বীভৎস রূপ নিতে পারে,—সেই বীভৎসতার মুখোমুখি জনতাকে স্থির রাখাও কতো শক্ত। ৩০শে মার্চের পরেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গান্ধীজীকে ডাক দিয়েছিলেন দিল্লীতে।

সারা মহাযুদ্ধের সময় পাঞ্জাবে বিভীষিকার রাজত্ব চালিয়েছিলেন গভর্ণর ও-ডায়ার। কৃষক, জমিদার, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত কাউকে তিনি রেহাই দেননি। সবচেয়ে অত্যাচার চালিয়েছিলেন যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপারে। লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাঁর কুশাসনে। ৬ই এপ্রিল ভালোভাবে কাটে। ও পাঞ্জাবের নেতারা বুঝেছিলেন ও-ডায়ার সহজে ছাড়বেন না। চক্রে তিনি শান দিচ্ছেন। তাঁরাও আহ্বান করলেন গান্ধীজীকে পাঞ্জাবে। তিনিই পাঞ্জাবের মানুষকে সামলাতে সংযত রাখতে পারবেন।

গান্ধীজী বোম্বাই থেকে দিল্লী যাত্রা করলেন ৮ই এপ্রিল রাত্রে। দিল্লীর জনতার বিক্ষোভ তিনি প্রশমন করবেন। তার পর যাবেন পাঞ্জাবে। সেখানে বিভিন্ন শহরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি মিলিত হবেন। তাদের উত্তেজনা দমন করবেন,—শোনাবেন সত্যাগ্রহ ও অহিংসার মর্মকথা।

পরদিন সকালে ট্রেন যখন মথুরা পৌছল তখনই তিনি গুজব শুনলেন তাঁকে দিল্লী যেতে দেওয়া হবে না,—পথে গ্রেপ্তার করা হবে। দিল্লী থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে পালওয়াল স্টেশন। এই স্টেশনে পৌছবার আগে তাঁর কামরায় পুলিশ উঠল। তাঁর হাতে দিল

লিখিত হুকুমনামা। পাঞ্জাবের সীমান্তমধ্যে তাঁর প্রবেশ নিষেধ,—কেননা তাঁর উপস্থিতিতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা। অতএব পালওয়াল স্টেশনে তাঁকে ট্রেন থেকে নেমে যেতে হবে।

গান্ধীজী মৃদু হেসে বললেন,—

দেশবাসীর জরুরী আমন্ত্রণে আমি পাঞ্জাবে চলেছি। তাছাড়া আমি চলেছি শান্তিভঙ্গের জন্যে নয়,—শান্তিস্থাপনের আশা নিয়ে। অতএব এ হুকুম মানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

পালওয়াল স্টেশনে ট্রেন থামল। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ প্ল্যাটফরমে নামিয়ে নিল। পুলিসের দল তাঁকে একটা ফিরতি ট্রেনের থার্ড ক্লাসে তুলল ও মথুরা পর্যন্ত নিয়ে গেল। মথুরাতে তারা তাঁকে তুলল পুলিস ব্যারাকে। সেখানে তিনি রাত কাটালেন। পর দিন ভোর চারটের সময় পুলিস তাঁকে আবার নিয়ে চলল স্টেশনে। বোম্বাইগামী এক মালগাড়িতে তাঁকে তোলা হোলো। মথুরা থেকে সোয়াই-মাধোপুর পর্যন্ত চলতি মালগাড়িতে গান্ধীজী বন্দী রইলেন। সোয়াই-মাধোপুরে তাঁকে নামানো হোলো। এবার বন্দীর জিম্মা নিলেন আর এক পুলিস কর্তা। তিনি তাঁকে ভালোয় ভালোয় বোম্বাই ফিরে যেতে বললেন। গান্ধীজী অস্বীকার করাতে বন্দী অবস্থায় আবার তাঁকে ট্রেনে তোলা হোলো। এবার অবশ্য মালগাড়ি নয়। বোম্বাইগামী মেল ট্রেন। বোম্বাইতে পৌঁছে গান্ধীজী মুক্তি পেলেন।

৬ই এপ্রিল সমস্ত দেশব্যাপী হরতালে লক্ষ লক্ষ জনতা আদর্শ অহিংসা পালন করেছিল। এমনকি ও-ডায়ারের শাসন-তাড়িত পাঞ্জাবও। পরবর্তী তিনদিন সারাদেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। ইতিমধ্যে ও-ডায়ার খবর পেলেন যে গান্ধী দিল্লী যাত্রা করেছেন। আর দিল্লী থেকে পাঞ্জাবেও তিনি আসবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হুকুম জারি করলেন যে গান্ধী পাঞ্জাবে ঢুকতে পারবেন না। রাজধানী

দিল্লীতে তাঁর প্রবেশ নিষেধ করে ভারত সরকারও অনুরূপ নির্দেশ দিলেন।

কেন এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? শান্ত অহিংস দেশবাসীকে সহিংস বিপ্লবের পথে গান্ধীজী পরিচালনা করবেন এই আশঙ্কায় নিশ্চয় নয়। গান্ধীজীর আহ্বানে সারা ভারত সাড়া দিয়েছিল। জনতার এই জাগরণে বিদেশী শাসক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণে ভেবেছিল, জনতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থেকে ঐ দীনবাস শীর্ণদেহ আশ্রমবাসী নেতাকে যদি অপসৃত করা যায় তাহলে জনতার উন্নত শিরকে সহজে নত করা যাবে।

নির্দেশ সফল হয়নি। সেই অসাফল্যের প্রতিহিংসা জালিয়ান-ওয়ালাবাগের ঘটনা।

॥ ৭ ॥

গান্ধীজী আসবেন না। দিল্লীর পথ বন্ধ, পাঞ্জাবে ওরা ঢুকতে দেবে না তাঁকে। গান্ধীজীকে ওরা আটক করেছে,—পথের মধ্যে বন্দী করে কোথায় সরিয়ে ফেলেছে। সারা ভারতে বিদ্যুৎগতিতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল। উত্তাল হোলো দেশবাসীর মন।

তিনদিন পরে গান্ধীজীর আবার দেখা মিলল বোম্বাই-এ। বিভ্রান্ত উৎক্ষিপ্ত জনতার মাঝখানে গান্ধী গিয়ে দাঁড়ালেন। সহস্র সহস্র লোক প্রিয় নেতাকে কাছে পেয়ে আনন্দে উল্লাসে বজ্রগর্জন করে উঠল। জনতার সেই উল্লাস-উদ্দীপনাকে নিষ্ঠুর হিংস্রতায় পদদলিত করল ঘোড়সওয়ার পুলিসের দল। গান্ধী জনতাকে শান্ত করলেন। গেলেন পুলিস-কমিশনারের কাছে। জনতার উপর পুলিসী হামলার প্রতিবাদ জানাতে।

শান্তভাবে গান্ধীজী বললেন,—নিরস্ত্র নিরীহ শোভাযাত্রার উপর ঘোড়সওয়ার পুলিস লেলিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন কী? অহিংস মানুষের উপর এমনি অত্যাচার করা কি উচিত?

বোম্বাই-এর পুলিস-কমিশনার বললেন,—নিরস্ত্র? অহিংস? আপনি একদিকে লোককে বলেছেন আইন অমান্য করতে, অন্যদিকে বলেছেন অহিংস থাকতে। আপনার এই আন্দোলন কোন পথে চলেছে আমরা জানি। বে-আইনি কাজ লোকে শান্তিপূর্ণভাবে করেনা। উন্মত্ত অশান্ত জনতাকে শায়েস্তা করবার উপায় আমাদের জানা আছে।

গান্ধীজী বললেন,—এ আপনি কী বলছেন? সাধারণ মানুষ স্বভাবতই শান্ত। কোনো গণ্ডগোল করতে তারা চায় না।

বটে? তারা সবাই অহিংসবাদী? আপনার কথা যদি মিথ্যা হয়?

গান্ধীজী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,—

তাহলে এই আইন অমান্য আন্দোলন আমি বন্ধ করে দেব।

তবে শুনুন, পুলিস-কমিশনার বললেন,—

এ কদিনে আমেদাবাদে কী হয়েছে জানেন? জানেন অমৃতসরে কী কাণ্ড ঘটছে? লোক পাগল হয়ে গেছে। টেলিগ্রামের তার উপড়ে ফেলেছে। তাই সব খবর আমি এখনো পাইনি, কিন্তু মনে রাখবেন সব গণ্ডগোলের মূলে আপনি। অহিংসার নামে যা তাণ্ডব শুরু হয়েছে তার দায়িত্ব আপনার।

গান্ধীজী বললেন,—

আমেদাবাদের মানুষকে আমি চিনি। সেখানে যদি কোনো গণ্ডগোল হয়ে থাকে তার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু অমৃতসরের জন্যে আমি দায়ী নই। অমৃতসরে আমি কখনো যাইনি,—সেখানে কেউ আমাকে চেনে না। তবে পাঞ্জাবে কোথাও যদি কোনো অঘটন ঘটে থাকে তার জন্যে পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টই দায়ী। আমাকে যদি পাঞ্জাবে যেতে দেওয়া হোতো আমি সেখানে শান্তি বজায় রাখতে পারতাম। সরকারই পাঞ্জাবের মানুষকে অকারণে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছেন।

গান্ধীজী দেরি করলেন না। চৌপাটির সমুদ্রতীরে এক সভা ডাকলেন। সেই সভায় জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—

আমি সত্যাগ্রহের সংগ্রামে জনসাধারণকে আহ্বান করেছি। সত্য ছাড়া সত্যাগ্রহ হয় না। আর অহিংসাই পরম সত্য। কায়মনোবাক্যে যদি অহিংসা পালন আপনারা না করেন তাহলে এই সংগ্রাম ব্যর্থ হবে।

তারপর তিনি যাত্রা করলেন আমেদাবাদ।

দিল্লীর পথে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হয়েছেন এ খবরে যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হোলো আমেদাবাদের লোক। আরো গুজব রটল যে অনসূয়া

বেনকেও পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে। অনসূয়া বেন আমেদাবাদের শ্রমিকদের মাথার মণি, গান্ধী তাদের বুকের ধন। শ্রমিকরা পাগল হয়ে গেল যেন। তারা কলকারখানা ছেড়ে পথে দৌড়ল। মাঠে ময়দানে আর রাস্তার মোড়ে নেতৃত্বহীন উত্তেজিত জনতা।

কী করবে তারা? কোন্ পথে হবে তাদের বিক্ষোভের প্রকাশ? বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি উঠল, সেই ধ্বনিতে গলা মেলালো হাজার লোক। হিংসাত্মক শ্লোগান উঠল, সেই শ্লোগানের পিছু পিছু দৌড়ল জনতা। টেলিগ্রাফের তার কাটল, পুলিসের উপর ইট ছুড়ল, সরকারি বাড়ি পুড়োলো। নদিয়াদ স্টেশনের ধারে রেল লাইন উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করল। গুলি চলল অনেক বার,—সারা আমেদাবাদে সামরিক শাসন কায়েম হোলো। সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে দুজন অফিসার ও আটাশ জন সাধারণ মানুষ নিহত ও একশো তেইশ জন আহত হোলো। সম্পত্তির যা ক্ষতি হোলো তার দাম প্রায় দশ লাখ।

সারা আমেদাবাদ জুড়ে শ্রমিক আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিস আর সৈন্যদলের লড়াই চলল কদিন। এমন সময় গান্ধীজী আমেদাবাদ পৌঁছলেন। তাঁর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে যেন আশ্চর্য মন্ত্রবলে সমস্ত শহর শান্ত হোলো।

জনতাকে গান্ধীজী কঠোর ভর্ৎসনা করলেন। বললেন,—

সত্যাগ্রহের মানে হিংসা নয়, লুটতরাজ নয়, অগ্নিকাণ্ড নয়। কিন্তু গত দুদিন ধরে সত্যাগ্রহের নামে এই সব হীন কাজ আমরা করেছি। বাড়ি পুড়িয়েছি, অস্ত্র কেড়েছি, অর্থ ছিনিয়েছি, ট্রেন থামিয়েছি, টেলিগ্রাফের তার কেটেছি। নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছি, বাড়িঘর ভেঙে লুট করেছি। এমনি অন্যায় কাজের জন্যে যদি আমাকে জেলে যেতে হয় বা ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়,—সেই শাস্তি থেকে আমি পরিত্রাণ পেতে চাইনে।

সত্যাগ্রহের পরীক্ষা গান্ধীজী করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সে

পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছিলেন। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহের যে ডাক গান্ধীজী দিয়েছিলেন, সেই ডাকে সর্বভারতের জনতা সাড়া দিয়েছিল,—কিন্তু সেই জনতা সত্যাগ্রহে দীক্ষিত ছিল না। সত্যাগ্রহের শিক্ষা তারা পায়নি। ব্যাপকভাবে সারা দেশের মানুষ সত্যাগ্রহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়নি।

সত্যাগ্রহের শিক্ষা সহজ শিক্ষা নয়। সত্যাগ্রহের লড়াই দৈহিক শক্তির সঙ্গে দৈহিক শক্তির নয়,—অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রের নয়। বিবেকের সঙ্গে বিবেকের। এই লড়াই-এ সত্যাগ্রহী তার শত্রুর অন্তরকে জয় করে, তার মলিন মনকে পরিচ্ছন্ন করে, তার বিবেককে জাগ্রত করে, তার অন্যায়বোধকে পরাভূত করে। সত্যাগ্রহই অন্যায়ের পরাজয় ও ন্যায়ের জয়ের চিরন্তন উপায়।

সত্যাগ্রহ শ্রেষ্ঠ বিপ্লব,—ব্যবহারিক বিপ্লব বাস্তবিক পরিবেশকে পরিবর্তিত করে, সত্যাগ্রহ পরিবর্তিত করে চৈতন্যকে। সত্যাগ্রহ সত্যের পরীক্ষা,—এই আত্মপরীক্ষা সত্যাগ্রহীর নিয়ত সাধনা।

অহিংসা সত্যাগ্রহের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। অহিংসা অক্ষমের আত্মস্তোক নয়, অশক্তের আত্মসমর্পণ নয়, ভীরুর কাপুরুষতা নয়। অহিংসা মহান্ শক্তি। এই শক্তির কাছে মানুষের পাশবশক্তি শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য। কেননা মানুষের মধ্যে মানুষ আর পশু দুইই আছে। কিন্তু পশুর চেয়ে মানুষ বড়। সংস্কৃতির জয়যাত্রা মানবতার জয়যাত্রা। এই যাত্রার পরম পাথেয় অহিংসা ও প্রেম।

গান্ধীজী সত্যদ্রষ্টা ছিলেন, স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না। স্বাধীনতার স্বপ্নমাত্র তিনি দেখেননি, স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না। স্বাধীনতার সংগ্রামকে তিনি সত্যাগ্রহের পথে পরিচালিত করেছিলেন,—সত্য হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা।

কিন্তু সেদিন আমেদাবাদের অবস্থা দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। আমেদাবাদ তার প্রিয় শহর,—এরই প্রান্তে তাঁর সাবরমতী আশ্রম।

মাত্র এক বছর আগে এই আমেদাবাদের মিল-শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাদের অহিংস সংগ্রামকে সাফল্যের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

সে এক আশ্চর্য সংগ্রাম। আমেদাবাদের মিল-শ্রমিকরা বহুদিন ধরে ন্যায্য মজুরীর দাবী করে আসছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ নির্বিকার। গান্ধীজী আমেদাবাদে গেলেন। শ্রমিকদের দাবীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। মালিকপক্ষকে অনুরোধ করলেন সালিসীর মাধ্যমে এই দাবীর মীমাংসা করতে। মালিকপক্ষ অটল। গান্ধীজীর কোনো সদুপদেশই তাঁরা শুনলেন না।

শ্রমিকরা গান্ধীজীকে বললে,—

আপনি আমাদের নেতা হোন, আপনি আমাদের পথ দেখান।

গান্ধীজী শ্রমিকদের ধর্মঘটের নির্দেশ দিলেন। তবে তাদের কাছে তিনটি প্রতিজ্ঞা তিনি দাবী করলেন। প্রথম প্রতিজ্ঞা,—তারা কোনো কারণে কখনো কোনো হিংসাত্মক কাজ করবে না। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা,—যদি কোনো শ্রমিক মালিকের হয়ে ধর্মঘটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেই শ্রমিকের উপর কোনো নির্যাতন করবে না। আর তৃতীয় প্রতিজ্ঞা,—কখনো কোনো ভিক্ষা নেবেনা

শ্রমিকরা প্রতিজ্ঞা করল। সেই সঙ্গে আরো প্রতিজ্ঞা করল যে যতোদিন পর্যন্ত মালিক তাদের দাবী মেনে না নেবেন বা সালিসীর মাধ্যমে মীমাংসায় রাজি না হবেন ততোদিন তারা ধর্মঘট চালিয়ে যাবে।

ধর্মঘট শুরু হোলো। শ্রমিকরা অবিচলিত রইল তাদের প্রতিজ্ঞায়। দিনের পর দিন তারা দলে দলে গান্ধীজীর সভায় আসতে লাগল। স্মরণ করতে লাগল তাদের প্রতিজ্ঞা। মালিকপক্ষও অটল।

পুরো দু-সপ্তাহ এমনি কাটল। গান্ধীজী দেখলেন শ্রমিকরা দুবল হয়ে পড়ছে, শিথিল হয়ে আসছে তাদের মনোবল। তারা দরিদ্র,—এক সপ্তাহের মজুরি না পেলে তাদের অন্ন জোটেনা। তারা হতাশ

চঞ্চল হয়ে ঘোরে, ঘরের রমণীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে, শিশুরা কাঁদে।

গান্ধীজীর সভায় জনসমাগম কমে আসতে লাগল। বিভেদ প্রকাশ পেতে লাগল, শ্লথ হয়ে এল প্রতিজ্ঞার বন্ধন। কেউ কেউ দল ভাঙবার উপক্রম করল, অপরে ঠিক করল তাদের উচিত শিক্ষা দেবে। অহিংস আন্দোলনের মাঝখানে বিক্ষুব্ধ হিংসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। গান্ধী দেখলেন এই হিংসা আর হতাশাকে যদি তিনি রোধ করতে না পারেন তাহলে শ্রমিকরা হারতে বাধ্য।

শ্রমিকদের পরবর্তী সভায় তাঁর এই সংশয় আর আশঙ্কার কথা তিনি অকপটে বললেন। তারপর তিনি ঘোষণা করলেন,—

শ্রমিকরা যদি সংঘবদ্ধ না হয়, যারা দল ভেঙে মিলে ঢুকেছে তারা যদি সবাই মিল ছেড়ে বেরিয়ে না আসে, সম্মানজনক নিষ্পত্তির আগে পর্যন্ত যদি তারা ধর্মঘট চালিয়ে না যায় তাহলে আমি অনশন করব।

গান্ধীজীর এই অনশনে সারা আমেদাবাদ হায়-হায় করে উঠল। শ্রমিকরা ঘিরে ধরল তাঁকে,—জানালো তাদের দৃঢ়সংবদ্ধ প্রতিজ্ঞা। বললে এই উপবাসে তারাও তাঁর সঙ্গী হবে। নেতার যে ব্রত, সে ব্রত তাদেরও

মালিকপক্ষেরও টনক নড়ল। অহিংস ধর্মঘট সত্যাগ্রহের পরীক্ষা। তাদের জেদ ভাঙল। তাঁরা উপলব্ধি করলেন শ্রমিকদের আন্দোলনের যাথার্থ্য।

গান্ধী মালিকদের বললেন,—আমার প্রায়োপবেশনে আপনারা বিচলিত হবেন না। আমি শ্রমিকদের পক্ষে, শ্রমিকদের মনের কাছে আমি পৌঁছতে চাই,—তাই আমার এই ব্রত। আপনারা স্থির থাকুন।

কিন্তু মালিকপক্ষ স্থির থাকতে পারলেন না। গান্ধীজীর প্রায়োপবেশনে তাঁদের মনের পরিবর্তন হোলো। তাঁরা আপোষ নিষ্পত্তিতে রাজি হলেন। বিরোধের মীমাংসা হোলো। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী মিটল।

জয় হোলো সত্যাগ্রহের।

এই সেই আমেদাবাদের শ্রমিক। যাদের নিয়ে তিনি এক সত্যাগ্রহ সংগ্রামে জয়লাভ করেছিলেন। এবার তারা তাঁর মান রাখেনি। তাঁকে ভালোবেসে তারা পাগল হয়েছে সন্দেহ নেই,—কিন্তু সেই ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে তারা যে কাজ করেছে তাতে জলাঞ্জলি দিয়েছে তাঁর অনুজ্ঞা আর আদর্শ।

আমেদাবাদের কর্তৃপক্ষও দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। এই উত্তাল জনজোয়ারকে সামলে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। গান্ধীজীকে দেখে তারাও বাঁচল।

কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে গান্ধীজী সাবরমতী আশ্রমে সভা ডাকলেন। সভায় তিনি বললেন,—

শান্তির শিক্ষা বিনা সত্যাগ্রহের শিক্ষা হয় না। সত্যাগ্রহী অশান্তির সৃষ্টি করে না, অশান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সত্যাগ্রহী অহিংস,—সে হিংসা করে না, অহিংসা দিয়ে সে হিংসাকে জয় করে। সত্যাগ্রহী সমাজের সত্য নীতিকে আপন স্থিরবুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে মান্য করে,—সেই শক্তিতেই সে আবার বিবেকবান চিত্তে সমাজবিরোধী অসত্য ও অন্যায় আইনকে অমান্য করতেও আগুয়ান হয়।

শ্রোতাদের তিনি বললেন,—

আমেদাবাদবাসীর হিংসাত্মক কার্যের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমি তিনদিন অনশন করব। আপনারাও অন্তত আমার সঙ্গে একদিন অনশন করুন ও কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে যার যার অপরাধ স্বীকার করুন।

সেইদিনই আমেদাবাদে পূর্ণ শান্তি নেমে এল। সামরিক শাসনও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাহৃত হোলো।

৬ই এপ্রিল ১৯১৯ ভারতে গণসত্যাগ্রহের প্রথম পরীক্ষা।

পরাধীন ভারতের গণ-আন্দোলনের প্রথম সূচনা। সমগ্র ভারতের জনসমাজের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন গান্ধীজী এইদিন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে দেশে জনতার আন্দোলন কম হয়নি। শ্রমিকের আন্দোলন, কৃষকের আন্দোলন। অর্থনৈতিক শোষণ এই সব আন্দোলনের ভিত্তি,—নিপীড়ন থেকে এইসব আন্দোলনের জন্ম। কিন্তু এপর্যন্ত এসব আন্দোলন স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। স্থানীয় সমস্যা, স্থানীয় মানুষ, স্থানীয় নেতৃত্ব। সেই সব স্থানীয় আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করা সরকারের পক্ষে শক্ত হয়নি।

বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় থেকে মোটামুটি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের সূচনা। নিষ্ঠুরতার অস্ত্র নিষ্ঠুরতা। গভীর অন্ধকারে মুখ লুকোনো অন্তর্জ্বালা। মাঝে মাঝে ভয়ংকর অগ্ন্যুৎপাতের মতো তার প্রকাশ। নিরস্ত্র নিরীহ অসহায় দেশবাসী,—আত্মবলিদানব্রতী সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল, মমতা ছিল, শ্রদ্ধা ছিল,—কিন্তু ব্যাপক যোগ ছিল না।

জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। উচ্চশিক্ষিত অভিজাত উচ্চ সমাজের প্রতিষ্ঠান। বিদেশী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়েই একদা তার প্রতিষ্ঠা। দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের সমাবেশ সন্দেহ নেই,—কী শিক্ষায়, কী আদর্শে, কী সংবেদনে। তাঁদের অধিকাংশই নরমপন্থী, কেউ কেউ বা চরমপন্থী। কিন্তু আবেদন-নিবেদনই তাঁদের সম্বল,—ধিক্কার ও দুঃখপ্রকাশই তাঁদের অস্ত্র। কংগ্রেসের অধিবেশনে ইংরেজ রাজ-পুরুষরা নিমন্ত্রিত হতেন। তাঁরা ভিক্ষাপূরণ করবেন, এই আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁদের সহৃদয়তার অভিমুখে তুলে ধরা হোত। তাঁরা পিঠ চাপড়াতেন, মুচকি হাসতেন। এই আশা-আকাঙ্ক্ষার চরম ব্যর্থতা রাওলাট আইন। কংগ্রেস নেতারা একযোগে এই আইনের প্রতিবাদ করেছিলেন,—কিন্তু তার বেশি আর কিছু করার তাঁদের ছিল না।

এমন সময় এলেন গান্ধীজী। তিনি উপরতলা থেকে আসেননি, গণমানসের গভীরতা থেকে তাঁর উদয়। সাধারণ মানুষের বুকেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। সমস্ত ভারতবর্ষ তিনি ঘুরেছিলেন ট্রেনের থার্ড ক্লাস কামরায় এই সাধারণ মানুষকে চিনবার জন্যে। দুর্গত শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়েছিলেন আমেদাবাদে। দীনতম কৃষাণের প্রাণের আকুতিকে তিনি হৃদয়ংগম করেছিলে চম্পারণে ও খেদায়।

১৯১৯-এর আগে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত শিথিল ছিল। তিনি তখনো কংগ্রেসের নেতা হননি। কংগ্রেস বুঝতেই পারেনি কখন কেমন করে তিনি জাতির নেতারূপে বরণীয় হয়েছেন। তাঁর আহ্বানে সারা দেশ সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

নেতৃত্বের উচ্চমঞ্চে বসে তিনি আহ্বান করেননি। আশ্রমের অঙ্গন থেকে ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর বাণী। জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে তিনি ডাকেননি,—তাঁর পশ্চাতে ছিল তাঁর সত্যাগ্রহ সভার কয়েকজন মুষ্টিমেয় অনুগত সদস্য।

৬ই এপ্রিল প্রথম গণ-প্রতিরোধ। গণ-সংগ্রামের সূচনা,—যে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নীচ, শ্রমিক ও কৃষক, হিন্দু ও মুসলমান। সারা দেশ এ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। গণ-অভ্যুত্থানের এই বিশাল রূপের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর কোনো পরিচয় ছিল না। তারা আশ্চর্য হয়েছিল, চমকে উঠেছিল, ভয় পেয়েছিল। এতো মানুষকে একত্র হয়ে একযোগে প্রতিরোধের প্রাচীর তুলতে কখনো তারা দেখেনি। তাই তারা শহরে শহরে অসংখ্য সৈন্যসামন্ত মোতায়েন করেছিল, মজুত করেছিল প্রচুর রণসম্ভার। নিরস্ত্র জনতার উপর সামান্যতম কারণে বর্বর অত্যাচার চালিয়েছিল। এই বিপুল আন্দোলনের অদ্বিতীয় নেতা যদি রাজধানীতে উপস্থিত হন, তাহলে কী মহাবিপর্যয় হবে তাই ভেবে তারা আতঙ্কিত হয়েছিল।

জনতার প্রিয় নেতা গান্ধীজীকে যদি দিল্লীর পথে গ্রেপ্তার করা

না হোতো, তাহলে তাঁর অহিংস আন্দোলন কোন্ চূড়ান্ত সাফল্যের পথে আগুয়ান হোতো তা আমরা কল্পনাই করতে পারি। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হয়েছেন এই খবরে জনতা হিংসার পথ ধরেছিল,—আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞা থেকে।

সত্যাগ্রহের এই প্রথম পরীক্ষা। এ পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। এই পরীক্ষায় উজ্জ্বলতর হয়েছিল গান্ধীজীর আদর্শ। সত্যাগ্রহ শুধু অহিংসামন্ত্র নয়, অভয়মন্ত্র। হিংসার মুখে যে সম্পূর্ণ অহিংসার বর্ম পরে দাঁড়াতে পারে, সেই পরম নির্ভীক। যেমন দিল্লীর রাজপথে নৃশংস সৈনিকের উদ্যত অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রদ্ধানন্দজী। ভয়কে জয় করতে না পারলে মন থেকে হিংসাকে নির্মূল করা যায় না।

এই প্রাথমিক পরীক্ষার ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই দৃঢ়সংবদ্ধ হয়েছিল জাতীয় আদর্শ। উজ্জীবিত হয়েছিল জাতীয় সংগ্রামের প্রেরণা। সফলতা বিফলতার মধ্য দিয়ে গণসংগ্রাম অগ্রসর হয়েছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে। আর সারা বিশ্বের আদর্শবাদী মানুষ সাগ্রহ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিল এই সংগ্রামের অধ্যায়ের পর অধ্যায়।

॥ ৮ ॥

জালিয়ানওয়ালাবাগ।

পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ জনতীর্থ। শুধু পাঞ্জাবের নয়, সারা ভারতের। নিরস্ত্র নিরীহ অহিংস জনতার রক্তস্রোতে এই তীর্থ অমর। অবিস্মরণীয় এর মাহাত্ম্য।

গান্ধীজী আগে কখনো পাঞ্জাবে যাননি পাঞ্জাবের অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, কিন্তু পাঞ্জাববাসীরা তাঁকে চিনত। চিনত শ্রমিক-কৃষাণের বন্ধু বলে, সাধারণ মানুষের সখা বলে। তাই ৬ই এপ্রিল তাঁর হরতালের আহ্বানে পাঞ্জাবের প্রতিটি জনপদ সাড়া দিয়েছিল। সমস্ত প্রদেশে শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল প্রতিপালিত হয়েছিল।

৬ই এপ্রিলের হরতাল ও জনসভাকে প্রকাশ্যভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন পাঞ্জাবের গভর্ণর ও-ডায়ার। তিনি সত্যাগ্রহ নেতাদের কঠোরভাবে সাবধান করেছিলেন,—ঘোষণা করেছিলেন এদিন যদি কোনো সভা শোভাযাত্রা করা হয় তা বে-আইনি হবে। আইন ভাঙলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে

জনসাধারণ তাঁর হুকুম মানেনি,—তাঁর দাপটে ভয় পায়নি। জনতার এই দৃঢ়সংবদ্ধ একতা দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, ভয়ও পেয়েছিলেন। গত সাত বছর তিনি সারা পাঞ্জাবে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে এসেছেন। কর-আদায়ের নামে নিষ্ঠুর শোষণ করেছেন, মহাযুদ্ধের সৈন্যসংগ্রহের নামে চাষী-জমিদারের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছেন। প্রজার সামান্য প্রতিবাদকে টুঁটি টিপে হত্যা করেছেন। শিক্ষিত দেশাত্মবোধীদের সঙ্গে কুকুর-শেয়ালের মতো ব্যবহার করেছেন। কেউ টুঁ শব্দ করতে পারেনি।

কে এই গান্ধী? কী তার চুম্বক-আকর্ষণ? যার কথায় আজ সারা পাঞ্জাব মাথা তুলে দাঁড়াল? গ্রাহ্য করল না তাঁর রক্তচক্ষুর ভ্রূকুটীকে? তাঁর চোখের সামনে তাঁর সৈন্যদের বন্দুক-বেয়নেটকে উপেক্ষা করে সারা লাহোরে হরতাল করল,—সভা করল, শোভাযাত্রা করল? দেখতে হবে এই গান্ধীর কতো বড়ো প্রতাপ!

পাঞ্জাবের সত্যাগ্রহী নেতারাও ভয় পেয়েছিলেন এই উদ্বুদ্ধ জনতাকে। তাঁরা বুঝেছিলেন দেশবাসীর উপর এবার শুরু হবে প্রচণ্ড অত্যাচারের অভিযান। সেই অত্যাচারের মুখে জনগণ কি অহিংসায় অটল থাকতে পারবে? আঘাতে বেদনায় উন্মাদ হয়ে তারা কি হিংস্র প্রতিরোধের পথে ঝাঁপ দেবে না? কে তাদের সংযত রাখবে? কে তাদের বিক্ষুব্ধ উত্তাল প্রাণে জাগ্রত রাখবে সত্যাগ্রহের শান্তিমন্ত্র? কয়েকমাস আগে কংগ্রেস অধিবেশনে এই কথাই কী আলোচিত হয়নি যে ও-ডায়ারের অত্যাচারে অনাচারে সারা পাঞ্জাব এক ভীষণ আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে, কখন তার অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয় কেউ বলতে পারে না?

৬ই এপ্রিলের শান্তি পাঞ্জাবে কদিন বজায় থাকবে সে সম্বন্ধে স্থানীয় নেতাদের সন্দেহ ছিল। ডাক্তার সত্যপাল, ডাক্তার কিচলু ও পণ্ডিত রামভূজ দত্ত গান্ধীজীকে পাঞ্জাবে আহ্বান করলেন। গান্ধীজী শান্তির দূতরূপে যাত্রা করলেন পাঞ্জাবে। তাঁর পথরোধ করলেন গভর্ণর ও-ডায়ার। গান্ধীজীর শক্তিকে বুঝতে পারেননি ও-ডায়ার,—বুঝতে চাননি। দম্ভে তিনি অন্ধ হয়েছিলেন। হরতালের সাফল্য দেখে ক্রোধে তিনি আত্মহারা হয়েছিলেন। তিনি গভর্ণর,—প্রদেশের শান্তিরক্ষক। গান্ধী যে শান্তিরক্ষার ব্রতে তাঁকেই সাহায্য করতে আসছেন, সেই আস্থার ঔদার্য তাঁর ছিল না।

ও-ডায়ারের নির্দেশে গান্ধীজীকে পাঞ্জাবে ঢুকতে দেওয়া হোলো না। পথের মধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোলো। এ খবর পাঞ্জাব-বাসীরাও শুনল ১০ তারিখে। সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল।

ও-ডায়ার প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি লাহোর শহরের সরকারী অফিস, জিমখানা ক্লাব, সাহেবী হোটেল ও সিভিল লাইন্‌সে কড়া পুলিস ও মিলিটারি পাহারা বসালেন। ঘোষণা করলেন,—বিদ্রোহী জনতা ইংরেজ নারী ও শিশুদের উপর আক্রমণ চালাতে পারে, এমনি ক্ষেত্রে জনতাকে হটাবার কাজে পুলিস ও মিলিটারি কোনো প্রকার বিব্রতবোধে যেন অভিভূত না হয়। বন্দুকের একটি গুলিও আকাশে ছুঁড়ে নষ্ট না করে বিদ্রোহ দমনের প্রত্যক্ষ কাজে যেন ব্যবহার করা হয়। পাঞ্জাবের অন্যান্য শহরের পুলিস ও মিলিটারিকেও তিনি প্রস্তুতির কঠোর নির্দেশ দিলেন।

১০ই তারিখে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে লাহোরের দোকান বাজার সব বন্ধ হয়ে গেল। প্রথম পথে বার হোলো ছাত্ররা। দু-তিনশো ছাত্রের একটি বিক্ষোভ শোভাযাত্রা ম্যালে জড়ো হোলো। হাইকোর্টের সামনে পুলিস তাদের পথরোধ করল। ছাত্ররা অগ্রসর হোলো না, কিন্তু পিছনেও তারা হটল না। ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিস্‌ট্রেটের নির্দেশে পুলিস তাদের উপর গুলি চালাল। ইতিমধ্যে লাহোরী গেট দিয়ে আর এক বিরাট জনতা শোকসূচক কৃষ্ণপতাকা নিয়ে আনারকলি বাজার পার হয়ে ম্যালে এসে পৌঁছল। এই জনতার উদ্দেশ্য, গভর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা। প্রায় দশ হাজার লোকের এই জনতার মুখোমুখি দাঁড়ালেন ইংরেজ ম্যাজিস্‌ট্রেট, ও পুলিসের কর্মকর্তারা। তাঁদের পিছনে বন্দুকধারী পুলিসের দল।

জনতার সামনাসামনি কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল লোকের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হোলো, কয়েকজন পুলিসের হাতের অস্ত্র কেড়ে নিতে চেষ্টা করল।

পুলিসের উদ্যত অস্ত্র আর জনতার মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালেন বিখ্যাত জননেতা পণ্ডিত রামভূজ দত্ত। তিনি অফিসারদের অনুরোধ করলেন,—

গুলি চালাবেন না। আমাকে একটু সময় দিন, আমি জনতাকে শান্ত করে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেব।

অফিসাররা দশ মিনিট সময় দিলেন। পণ্ডিত রামভূজ জনতাকে শান্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। জনতার চাঞ্চল্য তাঁর কথায় কিছুটা প্রশমিত হোলো।

দশ মিনিট কাটতে না কাটতেই আবার পুলিসের বন্দুক উদ্যত হোলো।

পণ্ডিত রামভূজ দত্ত বন্দুকের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। আর্তকণ্ঠে বললেন,—না না, গুলি না, গুলি না!

শান্তিরক্ষার সামরিক কর্তা হেঁকে উঠলেন,—

দশ মিনিট পার হয়ে গিয়েছে। আর নয়!

রামভূজ বললেন,—কিন্তু লোকজন তো শান্ত হয়েছে। এতো বড়ো জনতাকে শান্তিপূর্ণভাবে সরাতে গেলে সময় তো লাগবেই কিছুটা। আমি কথা দিচ্ছি এই ভিড় আস্তে আস্তে আমি সরিয়ে দেব। আর একটু সময় দিন। দেখুন, শোভাযাত্রা শান্ত হয়ে আছে, অনেক লোক পথের উপর চুপ করে বসে পড়েছে।

না, দশ মিনিট পার হয়ে গেছে।

সৈনিকরা নিশানা স্থির করল। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবর্ষণ শুরু করল বন্দুকের সারি। কয়েকজন মরল, আহত হোলো অনেকে।

পরদিন জনসভা হোলো বাদশাহী উদ্যানের সামনে। হাজার হাজার হিন্দুমুসলমান জমায়েত হোলো। গতদিনকার শোভাযাত্রায় যারা প্রাণ দিয়েছে ও নিগৃহীত হয়েছে তাদের জন্য শোক ও দুঃখ প্রকাশ করল হাজার হাজার লাহোরবাসী। বৃটিশ কুশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করলেন বক্তারা।

সেদিন গভর্ণর ও-ডায়ার লাহোরের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন,—জনতার এই আইন অমান্য ও বিশৃঙ্খলা তিনি সহ্য করবেন না। শোভাযাত্রা তিনি নিষেধ করেছেন, সভা তিনি

বে-আইনি বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তাঁর নিষেধকে অমান্য করা হয়েছে, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হয়েছে। এমনি ঘটনার পুনরাবৃত্তি সহ্য করা অসম্ভব।

কয়েকজন নেতা ক্রুদ্ধ গভর্ণরের উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করলেন। অনেক করে বুঝিয়ে বললেন তাঁরা। দেশবাসীর মন গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে অত্যন্ত উদ্বেগ-ব্যাকুল হয়েছে। এই উদ্বেগ শুধু লাহোরে নয়, পাঞ্জাবে নয়,—সারা দেশে। এই উদ্বেগ নিয়েই লোক ব্যাকুলভাবে পথে বার হয়েছে, সভা-শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু তাদের অশান্ত হবার কথা নয়, হিংসামূলক কাজ করার কথা নয়। তা গান্ধীজীর নির্দেশের পরিপন্থী। গভর্ণর নিজে অশান্ত হবেন না। শান্ত জনতার উপর অকারণ হিংস্র হয়ে অশান্তি ডেকে আনবেন না। গণ-মানুষের ব্যথার শান্তিপূর্ণ প্রকাশের পথে বাধা-সৃষ্টি করবেন না জনতা আপনি শান্ত হবে, স্বাভাবিক হবে। স্থানীয় নেতাদের উপর আস্থা রাখুন।

পরামর্শদাতাদের মধ্যে যাঁরা সংখ্যালঘিষ্ঠ,—এ হোলো তাদের কথা। সংখ্যাগরিষ্ঠ যাঁরা, তাঁদের অনেকেই সরকারী আমলা। তাঁরা অনেক কাছের,—তাঁরা তো নিত্যদিন গভর্ণরকে ঘিরেই রয়েছেন। তাঁরা মুহূর্তে জ্বলে উঠলেন।

স্থানীয় নেতা? তারা তো বিদ্রোহীদের দলপতি? তাদের উপর আস্থা রাখতে হবে? গভর্ণরের নির্দেশ না মানা তো বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্যে দল বাঁধা? বিদ্রোহীদের সঙ্গে আপোশ করতে হবে? মোটেই না। চূর্ণ করতে হবে বিদ্রোহকে।

পরদিন ১১-ই এপ্রিল। সমস্ত শহর থমথম করছে। সেদিনও দোকানপাট প্রায় বন্ধ। ভোর থেকে পথে লোকজন নেই বললেই হয়। পুলিস-পাহারারও দেখা নেই।

বেলা বাড়ল। পথে বার হোলো লাহোরবাসী। আজও সভা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে পরাধীন মানুষের সভা। হিন্দুমুসলমানের

সভা। সেই একই জায়গায়। বাদশাহী মসজিদের সামনে। প্রায় তিরিশ হাজার লোকের সমাবেশ।

সাধারণ পোশাক পরা কয়েকজন পুলিস কর্মচারী সভার মধ্যে গোপনে ঢুকেছিল। তাদের একজন উদ্ধত ভঙ্গিতে বলে উঠল,—মসজিদের এলাকায় এমনি গুণ্ডামির কারবার! এটা কি ভগবানের আসন, না শয়তানের?

একদল লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর। তাদের দূর করে দিল সভা থেকে।

আর কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটল না। সভা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোলো। কিন্তু সভা শেষ হতে না হতে অবস্থা অন্যরকম। আটশো জন সশস্ত্র পুলিস আর মিলিটারি ইতিমধ্যে চারদিক ঘিরেছে। বোমা ফেলার জন্য তৈরি হয়ে আকাশে উড়ছে একজোড়া এরোপ্লেন। বিদ্রোহকে দমন করতে হবে, বিদ্রোহীদের হাত থেকে লাহোরকে উদ্ধার করতে হবে।

একদল পুলিস ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

হটো, হটো, নইলে এখুনি গুলি চলবে।

জনতার সঙ্গে পুলিসের ধাক্কাধাক্কি হোলো। সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল ছাপিয়ে গর্জে উঠল বন্দুকের গুলি। সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক মরল,—অনেকে আহত হোলো। নিরীহ নিরস্ত্র জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে একটুও দেরি হোলো না।

ইতিমধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়েছিল পাঞ্জাবের আরো কয়েকটি শহরে। লাহোর থেকে সাতাশ মাইল দূরে কসুর শহরে ১১ ও ১২ তারিখে হরতাল পালিত হয়েছিল। পথচারীরা প্রকাশ্যভাবে বুক চাপড়িয়ে শোক প্রকাশ করেছিল। কিছু লোক পুলিসী অত্যাচারে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে জোট বেঁধে সরকারী বাড়ি পুড়িয়েছিল। তারা রেল স্টেশন ও টেলিগ্রাফ লাইনের ক্ষতি করেছিল। দুজন সামরিক কর্মচারী

রিভলভার ছুড়ে আক্রমণ করতে গিয়ে জনতার হাতে নিহত হয়েছিল।

গুজরানওয়ালা শহর লাহোর থেকে সাঁইত্রিশ মাইল দূরে। ৬ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত সে শহর সম্পূর্ণ শান্ত ছিল। ১৪ তারিখে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। ভোরবেলা দেখা গেল যে একটি বাছুরকে হত্যা করে রেল-ব্রীজের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘৃণিত কাজ যেই করুক,—উদ্দেশ্য তার মহৎ ছিল না। গো-বৎস হত্যা হিন্দুর পক্ষে মহাপাপ,—অপরপক্ষে এমনি হত্যা মুসলমানের ধর্মপরিপন্থী নয়। এমনি জঘন্য কাজের উদ্দেশ্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তোলা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে জাগিয়ে তোলা।

সত্যাগ্রহের আহ্বান ছিল ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি। এই আহ্বানে হিন্দুমুসলমান উভয়ে সাড়া দিয়েছিল। মন্দির মসজিদের ভেদাভেদ ছিল না। গো-বৎস হত্যার এই ঘটনা ভেদবুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত,—শহরবাসী সহজেই তা ধরে নিল। চক্রান্ত —কার? বিদেশী শাসকের। সঙ্গে সঙ্গে চেহারা বদলে গেল শহরের। এক ফুৎকারে নিবে গেল শান্তির স্বচ্ছ আলো।

দোকানপাট বন্ধ। ক্রুদ্ধ জনতা ট্রেন থামাল, স্টেশন ভাঙল, টেলিগ্রাফের তার কাটল, পুড়িয়ে দিল ব্রীজ আর পোস্ট-অফিস। জনতার এই বিধ্বংসী বিক্ষোভকে শাস্তি দেবার মতো পুলিস ও সৈন্যবাহিনী গুজরানওয়ালার মতো ছোট শহরে মোতায়েন ছিল না। গভর্ণর ও-ডায়ার বিমান-বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন। তিনটি বোমারু বিমান রওনা হয়ে গেল।

বিমান থেকে স্থানে স্থানে বোমাবর্ষণ করা হোলো। তারপর অবস্থা বুঝে বিমানগুলি আরো নিচে নেমে এল। জায়গা বুঝে বুঝে বিমানের মেসিনগান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ চলল। মারা গেল এগারো জন লোক, আহত হোলো প্রায় ত্রিশ।

সেদিন থেকে সারা পাঞ্জাবে পূর্ণ শান্তি। গভর্ণর ও-ডায়ারের জয়। ইতিমধ্যে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে।

হাণ্টার কমিটি যার নাম দিয়েছিলেন বিশৃঙ্খলা পাঞ্জাবের গভর্ণর ও-ডায়ার তাকে ঘোষণা করেছিলেন বিদ্রোহ বলে। সহিংস আর নিষ্ঠুর গণবিদ্রোহ,—যার উদ্দেশ্য সারা ভারতের প্রতিটি বৃটিশ নারী-পুরুষকে হত্যা করা,—ভারতে বৃটিশ শাসনকে খতম করা। তিনি দেখেছিলেন শহরের দেয়ালে দেয়ালে বিদ্রোহীরা লিখে রেখেছে,—শাদা চামড়ার মানুষদের হত্যা করো। তাই তিনি লাহোরের ইউরোপীয় বাসিন্দাদের সামরিক আশ্রয়ে রক্ষা করেছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে বিদ্রোহীরা শাসনব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত। তাই তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তিকে নিযুক্ত করতে দ্বিধা করেননি। প্রথম থেকে তাঁর বুঝতে ভুল হয়নি যে গণবিদ্রোহের প্রধান নায়ককে দূরে হটানো দরকার। তাই তিনি গান্ধীজীকে পাঞ্জাবে ঢুকতে দেননি।

কিন্তু পাঞ্জাবের দরিদ্র চাষী বিদ্রোহ করবে কোন্ শক্তি দিয়ে? জীর্ণ তার দেহ, পেটে তার ক্ষুধা, লাঞ্ছনাভরা তার জীবন। তার অর্থ নেই, বল নেই, অস্ত্র নেই। বন্দুক আর মেসিনগান, গুলি আর বোমা, সৈন্যবাহিনী আর বিমান,—কিছুই তার নেই। কী নিয়ে সে বিদ্রোহ করবে? দুর্মদ বৃটিশ শক্তিকে পরাজিত করবার মতো কোন্ রণসম্ভার পরাধীন ভারতবাসীর হাতে আছে?

আছে বৈকি। গভর্ণর ও-ডায়ার বলেছিলেন,—আছে তাদের চক্রান্ত। ভীষণ চক্রান্ত, নিগূঢ় অভিসন্ধি। এই চক্রান্তের উদ্যোক্তা ছিল কেন্দ্রীভূত এক গুপ্ত শক্তি,—নিখুঁত পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে যারা ভারতব্যাপী হরতালের ডাক দিয়েছিল। এই হরতালই বিদ্রোহের প্রথম প্রতীক। সমাজ-জীবনে অকর্মণ্যতা ডেকে আনা এই হরতালের কাজ। তারপর শোভাযাত্রা ও সভার আহ্বানে জনতাকে জড়ো করে

অপরাধমূলক কাজে আগুয়ান করা দ্বিতীয় পদক্ষেপ। তারপর শ্রমিকের ধর্মঘট। কর্তৃপক্ষ যাতে যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারে তাই টেলিগ্রাফের তার কাটার ব্যবস্থা,—সৈন্যদল যাতে চলাচল না করতে পারে তাই রেল স্টেশন ও রেল লাইন নষ্ট করার প্রচেষ্টা। নির্ভুল নির্দিষ্ট পদক্ষেপে অতি দ্রুত গতিতে যাতে বিদ্রোহ এগিয়ে যেতে পারে, তার সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত ছিল। শেষ ব্যবস্থা সেনাবিদ্রোহ। গভর্ণর ও-ডায়ার বলেছিলেন,—অনেক কিছুই তিনি জানতেন, অনেক গুপ্ত সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। তাই তিনি প্রস্তুত ছিলেন। এক বিশাল বীভৎস বিদ্রোহকে অঙ্কুরে বিনাশ করেছিলেন।

সার মাইকেল ও-ডায়ারের সঙ্গে হাণ্টার কমিটির মতের মিল হয়নি। তাঁরা পাঞ্জাবের বিশৃঙ্খলাকে সর্বভারতীয় মহাবিদ্রোহ বলে মেনে নিতে পারেননি। এই বিশৃঙ্খলাকে অঙ্কুরে বিনাশের যে পন্থা পাঞ্জাব সরকার নিয়েছিলেন,—সেই পন্থাও যে সর্বক্ষেত্রে উপযুক্ত ও নির্ভুল নয় তাও তাঁরা বলেছিলেন।

পাঞ্জাবের গণবিক্ষোভকে নিজের চোখে গভর্ণর দেখেছিলেন লাহোরে, তাঁর খাস শহরে। বাদশাহী মসজিদের সামনে হিন্দু মুসলমান জনতার সভায়। পুলিস আর সৈন্য দিয়ে মাত্র কয়েক রাউণ্ড গুলি চালিয়ে যে সভার নিরস্ত্র মানুষকে হটাতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগেনি।

সেই সভায় একটি মানুষ মরেছিল। কোনো বিধ্বংসী বিপ্লবী নয়। কিশোর ছাত্র,—লালা খুশিরাম তার নাম। পরদিন লাহোরের পঞ্চাশ হাজার লোক শোকস্তব্ধ মিছিল করে তার দেহকে নিয়ে গিয়ে দাহ করেছিল।

॥ ৭ ॥

জালিয়ানওয়ালাবাগ।

অবিস্মরণীয় নাম, অমর তীর্থ। রক্ত-ঝরা ঊষর প্রান্তর,—সেই প্রান্তরে স্বাধীনতার উপ্ত বীজ।

অমৃতসর শহরের মাঝখানে স্বর্ণমন্দির থেকে কিছুটা দূরে সাঠেওয়ালা বাজারের গা ঘেঁষে খানিকটা পোড়ো জমি। অসমতল, এবড়ো খেবড়ো। এতো অনুর্বর যে ঘাসও গজায় না। চারিদিক উঁচু উঁচু বাড়ির পিছনের দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল এই জালিয়ানওয়ালাবাগের রুক্ষ মাটিতে ঝরেছিল হাজার হাজার নিরীহ ভারতবাসীর রক্ত। সেই রক্তের সিঞ্চনে উর্বর হোলো মাটি। সেই মাটিতে উপ্ত হোলো স্বাধীনতার অক্ষয় বীজ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ প্রতীক জালিয়ানওয়ালাবাগ,—স্বাধীন ভারতের অবিনশ্বর তীর্থ। এই তীর্থকে ভারতবাসী কোনো দিন ভুলবে না।

হিংসার চেয়ে অহিংসা বড়ো, পাশবিকতার ঊর্ধ্বে মানবতার আসন। দ্বেষ অপবিত্র, পবিত্র প্রেম। যুগে যুগে মানবতার অবতার আবির্ভূত হয়ে এই কথা শুনিয়েছেন। প্রাচীন যুগে বলেছেন বুদ্ধ, মধ্যযুগে বলেছেন যীশু, আর মহাত্মা গান্ধী বলেছেন এ যুগে। যুগ যুগ ধরে মানবসন্তানকে মানবতার এই অমৃতবাণী শোনাবেন মাতা ধরিত্রী। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটিতে ধরিত্রীমাতার সেই মর্মবাণী। সেই বাণী শোনবার জন্যে সেই আদর্শকে হৃদয়ের মধ্যে সংগ্রহ করার জন্যে এই জালিয়ানওয়ালাবাগের মানবতীর্থে আসে সারা পৃথিবীর মানুষ। তারা এখান থেকে মন্ত্র নিয়ে যায়,—অঙ্গীকার নিয়ে যায়।

পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ শহর অমৃতসর,—ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শহর। অবিভক্ত পাঞ্জাবের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। শিখ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। চতুর্থ শিখগুরু রামদাস ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে এই শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এখানে শিখদের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করতে চান ও এক ধর্মমন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুসারে একটি সুন্দর দীঘির মাঝখানে মন্দিরটি স্থাপিত হবে। গুরু রামদাসের নির্দেশে যে দীর্ঘিকাটি খনন করা হয় তার নাম অমৃতসাগর বা অমৃতসর। সেই দীর্ঘিকার মাঝখানে মন্দির নির্মাণ করেন গুরু রামদাসের পুত্র গুরু অর্জুনদেব। সেই মন্দিরই ক্রমে শিখদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্বর্ণমন্দিরে পরিণত হয়। এই স্বর্ণমন্দিরে গ্রন্থসাহেবের প্রতিষ্ঠা। এই স্বর্ণমন্দির বা দরবার সাহেবকে কেন্দ্র করে অমৃতসর শহর গড়ে উঠেছে।

প্রাচীন শহর অমৃতসর। পুরানো শহরের চারদিক উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সরু সরু গলি, দুপাশে ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি বাড়ি। বাড়িগুলি পাকা, পাথর বাঁধানো মোটা দেয়ালের,—দুতিন তলা উঁচু। রাস্তার উপর একতলার ঘরগুলি দোকানের সারি। স্বর্ণমন্দিরের দিকটা আদিতম পল্লী। সেখানকার বাড়িগুলিও যতো উঁচু, দোকানপাট আর মানুষের ভিড় যতো বেশি, রাস্তাগুলিও ততো সরু। দুপাশের উঁচু দেয়ালের বেড়া পার হয়ে অনেক গলিতেই সারা দিনে সূর্যালোক ঢোকে না।

শহরের বাইরে রেল স্টেশন। সেদিকটা নতুন শহর গড়ে উঠেছে। চওড়া রাস্তা, নতুন নতুন আধুনিক বাড়ি,—সাহেবপাড়া, সিভিল লাইনস্। আর একদিকে গোবিন্দগড় দুর্গ। হল গেট পার হয়ে স্টেশন থেকে প্রধান রাস্তাটি শহরের মধ্যে ঢুকেছে। এসে পৌঁছেছে কোতোয়ালি, মিউনিসিপাল দপ্তর আর টাউন হল পর্যন্ত শহরের ঠিক মাঝামাঝি। সেই রাস্তাটি অপেক্ষাকৃত চওড়া। তা'র দুধারে বড়ো বড়ো দোকান, বেসরকারী দপ্তর, ব্যাংক। তারপরে আর তার আশেপাশে সরু সরু আঁকাবাঁকা নানা রাস্তার গোলক ধাঁধা। কঠিন

জটপাকানো এমনি এক গোলকধাঁধার মাঝখানে স্বর্ণমন্দির,—সেখান থেকে আধমাইলটাক এগোলেই জালিয়ানওয়ালাবাগ।

গান্ধীজীর আহ্বানে অমৃতসরও সাড়া দিয়েছিল। দিল্লীর মতো অমৃতসরেও প্রথম হরতাল পালিত হয়েছিল ৩০শে মার্চ তারিখে। সেদিন অফিস-আদালত কোথাও কোনো কাজ হয়নি, সব দোকানপাট বন্ধ ছিল।

পরবর্তী ৬ই এপ্রিল তারিখে সর্বভারতীয় হরতালের দিনও অমৃতসরের হরতাল পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এই তুদিন সারা শহরে কোথাও কোনো গণ্ডগোলের চিহ্নমাত্র ছিল না।

অমৃতসরের সবচেয়ে জনপূজ্য জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন তুজন,—ডাক্তার সত্যপাল ও ডাক্তার সইফুদ্দিন কিচলু। ডাক্তার সত্যপাল ছিলেন চিকিৎসক, ডাক্তার কিচলু ছিলেন ব্যারিস্টার। একজন হিন্দু, অপরজন মুসলমান। তাঁদের যুগ্ম নেতৃত্ব অমৃতসরের হিন্দুমুসলমান সম্প্রদায়ের সৌভ্রাত্রের প্রতীক। স্থানীয় নেতা হিসেবে এই তুজন হরতালের ডাক দিয়েছিলেন। আর একজন বিশ্বস্ত নেতা ছিলেন পণ্ডিত কটুমল। সরকার থেকে তিনজনের উপরই বিশেষ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল,—তাঁরা হরতালের দিন কোনো সভায় কোনো বক্তৃতা করতে পারবেন না। নেতারা সেই নির্দেশ মেনেছিলেন।

অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার মাইলস্ আরভিং-এর কানে দিল্লীর খবর পৌছতে দেরি হয়নি। তাঁর নিজের শহর অমৃতসরে পর পর তুদিনের হরতালের সাফল্য দেখে তাঁর খুব তুশ্চিন্তা হোলো। তিনি ভেবেছিলেন নেতাদের মুখ বন্ধ করে তিনি হরতালকে তুর্বল করতে পারবেন। ডাক্তার সত্যপাল ও ডাক্তার কিচলুর জনপ্রিয়তা দেখে তিনি নিতান্ত ঘাবড়ে গেলেন।

তিনি তাঁর আশংকার কথা সবিস্তারে লাহোরে গোচর করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দাবী করলেন অমৃতসর রক্ষার জন্যে আরো সৈন্যসামন্ত

পাঠানো হোক। লোক যদি ক্ষেপে ওঠে তাহলে কোতোয়ালির পুলিস তাদের ঠেকাতে পারবে না। যা সৈন্য অমৃতসরে আছে, তা দিয়ে শহর কোতোয়ালী পাহারা দিতে হলে সিভিল লাইনস্ রক্ষা করা যাবে না। আর সিভিল লাইনস্ রক্ষা করতে হলে শহর পড়বে বিপদে। অমৃতসরের জনসংখ্যা এক লাখ ষাট হাজার,—যারা একযোগে ধর্মঘটে সাড়া দিয়েছে। তারা যদি চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন কী উপায় হবে?

চাঞ্চল্যের বিন্দুমাত্রও অবশ্য দেখা গেল না পর পর তিন দিন। ৯ তারিখে রামনবমী উৎসব। সেই উৎসবে সারা শহর মত্ত হোলো। সেই উৎসবে হিন্দুমুসলমান জনগণের এক আশ্চর্য মিলনের চেহারা দেখে কর্তারা আবার চিন্তিত হলেন। রামনবমীর শোভাযাত্রায় হিন্দুমুসলমান এক সঙ্গে যোগ দিল। মুসলমানের হাতের জল হিন্দুরা পান করল। হিন্দুর আনন্দধ্বনিতে মুসলমানরা তাদের গলা মেলালো। কিন্তু এই বিশাল শোভাযাত্রায় বিশৃঙ্খলা বা রাজদ্রোহের চাঞ্চল্য বিন্দুমাত্রও টের পাওয়া গেল না। বড়ো রাস্তার উপর এক ব্যাংকের দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাইলস্ আরভিং শোভাযাত্রা দেখলেন। তাঁকে দেখে শোভাযাত্রার ব্যাণ্ড পার্টি গড-সেভ-দি-কিং-এর সুর বাজাতে লাগল।

লাহোর সৈন্য পাঠালো না,—তার পরিবর্তে পাঠালো এক কুটিল নির্দেশ। শোভাযাত্রা দেখে প্রসন্নমনে বাংলোয় ফিরে এসে ডেপুটি কমিশনার আরভিং পাঞ্জাব গভর্ণরের সেই নির্দেশ পড়লেন। সৈন্য আসছে যতোশীঘ্র সম্ভব কিন্তু তার আগে সত্যপাল আর কিচলুকে ঠাণ্ডা করা চাই। তাদের নেতাগিরির পাখা ছেঁটে দেওয়া দরকার,—তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে অমৃতসরের বাইরে সরিয়ে দিতে হবে।

এই নির্দেশের গুরুত্ব বুঝতে আরভিং-এর দেরি হোলো না। অমৃতসরের শান্ত জনতাকে অশান্ত করবার এটি এক মহা উপায়।

তাদের আদর্শ অহিংসাবোধ ও সংহতিকে এইবার নষ্ট করা যাবে। তারপরই দেওয়া হবে উচিত শাস্তি। তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিস ও সামরিক বাহিনীর সমস্ত কর্মকর্তাদের ডেকে পাঠালেন।

গোপনে পরামর্শ সভা বসল। স্থির হোলো যে ডাক্তার সত্যপাল ও ডাক্তার কিচলুকে পরদিন সকাল দশটায় আলোচনার জন্যে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোতে আমন্ত্রণ করা হবে। আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গ্রেপ্তার করে একটা বন্ধ মোটর গাড়িতে চাপিয়ে শহরের বাইরে উধাও করে দেওয়া হবে। কয়েদী গাড়ির পিছনে চার পাঁচজন সৈন্যভর্তি একটা খোলা পাহারাদার মোটর ছুটবে। কিন্তু সে গাড়ির সৈন্যরা এমন ব্যবহার করবে যেন তারা ছুটিতে শিকার করতে চলেছে।

কর্তারা স্থির বুঝেছিলেন যে এই হীন চক্রান্ত অচিরে ফাঁস হবেই। তখন শহরের লোক চঞ্চল হবেই,—বিক্ষুব্ধ হবেই। আর সেই বিক্ষোভকে তখন কঠোর হাতে দমন করতে হবে। সেই ব্যবস্থাও এই সভায় পাকাপাকি ভাবে স্থির হোলো। এই ব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকা নিলেন অমৃতসরের স্থানীয় সামরিক কর্তা ক্যাপ্টেন ম্যাসি।

প্রথম রক্ষা করতে হবে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোকে। সেই-খানেই আগামী দিনের নাটকের প্রথম দৃশ্যের অবতারণা হবে। অতএব একদল সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্য ভোর থেকেই এই বাংলোর পিছনদিকে লুকিয়ে থাকবে। সিভিল লাইনস্ আর পুরোনো শহর, মাঝখানে রেল লাইন। রেল লাইনের উপরকার তিনটি পুলের উপরই সৈন্যদলের পাহারা মোতায়েন হবে। তাছাড়া প্রতিটি পুলের মুখে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবেন এক এক জন ইংরেজ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট,—পাঁচ জনের বেশি এক সঙ্গে পুলের উপর দিয়ে যেতে পারবে না।

লোকে যদি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যক্ষ নির্দেশ অমান্য করে তাহলে জনতাকে ঠেকাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। সে জন্যে খাড়া থাকবে সামরিক পাহারা। বাকি বৃটিশ সৈন্য জড়ো হবে শহর আর রেল

স্টেশনের মাঝামাঝি রামবাগ উদ্যানে। শহরের মধ্যে কোতোয়ালি পাহারা দেবে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী। সিভিল সার্জনের অধীনে অ্যাম্বুলেন্স গাড়িগুলিও ভোর থেকে তৈরি থাকবে,—যদি কোনো গোলমাল হয় তাহলে শহরের মধ্য থেকে শ্বেতাঙ্গিনী নারী ও শ্বেত শিশুদের অ্যাম্বুলেন্সে তুলে যাতে অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে ফেলা যায়।

পরদিন ভোরবেলা সামরিক কর্তা ক্যাপ্টেন ম্যাসি পঞ্চাশজন অশ্বারোহী আর চল্লিশজন পদাতিক গোরা সৈন্যকে রামবাগ উদ্যানে মোতায়েন করলেন। বাকি গোরা ও দেশি সৈন্যদের তিনি রেলোয়ে পুলের বিভিন্ন স্থানে ভাগ করে দিলেন। কেল্লার অফিসারকে তিনি সজাগ থাকতে হুকুম দিলেন। প্রয়োজন হলে নারী ও শিশুদের কেল্লার মধ্যে আশ্রয় দিতে হবে। প্রজারা যদি কোনো বাধা সৃষ্টি করে বা কেল্লার উপর হামলা করে তাহলে নির্দ্বিধায় মেশিনগান চালাবার জন্যে যেন তিনি তৈরি থাকেন। পৌনে দশটার সময় ক্যাপ্টেন ম্যাসি এক দল সৈন্য নিয়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয় এলেন। সৈন্যরা বাড়ির পিছনে গা-ঢাকা দিয়ে রইল।

ইতিমধ্যে বেলা আটটা নাগাদ ডাক্তার সত্যপাল পেলেন ডেপুটি কমিশনার মাইলস্ আরভিং-এর নিজে হাতে লেখা ব্যক্তিগত চিঠি,—তাঁর কুঠিতে এসে আলোচনার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ। ডাক্তার সত্যপাল চিঠিটি পকেটে নিয়ে যথারীতি রোগী দেখতে বার হলেন।

বেলা দশটার মিনিট পাঁচেক আগে তিনি আলোচনা স্থলে পৌঁছলেন। সঙ্গে দু-একজন বন্ধু,—যাঁরা আলোচনায় সাহায্য করতে পারেন। ডাক্তার কিচলুও অনুরূপ লিপি পেয়েছিলেন। তিনিও এলেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই। বাংলোর বাইরে একপাশে একটি তাঁবু খাটানো হয়েছে,—সেখানে তাঁদের অপেক্ষা করতে বলা হোলো। তারপর ডাক্তার সত্যপাল আর ডাক্তার কিচলু এই দুজনকে ডেকে নেওয়া হোলো বাংলোর মধ্যে।

ডেপুটি কমিশনারের খাস কামরা। মাঝখানে বসে আছেন মাইলস্ আরভিং। একপাশে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার, অন্য পাশে পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট। তুই শ্বেতাঙ্গ মুখ্য শাসক। কামরার বাইরে বাংলোর সমস্ত পিছনদিক ঘিরে আছে বন্দুকধারী গোরা সৈন্যের দল। ক্যাপ্টেন ম্যাসির প্রচ্ছন্ন নেতৃত্বে।

ঘরের মধ্যে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব সরকারের হুকুমনামা নেতৃদ্বয়ের চোখের সামনে মেলে ধরা হোলো। নিমেষে তাঁরা গ্রেপ্তার হলেন। তুটি দ্রুতগতি মোটর প্রস্তুত ছিল। তুজনকে আলাদা আলাদা মোটরে তোলা হোলো। তারপর মোটরতুটি দ্রুত বেগে যাত্রা করল অমৃতসরের বাইরে। ভিন্ন মোটরে তাদের অনুসরণ করল পাহারাদার সৈন্যদল।

নেতাদের যে কজন স্থানীয় বন্ধু বাইরের তাঁবুতে অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের আধঘণ্টা আটকে রেখে ছেড়ে দেওয়া হোলো। বন্দীগাড়ি তখন অনেক দূরে চলে গেছে। এতো সহজে কাজ হাসিল হওয়াতে মাইলস্ আরভিং হাঁফ ছাড়লেন। ক্যাপ্টেন ম্যাসি মুচকি হেসে বিদায় নিলেন,—ঘোড়ায় চেপে তিনি চললেন রামবাগ ময়দানের উদ্দেশ্যে।

শাসকদের পরিকল্পনামতোই পরিস্থিতি অগ্রসর হতে লাগল। কুটিল চক্রান্ত করে প্রিয় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কোন্ অজ্ঞাত জায়গায় সরিয়ে ফেলা হয়েছে,—এখবর এক ঘণ্টার মধ্যে ছড়িয়ে গেল সারা শহরে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল, বাড়ির কপাটে খিল পড়ল। শহরের যতো সমর্থ পুরুষ বার হয়ে এল রাস্তায়।

বেলা সাড়ে এগারোটার মধ্যে হলবাজারের সামনে এক মস্ত ভিড়। জনতা হল গেট দিয়ে বার হয়ে পুল পার হতে চলেছে। তারা যাবে সিভিল লাইনসে,—ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয়। তারা বিলাপ করছে, বুক চাপড়াচ্ছে, বলছে,—

আমাদের নেতাদের ফিরিয়ে দাও, নইলে আমাদেরও বন্দী করে নিয়ে চলো তাদের কাছে।

কেউ কেউ গর্জন করছে,—

কোথায় ডেপুটি কমিশনার সাহেব? তাকে একবার দেখে নেব, কুচিকুচি করে কাটব তাকে।

ভিড় বাড়তেই লাগল। দুধার থেকে লোক ঢুকে এসে যোগ দিতে লাগল এই বিক্ষুব্ধ শোভাযাত্রায়। তারা নিরস্ত্র, তারা শোকার্ত, তারা বিভ্রান্ত। তারা কোনো অন্যায় করেনি, কোনো আইনকে অমান্য করেনি,—তবু তাদের উপর এই কঠোর শাসন কেন? কেন তাদের প্রিয় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে? কোথায় তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে? এই গ্রেপ্তার অন্যায়। এই অন্যায়ের প্রতিকার চাই।

রেলপুলের মুখে সামরিক পাহারা। সেই পাহারায় মুখোমুখি হোলো জনতা। আর নয়, আর এক পা এগোতে পারবেনা। এই জনতাকে যদি সিভিল লাইনসে ঢুকতে দেওয়া হয় তাহলে আইন মুছে যাবে, নিরাপত্তার বিঘ্ন হবে। জনতা যদি ক্ষেপে ওঠে তাহলে কী সর্বনাশ যে তারা করবে তা কে বলতে পারে?

মিথ্যা কথা। এও তোমাদের আর এক চাতুরী। নিরাপত্তা কেন নষ্ট হবে? বে-আইনি কাজ আমরা কেন করব? আমরা তো অহিংস, আমরা তো নিরস্ত্র। এই শহরের বড়ো রাস্তা মাড়িয়ে আমরা এলাম। শহরে কতো সাহেব, কতো মেম,—কতো তাদের বাড়িঘর, ধনসম্পত্তি। কই, কারো গায়ে আঁচড় তো লাগাইনি আমরা,—তোমাদের একটি জিনিষও তো ছুইনি আমরা। আমাদের শুধু ঐ ডেপুটি কমিশনারের কাছে যেতে দাও। নিজে মুখে সে বলুক,—কেন আমাদের নেতাদের সে গ্রেপ্তার করেছে, কোথায় নিয়ে কয়েদ করে রেখেছে!

মাইলস আরভিং আর ক্যাপ্টেন ম্যাসির কাছে খবর পৌঁছলো। তাঁরা ছুটে এলেন পুলের মুখে। ছুটে এলেন পুলিসের উর্ধ্বতন

কর্তারা। রামবাগ ময়দান থেকে দলে দলে সশস্ত্র সৈন্যরা এল। পুলিশ অফিসাররা ঘোড়ায় চড়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। তারা জনতাকে চাপ দিতে লাগল।

হটে যাও, ফিরে যাও,—এক পা এগোতে দেওয়া হবে না। আর এক পা বাড়াবার চেষ্টা করলেই বিপদ ঘটবে।

বিপদ তো ঘটবেই। বিপদ ঘটাবার তোমরাই তো মালিক। তোমাদের হাতে বেটন, তোমাদের হাতে বন্দুক। তোমরাই তো বিপদ ঘটিয়েছ,—আমাদের প্রিয় নেতাদের গায়েব করেছ। তাদের ফিরিয়ে দাও। তবে আমরা ফিরে যাব। নইলে কতো বিপদ ঘটাতে চাও তোমরা,—ঘটাও।

মাইলস্ আরভিং এসে পৌঁছেছেন। তিনি কড়া ধমক দিলেন জনতাকে। যারা তাঁর গলার আওয়াজ শুনতে পেল, তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘোড়ার সামনে পথের উপর বসে পড়ল। বুক চাপড়ে আর্তনাদ করতে লাগল।

সৈন্যরা বন্দুক উচিয়ে দাঁড়িয়ে। জনতা সামনে এগোবেই। ডেপুটি কমিশনারের বাংলো তাদের লক্ষ্য,—যেখানে তাদের নেতাদের শেষ দেখা গিয়েছিল। অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে। শান্তিপূর্ণভাবে জনতাকে ঠেকিয়ে রাখার উপায় নেই। ভিড়ের মধ্যে অফিসাররা ঢুকে পড়েছে। তাদের ঘোড়াগুলো চমকে চমকে উঠছে। তারা পিছু হটছে, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ভিড়ের চাপ তাদের ঘিরে ধরছে,—অশ্বারোহী কেউ যদি মাটিতে পড়ে যায়, তাহলে পায়ের চাপেই গুঁড়িয়ে যাবে।

এমনি অনিয়ন্ত্রিত সব জনতার মধ্যেই কিছু উচ্ছৃঙ্খল থাকে। তারা এবার গতিক বুঝে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অফিসারদের ঘোড়ার পিঠে আঘাত লাগছে—দূর থেকে কারা ইঁট পাটকেল ছুড়ছে। কয়েকজন লোক তাদের শান্ত করছে,—কয়েকজন হাতজোড় করছে অফিসারদের সামনে।

এই উপযুক্ত সময়। যথেষ্ট ক্ষেপানো গেছে মানুষকে। কুকুরকে ক্ষেপিয়ে নিলেই তাকে মারবার সুবিধা।

অতর্কিতে গুলি চলল। গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়তে লাগল মানুষ। উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল মানুষ। হত্যার অস্ত্র সফল হোলো। আর্ত বিভ্রান্ত জনতা ফিরে গেল শহরের মধ্যে। অফিসাররা ফিরে গেলেন নিজের নিজের আবাসে। তাঁদের মধ্যাহ্নভোজের দেরি হয়ে গিয়েছে।

॥ ১০ ॥

জুবিলি হাসপাতালের সাহেব সিভিল সার্জন তখন একটা অপারেশন করছিলেন। এমন সময় অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে ছুটে এল এক সহকারী।

শব্দ শুনতে পেয়েছেন সার? গুলি চলছে!

শুনতে পেয়েছেন বৈকি। নিরস্ত্র জনতার উপর মৃত্যুবর্ষী গুলি,—তার শব্দ বড়ো নির্মম, বড়ো তীক্ষ্ণ। অপারেশন থিয়েটারের মধ্যেও সে আওয়াজ তাঁর কানে পৌঁছেছে।

তাড়াতাড়ি অপারেশন শেষ করলেন সিভিল সার্জন। তারপর বাইরে বার হয়ে টেলিফোনটা কানে তুললেন। কোনো শব্দ নেই। তিনি অ্যাম্বুলেন্স মোটরকে তৈরি হতে নির্দেশ দিলেন। মেয়েদের রক্ষা করতে হবে,—স্বদেশীয় মেয়েদের।

সিভিল সার্জনের বুঝতে দেরি হয়নি যে এ জনতা আর সে জনতা থাকবে না। শহর থেকে বার হয়ে যারা গিয়েছিল কমিশনার-বাংলোর উদ্দেশ্যে তাদের নেতাদের মুক্তি-প্রার্থনা নিয়ে আর যারা গুলির মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রাণভয়ে দৌড়তে দৌড়তে আবার শহরের মধ্যে ফিরে এসেছে। দ্বিতীয় জনতা অন্য। একই মানুষ, একই ভিড়,—কিন্তু তাদের অন্য মেজাজ অন্য চরিত্র। এক জনতা আগুয়ান,—অন্য জনতা পশ্চাৎপদ।

এই আগুয়ান জনতার চরিত্র বিশ্লেষণ করে হান্টার কমিটি বলেছেন,—

এই জনতা ছিল বিক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ। কিন্তু হিংস্র ছিল না। মারমুখী ছিল না। শহরের বড়োরাস্তায় যে সব বৃটিশ অফিসাররা তাদের সামনে পড়েছিল, তাদের তারা নজরেই আনেনি। ডেপুটি কমিশনারের বাড়ি গিয়ে তাঁর সামনে প্রতিবাদ জানানো বা ভয় দেখানো,—এর

বেশি জনতার উদ্দেশ্য ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। অনেকে ডেপুটি কমিশনারের নামে অত্যন্ত উত্তেজিত ও বিদ্বেষকর চিৎকার ছড়াচ্ছিল অবশ্য, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কমই ছিল ও ঘটনার প্রথম দিকে তারা জনতার প্রতিনিধিত্ব করেনি। সকলেই ছিল নিরস্ত্র,—একটা লাঠি পর্যন্ত ছিলনা একজনেরও হাতে।

তবে, হাণ্টার কমিটির ইংরেজ সভ্যদের মতে,—এ কথা নয় যে এই জনতা নিতান্ত শোক-শোভাযাত্রা ছিল। তাদের উদ্দেশ্য যে শেষ পর্যন্ত আইনসম্মত ব্যবহার ও বিনীত প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ থাকত তাও ধারণা করা সম্ভব নয়। এমনি জনতাকে সিভিল লাইনসের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া কখনোই উচিত হোতো না। সম্ভবত তারা সেখানকার শান্তি ভঙ্গ করত,—অধিবাসীদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত করত।

শান্তি বিঘ্নিত হোলো না। জনতাকে হটিয়ে দেয়া হোলো। কয়েকজন লোক গুলির আঘাতে মরল। বাকি সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ফিরে গেল শহরেব মধ্যে।

ইতিমধ্যে জনতাররূপ পালটেছে,—নেতৃত্ব বদল হয়েছে। এ জনতা আব অহিংস নয়, শান্তিপূর্ণ নয়। তারা এসেছিল আকুতি নিয়ে অনুরোধ নিয়ে। নেতাদের মুক্তি দাও,—এই দাবী নিয়ে। তারা কারো গায়ে হাত তোলেনি, কোনো হিংসাত্মক কাজ করেনি। তারা শুধু শুনতে চেয়েছে সরল প্রশ্নের সহজ উত্তর,—কেন আমাদের নেতাদের তোমরা আটকেছ, কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তাদের?

তাদের অনুরোধ কেউ শোনেনি,—তাদের প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি। তাদের দাবীকে ঠেকিয়ে রেখেছে পুলিশ সেপাই-এব পাহারা দিয়ে। শুধু তাই নয়, সাময়িক উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে গুলি চালানো হয়েছে,—নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছে নির্দোষ মানুষকে।

সেই সব নির্দোষ সহযাত্রীর মৃত আর মুমূর্ষু দেহ কাঁধে তুলে ছুটে পালিয়েছে জনতা। ব্যর্থমনোরথ মানুষের পাল, আর যাদের

সংযম নেই, সহিষ্ণুতা নেই। তাদের মধ্যে এক নূতন দায়িত্বহীন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছে,—টুকরো টুকরো ভিড়কে সংঘবদ্ধ করে সে নেতৃত্ব প্ররোচনা দিচ্ছে হিংসার আর ধ্বংসের।

কিছুক্ষণ পরে আবার একটা দল ছুটে এল। তাদের হাতে লাঠি। লোহার রেলিং ভেঙে কেউ কেউ কাঁধে তুলেছে। কেউ চেঁচাচ্ছে,—ওরা আমাদের ভাইকে মেরেছে, আমরাও ওদের মারব।

টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের লাইন নষ্ট হোলো। লুট হোলো রেলোয়ে ইয়ার্ড। রেল লাইন পার হয়ে উন্মাদ দল ছুটল নূতন এলাকার দিকে। তারা উদ্ধত, তারা দুর্বিনীত। তারা এগোবেই,—তারা কোনো বাধা মানবে না,—তারা উদ্দাম, তারা ক্ষিপ্ত।

শৃঙ্খলার নেতৃত্ব শক্ত,—বিশৃঙ্খলার নেতৃত্ব বড়ো সহজ। সে নেতৃত্বের কোনো দায় নেই, দায়িত্ব নেই। সেই নেতৃত্ব এবার জনতার মাঝখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। হাঁকছে,—এগোও, এগোও, সব বাধা শৃঙ্খল চুরমার করে এগোও!

বাধার নৃশংস প্রাচীর আবার সামনে খাড়া হোলো। সশস্ত্র পুলিস আর সৈনিকের প্রাচীর। অশ্বারোহী আর পদাতিক। বেয়নেট আর বন্দুক। জনতা যথেষ্ট ক্ষিপ্ত হয়েছে, বিদ্রোহী হয়েছে,—ধ্বংসকামিতায় হয়ে উঠেছে উন্মাদ। এবার সুযোগ এসেছে তাদের চরম শাস্তি দেবার। বন্দুকের নল আর বেয়নেটের ফলা জিঘাংসায় চকচক করে উঠল।

কয়েকজন শান্তিকামী মানুষও ছিলেন। তাঁরা ছুটতে ছুটতে এলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন,—আর নিস্তার নেই। সৈন্য আর জনতার মাঝখানে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভিড়ের পায়ে দলে যাবার সম্ভাবনা। একজন একটা ঘোড়ার উপর লাফিয়ে উঠলেন। সৈন্যদের চিৎকার করে বলতে লাগলেন,—মেরো না, মেরো না। জনতার উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে লাগলেন,—এগিয়ো না, এগিয়ো না, শান্ত হও।

আগ্নেয়াস্ত্রের বজ্রনির্ঘোষে তাঁদের কথা চাপা পড়ে গেল। বেপরোয়া গুলি ছুটতে লাগল। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল গুলি-খাওয়া মানুষ। আবার ছুটতে লাগল লোক, পালাতে লাগল দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে।

সরকারী হিসাবমতে জন ত্রিশ লোক এই গুলিবর্ষণে হতাহত হয়েছিল। হাণ্টার কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা এবারকার এই গুলিবর্ষণকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন,—যখন গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল ততোক্ষণে জনতার মেজাজ অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, তারা তখন বিধ্বংসী হয়ে উঠেছে। তখন গুলি চালানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

সেই শান্তিকামী মানুষটি। সেই নির্ভীক নেতা,—বিফল যাঁর প্রচেষ্টা। তাঁর নাম মকবুল মহম্মদ। তিনি পুলিসের একটা ঘোড়ার উপর লাফিয়ে উঠেছিলেন। হিন্দুমুসলমান কয়েকজন বন্ধু মিলে সৈন্য আর জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শান্তিস্থাপনের নিরুপায় শেষ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এই গুলিবর্ষণকে সমর্থন করেননি। জনতাকে বোঝানো হয়নি, তাদের ধমক দেওয়া হয়নি। এক সরাসরি গুলিবর্ষণ ছাড়া জনতাকে সরানোর অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করা হয়নি। গুলি যদি করাই হোলো,—তাহলে সামনাসামনি কয়েকজনের পায়ের দিকে গুলি করলেই হোতো,—তাহলেই লোক হটে যেত। কিন্তু সরাসরি হত্যা করার জন্যেই গুলি করা হয়েছিল। গুলি চালানো হয়েছিল পলায়মান জনতার উপর পিছনদিক থেকে। কেউ কেউ মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মরেছিল।

ভাগ্য প্রসন্ন যে মকবুল মহম্মদ নিজে গুলির আঘাতে মরেননি। কিন্তু মহৎ মৃত্যু সেদিন তিনি দেখেছিলেন। সেই ষোলো বছরের কিশোরটি যার তলপেটে গুলি লেগেছিল,—বার হয়ে এসেছিল ছিন্নভিন্ন নাড়িভুঁড়ি। তার শুশ্রূষার জন্য তিনি ছুটে গিয়েছিলেন। তার মুখে দিতে চেয়েছিলেন কয়েক অঞ্জলি জল। মুখ ফিরিয়ে

নিয়েছিল সে বীর কিশোর। বলেছিল,—আমার মরতে আর দেরি নেই, আপনি অন্যদের দেখুন। তারপর হিন্দুমুসলমান কি জয়,—এই শেষ ধ্বনি উচ্চারণ করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল।

বিকেল তিনটে। শহরের বাইরে পূর্ণ শান্তি। সুরক্ষিত সিভিল লাইনস্। সুরক্ষিত ডেপুটি কমিশনারের বাংলো আর গোবিন্দগড় দুর্গ। কিন্তু শহরের মধ্যে তাণ্ডব। সেই তাণ্ডবের আভাস পেতে দেরি হয়নি জুবিলি হাসপাতালের সিভিল সার্জন সাহেবের। তিনি তাঁর অ্যাম্বুলেন্স গাড়িটি বার করে তখনি ছুটলেন মিশন হাসপাতালে। তিনি সেখান থেকে বৃটিশ ও দেশী খৃস্টান মহিলাদের অ্যাম্বুলেন্সে তুলে সিভিল লাইনসের একটি বাংলোয় নিয়ে এলেন। বিকেলবেলা সমস্ত ইংরেজ মহিলা ও শিশুদের গোবিন্দগড় দুর্গে আশ্রয় দেওয়া হোলো। ইংরেজ সৈন্য দুর্গ পাহারায় মোতায়েন হোলো।

তাণ্ডব শুরু হোলো শহরের মধ্যে। এই তাণ্ডব পরিচালনা করল সেই সমস্ত গুণ্ডা প্রকৃতির সমাজশত্রুরা যাদের হাতে তখন সাময়িক নেতৃত্ব এসে গিয়েছে,—যোগ দিল অধিবাসীদের সেই দুর্বার দায়িত্বহীন অংশ যাদের সামলে রাখার কোনো উপায় আর তখন নেই। ইতিমধ্যে রেল-ইয়ার্ডে তারা তছনচ করে এসেছে, সফল হয়েছে ধ্বংসলীলার প্রস্তাবনা। শহরের মধ্যে তারা আটকা পড়েছে,—শহরের মধ্যেই তারা দেখিয়ে দেবে। শহরের মধ্যে শাদা চামড়ার পুলিস নেই, সৈন্য নেই। শহর তাদের।

ধ্বংস হোলো, লুট হোলো,—খুনও বাকি রইল না কয়েকটা। শহরের ঠিক মুখেই টেলিগ্রাফ-টেলিফোন অফিস ধ্বংস হোলো। নিহত হোলো একজন ইংরেজ কর্মচারী। হল গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকেই খৃস্টানদের বুক সোসাইটি হল। সেটিও ধ্বংস হোলো। তারপর বড়ো রাস্তার উপর তিনটি বিলিতি ব্যাংক—ন্যাশনাল ব্যাংক, চার্টারড ব্যাংক আর অ্যালায়েন্স ব্যাংক। শোষণের প্রতীক ওরা,—ইংরেজ মালিক,

ইংরেজ কর্মচারী। ঐ ব্যাংক তিনটির সামনে দাঁড়িয়ে উন্মাদ ধ্বংস-কামীর দল গর্জন করে উঠল,—লুট করো, পুড়িয়ে দাও, খুন করো।

তিনটি ব্যাংকই লুট হোলো। ন্যাশনাল ব্যাংকের বাড়িতে আগুনও লাগল। ন্যাশনাল ব্যাংকের দুজন ও অ্যালায়েন্স ব্যাংকের-একজন—তিন ইংরেজ কর্মচারী নিহত হোলো। কোতোয়ালীর দেশী পুলিস বাকি ইংরেজ কর্মচারীদের রক্ষা করল। পথে খুন হোলো ইলেকট্রিক ওয়ার্কস্-এর এক ইংরেজ অফিসার। রক্ষা হোলো না টাউন হল আর ডাকঘরগুলো।

সেদিন দুপুরে অমৃতসর শহরের মধ্যে নিগৃহীত হয়েছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। তাঁর নাম মিস মারসেলা শেরউড। আর একজন মহিলার কথাও আগে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর নাম মিসেস ইসাবেল মেরী ঈসডন। মিসেস ঈসডন জেনানা হাসপাতালের ডাক্তার।

তখন হল গেটের সামনে গুলি চলছে। জনতা দৌড়তে দৌড়তে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। মিসেস ঈসডন কৌতুক দেখতে হাসপাতালের ছাদে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। চিৎকার করে বলছিলেন,—গুলি করেছে, বেশ করেছে, গুণ্ডাদের উচিত শাস্তি দিয়েছে। তাঁর সেই সদম্ভ ঘোষণা পথের লোক শুনতে পেয়েছিল। জনতার ক্রোধ বাগ মানেনি। তারা হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। মিসেস ঈসডনকে তারা একবার দেখে নেবে। মিসেস ঈসডনকে তখন একটা আলমারির মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। যারা হাসপাতালে ঢুকেছিল, তারা তাঁকে খুজে না পেয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে হাসপাতাল ত্যাগ করেছিল। কিন্তু অন্য কোনো শ্বেতাঙ্গিনীকে তারা স্পর্শও করেনি।

কিন্তু মিস্ শেরউডের ভাগ্য অন্য। তিনি ছিলেন একজন মিশনারী মহিলা, শহরের মিশন স্কুলের পরিদর্শিকা। তিনি শহরের মধ্যেকার সরু রাস্তা দিয়ে সাইকেলে চেপে চলেছিলেন। একদল লোক পিছনে দৌড়ল। কড়েঁওয়ালা গলির মধ্যে তাঁকে ঘেরাও

করে মাটিতে ফেলে খুব প্রহার করল। তারপর তাঁকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে রেখে তারা সরে পড়ল। একজন হিন্দু ছাত্রীর অভিভাবক তাঁকে পথ থেকে তুলে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন ও শুশ্রূষা করলেন। তিনি একটু সুস্থ হলে সন্ধ্যাবেলা তাঁকে তাঁর বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

১০ই এপ্রিল তারিখের সূর্য অমৃতসরের আকাশ থেকে অস্ত গেল। সন্ধ্যাবেলায় সারাদিনের কৃতকর্মের হিসাবনিকাশ। মিলিটারির গুলিতে হতাহত হয়েছে ত্রিশ চল্লিশজন দেশবাসী। গুণ্ডার হাতে খুন হয়েছে পাঁচ জন ইংরেজ। লুট হয়েছে ব্যাংক, চুরমার হয়েছে রেল-ইয়ার্ড আর টেলিগ্রাফ-অফিস, আগুনে পুড়েছে পোস্ট অফিস টাউন হল। মিস্ শেরউড অবশ্য রক্ষা পেয়েছেন। শহরে আর কজন ইংরেজ যারা ছিল, তারাও আশ্রয় পেয়েছে কোতোয়ালীতে। কিন্তু শহরের উপর সরকারী কর্তৃত্ব নেই বললেই চলে। কেননা ইংরেজ শাসনকর্তারা আর তাঁদের ফৌজ সবই বাইরে। শহরের মধ্যে আছে ভয়ার্ত আর শোকার্ত মানুষ, ক্রুদ্ধ আর হিংস্র মানুষ। আর শহরবাসীর যাঁরা প্রধান নেতা, শান্তিকামী আর সত্যাগ্রহীদের নেতা,—ডাক্তার সত্যপাল আর ডাক্তার কিচলু,—তাঁরা কোথায় তা কেউ জানে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডেপুটি কমিশনার মাইলস্ আরভিং-এর গৃহে আবার সভা বসল। ইতিমধ্যে লাহোরের কমিশনার ও পুলিশের ডেপুটি ইনসপেকটর-জেনারেল দ্রুতগামী মোটরে অমৃতসরে এসে পৌঁছেছেন। তাঁরাও এই পরামর্শসভায় যোগ দিলেন।

এ সভারও নায়ক ক্যাপটেন ম্যাসি। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে তিনি দিনের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন,—তাঁর কীর্তি সর্বোচ্চ। বিদ্রোহীদের নেতাদের তিনি গ্রেপ্তার করে সরিয়েছেন,—বিদ্রোহের উত্তাল জনতরঙ্গকে তিনি প্রতিরোধ করেছেন। সিভিল লাইনস্ আর

গোবিন্দগড় দুর্গকে তিনি হাতে রেখেছেন। যে সীমারেখা তিনি চিহ্নিত করেছিলেন তা থেকে এক-পাও বিদ্রোহীরা এগোতে পারেনি।

খুব তারিফ করলেন লাহোরের কমিশনার সাহেব। বললেন,—আর একটি কাজ বাকি। সেটি করতে পারো? বিদ্রোহীরা শাস্তি পেয়েছে, ভয় পেয়েছে। এবার হল গেট পার হয়ে শহরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো? কোতোয়ালীর পুলিসদের কী অবস্থা জানা নেই। কোতোয়ালী অধিকার করতে পারো সন্ধ্যার অন্ধকারে?

ম্যাসি বললেন,—

পারি বৈকি। তবে সৈন্যের জোর আমার কই? আমরা যখন কোতোয়ালীতে তখন সিভিল লাইনস্ পাহারা দেবে কে? বিদ্রোহীরা যদি আবার সিভিল লাইনস্ আক্রমণ করতে আসে,—তখন কে তাদের ঠেকাবে?

আঁতকে উঠলেন মাইলস্ আরভিং। বললেন,—

ক্যাপটেন ম্যাসি ঠিকই বলেছেন। তিনি এখানে পাহারায় থাকুন। কোতোয়ালী দখলের জন্য নতুন ফৌজ তলব করা হোক।

কমিশনার বললেন,—উত্তম, আমি জালন্ধরে খবর পাঠাচ্ছি।

ক্যাপটেন ম্যাসি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—

আমি তাহলে চলি। আমার কাজ এখনো বাকি। রাতবাড়বার আগেই মহিলাদের থাকার জন্যে সুরক্ষিত ব্যবস্থা করতে হবে।

কড়া মিলিটারি পাহারায় সিভিল লাইনসের সমস্ত ইংরেজ নারী আর শিশুদের গোবিন্দগড় দুর্গে সরানো হোলো। রাত এগারোটায় মেজর ম্যাকডোনালডের নেতৃত্বে চারশো সৈন্য এল। সেই সৈন্যদল নিয়ে মেজর হল গেট পার হয়ে শহরে ঢুকলেন। চারশো সৈন্য গুলিভরা বন্দুক উঁচিয়ে মার্চ করতে করতে কোতোয়ালীতে গেল। সেখানে দেশী পুলিসের আশ্রয়ে ছিলেন আহত মিস শেরউড, মিসেস ঈসডন ও চারজন ইংরেজ পুরুষ। তাঁদের উদ্ধার করে এনে কর্তৃপক্ষের সেদিনকার মতো কর্তব্য শেষ হোলো।

॥ ১১ ॥

জালিয়ানওয়ালাবাগের বীর সেনাপতি ডায়ার অমৃতসর পৌঁছলেন ১১ই এপ্রিল তারিখে রাত নটার সময়। সন্ধ্যা ছটার সময় তিনি যাত্রা করেছিলেন জালন্ধর থেকে। যাবার মুখে পুত্র ক্যাপটেন আইভর ডায়ারকে উৎসাহভরে বলেছিলেন,—

দেখবে। আমি গিয়ে পৌঁছোই,—তারপর তুমুল কাণ্ড একটা হবে দেখো।

কিন্তু তুমুল কাণ্ডের পূর্বাভাস সেদিন অমৃতসর শহরে নেই। দোকানপাট একটিও খোলেনি। অমৃতসরবাসী শোকার্ত, বিষণ্ণ। শ্রান্ত ও অনুতপ্ত। তাদেরই মধ্যেকার একদল লোক অন্যায় করেছে,—হিংসার কবলে আত্মসমর্পণ করেছে। এতে সকল অমৃতসরবাসীর লজ্জা।

কিন্তু অন্যায়কে স্বীকার করতে লজ্জা নেই। তাই সকালবেলা স্থানীয় নেতা মকবুল মহম্মদ গেলেন ডেপুটি কমিশনার মাইলস্ আরভিং-এর বাংলোয়। গতকাল মিলিটারি আর পুলিসের গুলিতে যারা মরেছে, তাদের দেহগুলি সৎকারের জন্য কবর আর শ্মশানভূমিতে নিয়ে যেতে হবে। অন্ত্যেষ্টিযাত্রায় শহরবাসীকে যোগ দেবার অনুমতি দেওয়া হোক,—এই অনুমতির প্রার্থনা তিনি নিয়ে এলেন ডেপুটি কমিশনারের সকাশে।

বজ্রগর্জনে এই অনুরোধের উত্তর দিলেন মাইলস্ আরভিং। কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত দায়িত্বে দুশ্চিন্তায় আর পরিশ্রমে তিনি পাগল হয়ে উঠেছিলেন,—শিথিল হয়ে এসেছিল দেহের প্রতিটি স্নায়ু। কিন্তু আজ সকালবেলা তিনি অনেকটা শক্ত হয়েছেন, ফিরে পেয়েছেন মনোবল। কাল রাত্রে মেজর ম্যাকডোনালডের নেতৃত্বে চারশো সৈন্য এসেছে, আজ আবার ভোরবেলা জালন্ধর থেকে জেনারাল ডায়ার পাঠিয়েছেন আরো তিনশো। আর তাঁর দুর্ভাবনা নেই।

তিনি হুকুম দিলেন,—প্রতি মৃতদেহের সঙ্গে চারজনের বেশি লোককে যেতে দেওয়া হবে না।

কিন্তু শহরবাসী মৃতদেহ নিয়ে শোকযাত্রা করতে বদ্ধপরিকর। এ তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এতে আপত্তি কেন,—এতে বাধা দেবার কারণ কী?

আরভিং বললেন,—কারণ জানাতে আমি বাধ্য নই। ইংরেজদের খুন করে তাদের দেহ আগুনে পুড়োনো হয়েছে কাল,—এ আমার নিজের চোখে দেখেছি। আমার হুকুমই যথেষ্ট।

প্রতিনিধি মকবুল মহম্মদ হাতজোড় করে বললেন,—

কাল জনতা হিংস্র হয়েছিল, কয়েকজনকে হত্যা করেছিল। এর জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। সেই দুঃখ জানাতেও আমরা আপনার কাছে এসেছি।

দুঃখিত? ডেপুটি কমিশনার কঠোর গলায় বললেন,—

এ দুঃখ কাল কোথায় ছিল? কথা বাড়াবেন না। আমার হুকুম যেন তালিম হয়,—না হলে দুঃখ আরো বাড়বে।

পাশে একজন সামরিক অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ক্রুর কণ্ঠে বললেন,—

হুকুম যদি না শোনে তাহলে আকাশ থেকে বোমা ফেলে হুকুম শোনানো হবে।

দুপুরবেলা সৈন্যদল শহরের মধ্যে ঢুকল। বড়ো রাস্তায় তারা মার্চ করে বেড়ালো। শহরের কয়েকজন মাতব্বর লোককে ডেকে তাদের হাতে সরকারী লিখিত হুকুমনামা ধরিয়ে দেওয়া হোলো। হুকুমনামা অনুসারে,—অমৃতসরের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে সৈন্যদলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত শক্তির ব্যবহার তারা করতে পারবে। কোনো সভা, শোভাযাত্রা বা জমায়েত চলবে না। ভিড় দেখলেই তার উপর গুলি চালানো হবে। চারজনের বেশি লোক যদি একসঙ্গে শহর থেকে বার হয়, তাহলে

তাদের উপর গুলি চালানো হবে। ভদ্রব্যক্তিরা যেন ঘর থেকে বার না হয়।

বিকেলবেলা নিহতদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হোলো। শবদেহগুলির পিছনে বিরাট এক শোভাযাত্রা শহরের গেট পর্যন্ত এল। তারপর শহরের বাইরে কয়েকটি ক্ষুদ্র দল দেহগুলিকে নিয়ে গেল শ্মশানে ও সমাধিক্ষেত্রে। বিকেল চারটের মধ্যে নিরুপদ্রবে শেষকৃত্য শেষ হোলো।

সন্ধ্যাবেলা যথারীতি লোক চলাচল শুরু হোলো। নির্বিঘ্নে কাটল দিনটি।

রাত্রিবেলা অমৃতসর স্টেশনে উপস্থিত হলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার। লাহোর থেকে ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়েছিলেন যে শুধু সৈন্য পাঠালে চলবে না, তাঁকে নিজেও যেতে হবে অমৃতসরে। অমৃতসর তাঁকে রক্ষা করতে হবে।

তিনি জালন্ধর থেকে আসবার সময় ছেলেকে বলে এসেছিলেন,—

ঠিক আছে, আমি একটা তুমুল কাণ্ড করে ছাড়ব।

অমৃতসরে পৌঁছেই তাঁর রেল-কামরায় ডায়ার পরামর্শসভা ডাকলেন। ছুটে এলেন ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ কমিশনার ও তাঁদের সহকারীরা। আগের দিনের ঘটনা তাঁরা সবিস্তারে জেনারেলকে শোনালেন। শোনালেন কতো লুট আর অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, পাঁচজন ইংরেজকে কী নৃশংসতার সঙ্গে হত্যা করা হয়েছে, একজন মাননীয়া ইংরেজ মহিলাকে কী কাপুরুষ বীভৎসতার সঙ্গে নিগৃহীত করা হয়েছে। ডায়ার শুনলেন অমৃতসর শহর আর সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে নেই,—সারা শহরে মানুষ বিদ্রোহী হয়েছে, যথেচ্ছাচার করছে। সেই বিদ্রোহ এবার গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল বলে। গ্রামের লোকরা শহরে ছুটে এল বলে। তারা যদি শহরের লোকের সঙ্গে হাত মেলায় তাহলে আর রক্ষা নেই।

মাইলস্ আরভিং বললেন,—

গত সিপাহী বিদ্রোহের পর এমনি অবস্থা আর হয়নি। বিদ্রোহীরা হুংকার দিয়ে বলছে,—সরকার নেই, সরকার মরেছে। ওদের গুলি-বন্দুককে গ্রাহ্য করিনে। চড় মেরে ইংরেজগুলোকে ভাগাব।

পুলিশের কর্তা বললেন,—

ওরা সব ডাণ্ডাফৌজ তৈরি করছে। সেই জন্যে হাজার হাজার লাঠি চালান হয়েছে। বিদ্রোহীদের হাতিয়ার এসে পৌঁছল বলে।

বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মানসিক দুর্বলতার হদিস পেতে জেনারেল ডায়ারের দেরি হোলো না। তিনি ডেপুটি কমিশনারকে বললেন,—

এ অবস্থায় আমি আপনাদের কী ভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন।

আরভিং বললেন,—

সর্বতোভাবে। অবস্থা আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। আপনি ভার নিন,—আপনি বিদ্রোহ দমন করুন।

ডায়ার বুঝলেন সরকারীভাবে সামরিক আইন জারি না হলেও সামরিক কর্তৃত্ব ছাড়া অবস্থা আয়ত্বে আনা যাবে না। তিনি স্থানীয় সর্বময় সামরিক নেতা। তাঁকেই যা করার করতে হবে। তাঁরই উপর সকল ভার। চূড়ান্ত দায়িত্ব তাঁরই। বিদ্রোহ দমনের,—বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বজায় রাখার।

ডায়ার চিন্তা করলেন। কিন্তু বেশি চিন্তা করবার লোক তিনি নন। তিনি দেখলেন,—তার সামনে দেড় লক্ষ অধিবাসীর এক বিদ্রোহী শহর। তার চারপাশে গ্রামাঞ্চল, যেখানে বিদ্রোহের আগুন যে কোনো মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে। মাঝখানে তিনি আর তাঁর সৈন্যবাহিনী। বেশি চিন্তা করা চলবেনা,—বেশি দেরী করা চলবে না। যে কোনো সময়ে বিদ্রোহের বেড়াজাল তাঁকে ঘিরে ধরবে,—তাঁকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। বিদ্রোহের

দাবানলে তিনি ঝলসে মরবেন,—সেই সঙ্গে সেই বহ্নিশিখায় পুড়ে নিশ্চিহ্ন হবে ভারতে বৃটিশ শাসনের গর্বোদ্ধত নিশান।

বাছাই করা একদল সৈন্য তিনি তৎক্ষণাৎ তলব করলেন। তার পর সেই গভীর রাত্রে হল গেট পার তিনি শহরের মধ্যে ঢুকলেন। সৈন্যরা তাঁকে ঘিরে এগিয়ে চলল।

তখন গভীর রাত। সারা অমৃতসর শহর ঘুমচ্ছে। কোনো বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ। মৃত প্রিয়জনের দেহসৎকার সম্পূর্ণ হয়েছে অপরাহ্ণে,—শোকের বেদনা তখনো প্রশমিত হয়নি। সৈনিকদের পদদাপের শব্দে চমকে উঠল তারা,—কারো কারো ঘুম ভাঙল। আতঙ্কে নিঃশব্দ হয়ে তারা রইল।

ডায়ার আর তাঁর সৈন্যদল শহরের প্রধান রাস্তা মাড়িয়ে কোতোয়ালীতে গেলেন। পুলিস অফিসাররা তাঁকে দেখে শশব্যস্ত। তিনি অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন,—নির্দেশ দিলেন। তারপর আবার সসৈন্যে শহর পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

গভীর রাত্রের সেই নির্দেশ অনুসারে কাজ শুরু হোলো পরদিন প্রত্যুষেই। লাহোর থেকে একটা এরোপ্লেন এসে শহরের মাথায় চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। এরোপ্লেনের পাইলটের কাছ থেকে খবর এল যে শহর একেবারে ঠাণ্ডা। উত্তেজনার টুঁ শব্দ কোথাও নেই। সেই খবরে আশ্বস্ত হয়ে ডায়ার তখন শহর পরিদর্শনে বার হলেন।

এবার দিনের আলোয়। সঙ্গে চলল একশো পঁচিশ জন বৃটিশ সৈন্য আর তিনশো দশজন দেশী সেপাই। সামনে পিছনে দুই সাঁজোয়া গাড়ি। ইতিমধ্যে গতকাল রাত্রের নির্দেশ অনুসারে কোতোয়ালীর পুলিস বারোজন স্থানীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। এই গ্রেপ্তারের খবরে শহর কতো চঞ্চল হতে পারে তার সরেজমিন তদন্ত করতে শহর পরিভ্রমণ করলেন ডায়ার।

শহরের অবস্থা দেখে ডায়ার সন্তুষ্ট হলেন। তারপর পুলিস মারফত এক ঘোষণা তিনি প্রচার করলেন।

অমৃতসর শহরের অধিবাসীদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে যে শহরের বাইরে কাছাকাছি যদি কোনো হিংসামূলক কার্য হয় তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে শহরবাসীরাই এমনি কাজের জন্যে দায়ী। দুষ্কৃতিকারীদের সামরিক আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া হবে। সমস্ত প্রকার সভা বা জমায়েত বারণ,—এমনি সভা বা জমায়েত হলে তা সামরিক আইনমতো ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হবে।

সেদিনও সম্পূর্ণ নিরুপদ্রবে কাটল। সারা অমৃতসর শহরে কোনো গোলমাল নেই। পুলিশ মিলিটারির তৎপরতার কোনো দরকার নেই। জেনারেল ডায়ার বুঝলেন,—তাঁর উপস্থিতিতেই ফল ফলেছে। বিদ্রোহীরা সবাই ভয়ে মুখ লুকিয়েছে। ডেপুটি কমিশনার আশ্বস্ত হয়েছেন,—কোতোয়ালীর পুলিস রুটিন মাফিক ডিউটি শুরু করেছে।

কিন্তু তাঁর কাজ এখনো শেষ হয়নি। ইংরেজের গায়ে হাত তুলেছে বিদ্রোহীরা, পাঁচজন ইংরেজকে হত্যা করেছে। তার বিনিময়ে মরেছে মাত্র ত্রিশজন। সে শাস্তি যথোচিত নয়,—তাছাড়া সে শাস্তি তিনি আসার আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। আসল শাস্তি এবার তিনি দেবেন,—সে শাস্তি এমন শাস্তি হবে যে তার উদাহরণের জুড়ি মিলবে না। অমৃতসরে যে দাপট তিনি দেখাবেন তাতে সারা ভারতবর্ষ কেঁপে উঠবে।

পরদিন রবিবার ১৩ই এপ্রিল। গত দুদিন অমৃতসর শহর সম্পূর্ণ শান্ত ছিল। অমৃতসর শহরে পা দেওয়ার পর জেনারাল ডায়ার এমন কোনো ঘটনার সম্মুখীন এ পর্যন্ত হননি, যাতে তিনি তাঁর দাপট দেখাবার সুযোগ পান। বারোজন নেতাকে তিনি গ্রেপ্তার করিয়েছেন। তবু জনতা বিচলিত হয়নি। কোনোরূপ

উত্তেজিত প্রতিবাদ করেনি। তিনদিন আগে তারা হিংসামূলক কাজ করেছিল,—তার অনুশোচনায় তারা ম্রিয়মাণ। নেতারা শান্তিরক্ষার জন্যে ব্যস্ত।

সেদিন সকালবেলা জেনারেল ডায়ার, ডেপুটি কমিশনার ও পুলিস সুপারকে সঙ্গে নিয়ে রামবাগ থেকে শহরের মধ্যে ঢুকলেন। গতদিন পুলিস মারফৎ যে ঘোষণা করা হয়েছিল সেই ঘোষণা শহরের বিভিন্ন স্থানে আবার করা হোলো। একজন ঢাকী ঢাক পিটিয়ে লোক জড়ো করল। একজন ঘোষক উর্দু ও পাঞ্জাবীতে সেই ঘোষণা পাঠ করল।

আগের দিনের সেই ঘোষণা,—

অমৃতসর শহরের অধিবাসীদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে যে শহরের বাইরে কাছাকাছি যদি কোনো হিংসামূলক কাজ হয় তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে শহরবাসীরাই এমনি কাজের জন্যে দায়ী। দুষ্কৃতিকারীদের সামরিক আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া হবে। সমস্ত প্রকার সভা বা জমায়েত বারণ,—এমনি সভা বা জমায়েত হলে তা সামরিক আইনমতো ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হবে।

এই সঙ্গে আর একটি ঘোষণাও পড়া হোলো যার মর্মার্থ হোলো :

কয়েকজন নির্দিষ্ট অফিসারের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো অমৃতসরবাসী শহরের বাইরে যেতে পারবে না। সন্ধ্যা আটটার পর কোনো নগরবাসী বাড়ি থেকে বার হতে পারবে না। সন্ধ্যা আটটার পর কাউকে রাস্তায় দেখা গেলে তাকে গুলি করা হবে। শহরে বা শহরের বাইরে কোনো শোভাযাত্রা করা চলবে না। এমনি শোভাযাত্রা বা জমায়েত বে-আইনি এবং তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সশস্ত্র উপায়ে তাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হবে।

উভয় ঘোষণার লিপিতে সই করেছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার।

জেনারেল ডায়ারের এই হুকুম অমৃতসরবাসীরা মান্য করেনি। ডাক্তার কিচলু আর ডাক্তার সত্যপালের মতো নেতারা শহর থেকে উধাও। স্থানীয় আরো অনেক নেতাদের গ্রেপ্তার করেছেন ডায়ার। তবু নেতৃত্ব দেবার মতো লোক অমৃতসরে ছিলেন। হিংসার নেতৃত্ব নয়, ধ্বংসের নেতৃত্ব নয়। শান্তিপূর্ণ ও অহিংস প্রতিবাদের।

ডাক্তার সত্যপাল ও ডাক্তার কিচলুর মতো অহিংসবাদী নেতাদের যদি অন্যায় কৌশলে বন্দী করে শহর থেকে সরানো না হোতো তাহলে শহরবাসী উত্তেজিত হোতো না। এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যেই শহরবাসী ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। অনুরোধ নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, প্রতিবাদ নিয়ে। ডেপুটি কমিশনার যদি তাঁর প্রজাদের কথা শুনতেন, তাদের ব্যথিত বুকের সামনে সশস্ত্র প্রাচীর না তুলতেন, তাহলে সেদিন এতো কাণ্ড হোতো না। এতো অকারণ ধ্বংস, এতো রক্তারক্তি, নির্দোষ মানুষের এমনি শোকাবহ মৃত্যু। অহিংস প্রজার বুকে হিংসার ভয়াবহ ইন্ধন সরকারই জ্বালিয়েছিলেন। জনতা সেই হিংসার ফাঁদে পা দিয়েছিল,—তার জন্যে শান্তিব্রতী নেতাদের অনুশোচনার সীমা নেই।

সেই কলুষিত মনকে সম্পূর্ণভাবে নির্বিষ করতে হবে। গান্ধীজী পথের সন্ধান দিয়েছেন,—ভ্রষ্ট জনতাকে আবার সেই পথে ফিরে যেতে হবে। নির্ভীক বলিষ্ঠ অথচ সম্পূর্ণ অহিংসার মন নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। সেই প্রতিবাদের সভা হবে বিকেলবেলা,—জালিয়ানওয়ালাবাগ ময়দানে।

এই সভা যাঁরা আহ্বান করেছিলেন,—তাঁরা জেনারেল ডায়ারের হুকুম অমান্য করেছিলেন। বিবেকের নির্দেশ ও শাসকের নির্দেশ—এই দুই নির্দেশের মাঝামাঝি পথ তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। সে পথ সত্যের পথ, শান্তির পথ।

অমৃতসর শহর শান্ত,—এই শান্ত অবস্থাকে শাসক স্বীকার করেছেন,—তাই তাঁর সাবধানবাণী শহরের বহিরাঞ্চল সম্বন্ধে।

তাই শহরের বাইরে কোনো অমৃতসরবাসীকে বিনা অনুমতিতে যেতে দেওয়া হবেনা। এই নির্দেশ অশুভ নয়। শহরে যদি কোনো শোভাযাত্রা বার হয় তাহলে সেই শোভাযাত্রা শহরের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে পারে। তাহলে আবার পুলিস মিলিটারির সঙ্গে সংঘর্ষ হবে,—মানুষ বলি হবে হিংসার। অতএব এই নির্দেশও মান্য করা শুভ। বিক্ষোভ-মথিত শহরে এখনো হরতাল,—এখনো কাজকর্ম বন্ধ। এ অবস্থায় রাত আটটার কার্ফু অমঙ্গলকর নয়। এই হুকুমও মানা উচিত।

কিন্তু সভা? শহরের মধ্যে বিকেলবেলা যদি অধিবাসীরা শান্তিপূর্ণ সভা করে তাহলে অন্যায় কোথায়? এই সভায় তারা তো অন্যায়ের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করবে,—রাওলাট বিলের অন্যায়, বিনা বিচারে তাদের প্রিয় নেতাদের গ্রেপ্তার করার অন্যায়, বিনা কারণে শান্ত প্রজাদের অশান্তির পঙ্কে ঠেলে দিয়ে হিংসার তাণ্ডব সৃষ্টির অন্যায়।

অতএব এ সভা হবে। জেনারেল ডায়ারের ঘোষণায় বলা হয়েছে,—যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সশস্ত্র উপায়ে এই সভাকে ছত্রভঙ্গ করা হবে। কোনো চিন্তা নেই,—সে প্রয়োজন হবে না। এ সভা হবে নিরস্ত্র সম্পূর্ণ অহিংস জনগণের সভা। এই সভা হবে হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসার পরীক্ষা,—অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের পরীক্ষা।

জেনারেল ডায়ারের কানে খবর পৌঁছতে দেরী হোলো না। তাঁর হুকুম অমান্য করেছে অমৃতসরের অধিবাসীরা। জালিয়ানওয়ালাবাগে তারা সভা করছে বিকেলবেলা।

প্রধান রাস্তার কয়েকটি জায়গায়, হল গেট, হাথি গেট, লাহোরী গেট প্রভৃতি শহরের কয়েকটি সীমানায় ও কয়েকটি চকের মোড়ে ঘোষক ঢোল বাজিয়ে তাঁর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছিল। সেই

নিষেধাজ্ঞা অনেক অঞ্চলেই পৌঁছয়নি। বিশেষ করে শহরের প্রধানতম স্থান স্বর্ণমন্দির এলাকায়। এই স্বর্ণমন্দির থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে জালিয়ানওয়ালাবাগ। এই বাগে যারা জমায়েত হবে তাদের অনেকে হয়তো তাঁর নিষেধাজ্ঞার খবরই রাখে না।

কিন্তু এ চিন্তার অবসর তখন ডায়ারের নেই। তিনি সামরিক নেতা,—সামরিক অভিযানের স্বুবর্ণ স্বুযোগ তিনি পেয়েছেন। এ স্বুযোগ হাতছাড়া হতে দিলে চলবে না। জালন্ধর থেকে এখানে আসার আগে তিনি তাঁর ছেলেকে বলে এসেছিলেন,—একটা তুমুল কাণ্ড আমি গিয়ে করব। সেই কাণ্ডের সম্ভাবনা এখন তাঁর হাতের মুঠোয়।

ডায়ার অমৃতসরে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। যুদ্ধ করতে এবং জয় করতে। বিদ্রোহীদের ধ্বংস করে বিদ্রোহকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে। কিন্তু কোন্ সৈন্যব্যূহ তিনি রচনা করবেন? কী উপায়ে সার্থক করে তুলবেন তাঁর অভিযান? তাঁর পিছনে হাজার খানেকের কিছু বেশি সৈন্য,—যার প্রায় সাড়ে সাতশো ভারতীয়। তাঁর শত্রুর সংখ্যা এক লক্ষ ষাট হাজার। শহরের মধ্যে অসংখ্য আঁকাবাঁকা সরু সরু গলি,—গলির দুপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি। মাঝে মাঝে চক, বাজার, চৌরাস্তার মোড়। এই শহরের মধ্যে ঢুকে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে তিনি পারবেন না। ছোটবড়ো গলির মধ্যে আর বাজারের চৌহদ্দিতে ঐ মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করলে জয়ের আশা কম,—ধ্বংসের সম্ভাবনাই বেশি।

কিন্তু এ বড়ো চমৎকার হয়েছে,—শত্রু নিজেই ফাঁদে ধরা দিয়েছে। সব বিদ্রোহীরা এক জোট হয়ে খোলা জায়গায় জমায়েত হচ্ছে,—ঐ জালিয়ানওয়ালাবাগে। সেখানে সবাইকে তিনি একসঙ্গে পাবেন,—একটি নির্ভুল চকিত আক্রমণে একসঙ্গে তাদের ধ্বংস করবেন। তাঁর একটি আঘাত সারা ভারতের সমস্ত বিদ্রোহীদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেবে।

বিকেল সাড়ে চারটায় সভা। জালিয়ানওয়ালাবাগের চারদিকে উঁচু দেয়ালের পাহারা। উত্তরদিকে সরু একটি গলি। তারও দুপাশে খাড়া বাড়ি। সাঠেওয়ালা বাজারের রাস্তা থেকে সেই গলি দিয়ে লোক বাগের মধ্যে ঢুকছে। অনেকে চলেছে শিশুকে সঙ্গে নিয়ে। রামনবমীর জন্যে অনেক বাইরের লোক শহরে মেলা করতে এসে থেকে গেছে। তারাও সভা শুনে পোঁটলা হাতে আসছে। কারে মুখে চিৎকার নেই, কারো হাতে একটি লাঠিও নেই।

জনতা খুব কম করেও কুড়ি-পঁচিশ হাজার। সভা আরম্ভ হোলো। সকলে স্থির, সকলে স্তব্ধ। সভা পরিচালনা করলেন শ্রীহংসরাজ। তিনি সভাবেদীর উপরে অমৃতসরের সর্বজনপূজ্য নেতা ডাক্তার কিচলুর একটি ছবি রেখে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—

ডাক্তার কিচলুই এই সভার সভাপতি। তিনি সশরীরে এখানে উপস্থিত নেই কিন্তু তার উপস্থিতিকে আমরা মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করছি। তাঁর এই প্রতিকৃতিকেই আজ আমরা সভাপতি বলে বরণ করে নিলাম।

তারপর শ্রীহংসরাজ বলতে শুরু করলেন। বৃটিশরাজের প্রতি বিদ্রোহের সামান্যতম আভাস তাঁর ভাষায় বা ভঙ্গিতে নেই। তিনি বললেন,—

গত ১০ তারিখে লোকের উপর অনুচিত গুলি চালানো হয়েছে। তার কারণ লোকেরা ডেপুটি কমিশনারের কাছে একটি অভিযোগ নিয়ে যাচ্ছিল। সেই অভিযোগে কর্ণপাত করা হয়নি, তার বদলে চালানো হয়েছে গুলি।

তিনি আরো বললেন,—

এই সভায় আমরা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করব। সেই প্রস্তাবে রাওলাট আইনকে রদ করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হবে।

ঠিক এমনি সময় অস্ত্রধারী সৈন্যের দল জালিয়ানওয়ালাবাগে ঢুকল। যে পথ দিয়ে শহরবাসীরা ঢুকেছিল সেই একই পথ দিয়ে।

উত্তরের সেই একটিমাত্র সরু গলি দিয়ে। তাদের নেতারূপে এলেন জেনারেল ডায়ার।

দশ মিনিট ব্যাপী অতর্কিত ও নিরবচ্ছিন্ন গুলিবর্ষণে মরল প্রায় তিনশো লোক, আহত হোলো হাজারেরও অধিক।

ছত্রভঙ্গ হোলো বিদ্রোহীদের সভা।

সেদিন রাত্রে জেনারেল ডায়ার বন্দুকধারী সৈন্যদল নিয়ে আবার অমৃতসরের পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন। তার কার্ফু আইন কেউ অমান্য করছে কিনা দেখতে। অমান্য করলেই গুলি চলবে।

সব স্থির, সব নিস্তব্ধ, সব শ্মশান। একটি লোকেরও দেখা নেই। মিলিটারি বুটের হিংস্র শব্দ শুনে শোকার্তের কান্না পর্যন্ত ঘরের নিভৃত কোণে নিশ্চুপ হয়ে আছে।

॥ ১২ ॥

পরদিন সকালবেলা লাহোরে।

সামরিক-প্রধান জেনারেল সার উইলিয়ম বেনন টেলিফোন করলেন গভর্ণর সার মাইকেল ও-ডায়ারকে।

অমৃতসরের ব্যাপার শুনেছ ?

ভাসাভাসা শুনেছি ডেপুটি কমিশনার মাইলস্ আরভিং এর মারফৎ। কাল বিকেলে নাকি এক বে-আইনি সভার উপর ডায়ার গুলি চালিয়েছে। প্রায় দুশো লোক মরেছে। আরভিং অবশ্য নিজে ছিল না, ব্যাপারটা নিজে চোখে দেখেনি। তবে রাত্রিবেলা ডায়ারের সঙ্গে শহর টহল দিয়েছে। জানিয়েছে,—সব ঠাণ্ডা।

মোটামুটি ঠিকই শুনেছ। তবে আমি একটু আগে আরো পাকা খবর পেলাম। ডায়ার তার ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছে।

সেদিন সকাল বেলা এগারোটা নাগাদ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের রিপোর্ট লাহোরে জেনারেল বেননের হস্তগত হয়েছিল। আগের দিনের ঘটনা সম্বন্ধে ডায়ার জানিয়েছেন,—

আমি একটা খুব সরু গলির মধ্যে দিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে ঢুকেছিলাম। সেই জন্যে আমার সাঁজোয়া গাড়িগুলিকে পিছনে রেখে আসতে হয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগে ঢুকে দেখলাম সেখানে অন্তত পাঁচ হাজার লোকের পেশাপেশি ভিড়। একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে একজন লোক হাত নেড়ে নেড়ে এই জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছে।

আমি উপলব্ধি করলাম যে আমার সঙ্গের সৈন্যসংখ্যা কম,—যদি ইতস্তত করি তাহলে আমরাই হয়তো আক্রান্ত হব। আমি তৎক্ষণাৎ গুলি চালাবার নির্দেশ দিলাম ও ভিড়টা ছত্রভঙ্গ করে দিলাম।

আমার হিসাবে ভিড়ের মধ্যেকার অন্তত দু-তিনশো লোক মরেছে। আমার দল ১৬৫০ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়েছিল।

জেনারেল বেনন বললেন,—

ডায়ার একটা কাজের মত কাজ করেছে, অমৃতসরের বিদ্রোহকে টুঁটি টিপে মেরেছে।

ও-ডায়ার বললেন,—

শুধু অমৃতসর শহরের নয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের গুলির খবর চারদিকে ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ আর ছড়াবে না।

বেনন বললেন,—

আমি ডায়ারকে জানিয়ে দিচ্ছি যে তুমি ঠিক কাজই করেছ। সঙ্গে একথাও কি জানাতে পারি, যে গভর্ণর ও-ডায়ারও তোমার কাজ সমর্থন করছেন ?

ও-ডায়ার বললেন,—

নিশ্চয়ই।

পাঞ্জাবের গভর্ণর ও সেনাপ্রধানের অভিনন্দিত সমর্থন অমৃতসরে ডায়ারের কাছে পৌছলো। ইতিমধ্যে গভর্ণর ও-ডায়ার ভারত সরকারের কাছে তারযোগে জানালেন যে পাঞ্জাবে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। এই বিদ্রোহকে অসামরিক কর্তাদের পক্ষে দমন করা সম্ভব নয়।

ভারত সরকারের জরুরি ঘোষণা অনুসারে সারা পাঞ্জাবে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হোলো। বেসামরিক কর্তৃপক্ষ দেশরক্ষা ও প্রজাপালনের সমস্ত দায় সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলেন।

ও-ডায়ার ঠিকই বলেছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়াবার সঙ্গে পাঞ্জাবের সর্বত্র সমস্ত প্রকার হাঙ্গামা শান্ত হয়ে গেল। ১৪ তারিখে গুজরানওয়ালা শহরের গণ্ডগোল সামরিক কর্তৃপক্ষ কঠোরহাতে দমন করার পর সারা পাঞ্জাবে আর কোনো উল্লেখযোগ্য বিশৃঙ্খলা ঘটল না। জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল

ডায়ারের বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ এক প্রচণ্ড বিদ্রোহের হাত থেকে ভারত সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়েছে,—সেই ঘোষণায় সামরিক ও বেসামরিক কর্তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের দিন সকালে জেনারেল ডায়ার ঘোষণা করেছিলেন,—তাঁর হুকুম অমান্য করলে তিনি সামরিক আইন অনুসারে শাস্তি দেবেন। নিরস্ত্র নিরপরাধ জনতার উপর ১৬৫০ রাউণ্ড গুলি চালিয়ে তিনি সেই শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন অমৃতসরের প্রকৃত কর্তা ছিলেন ডেপুটি কমিশনার মাইলস্ আরভিং,—মিলিটারি কমাণ্ডার ডায়ার নন।

তার দুদিন পরে যখন অশান্তি বা বিশৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র নেই, তখন অমৃতসরে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হোলো। অমৃতসরের সর্বময় কর্তা হলেন জেনারেল ডায়ার। আগে ছিলেন মাইলস্ আরভিং, পরে এসেছিলেন ডায়ার। আরভিং-ই ডায়ারকে এগিয়ে দিয়েছিলেন,—ডায়ারের সেই অগ্রগামিতার ভয়ংকর প্রকাশ জালিয়ানওয়ালাবাগের কাণ্ড। আরভিং সেই কাণ্ডের সাক্ষী ছিলেন না। এই কাণ্ডের পরও ডায়ারকে পিছোতে হোলো না,—সামরিক শাসনে তিনিই সর্বাধিনায়ক।

তাঁর পিছনে আরভিং। আশ্বস্ত আরভিং।

সেদিন রাত্রে ডায়ার ঘুমতে পারেননি। জালিয়ানওয়ালাবাগের রুক্ষ মাঠে দশ মিনিটের জন্যে উপস্থিত হয়ে যে বর্বর হত্যালীলা তিনি চালিয়ে এসেছেন তার রক্তাক্ত স্মৃতি তাঁর তপ্ত মন জুড়ে রয়েছে,—তার ভয়াল দৃশ্য তাঁর বিনিদ্র চোখে ভাসছে। জোর করে তিনি চোখ বন্ধ করতে চাইছেন,—জোর করে তিনি তার বিবেককে প্রবোধ দিতে চাইছেন। অস্ফুটস্বরে নিজের বিবেককে তিনি শোনাচ্ছেন,—

অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হয়েছে। সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব, প্রজাশাসনের দায়িত্ব। আমার কর্তব্য আমি করেছি,

কঠিন কর্তব্য, নিষ্ঠুর কর্তব্য,—কিন্তু না করে আমার অন্য উপায় ছিল না!

সত্যিই কি উপায় ছিল না? শান্তিপূর্ণ জনসভায় দু-হাজার নিরস্ত্র নিরীহ মানুষকে হতাহত করাই কি ছিল তাঁর কর্তব্য? তারা সভা করেছিল,—কিন্তু ধমক আর ভয় দেখিয়েই কি এই সভা তিনি ভেঙে দিতে পারতেন না? তা হয়তো পারতেন,—কিন্তু তাতে তাঁর কর্তব্য সুসম্পন্ন হোতো না, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোতো না। তিনি এসেছিলেন বিদ্রোহ দমন করতে,—অমৃতসরের বিদ্রোহ দমন করে সারা ভারতকে শিক্ষা দিতে।

সারারাত্রের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন সকালবেলা প্রসন্ন হোলো। লাহোর থেকে তিনি সমর্থন পেয়েছেন। সামরিক বেসামরিক উভয় মহলেরই সমর্থন। সমর্থন করেছেন তাঁর উর্ধ্বতন সেনানায়ক জেনারেল বেনন। সমর্থন করেছেন গভর্ণর ও-ডায়ার। আর তাঁর ভাবনা নেই,—প্রশমিত বিবেকের দংশন।

মাইলস্ আরভিংকে তিনি ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—শহরের অবস্থা কী?

আরভিং খুব পাকা খবর দিতে পারলেন না। বললেন,—

কাল রাত্রে তো সব ঠাণ্ডাই দেখে এসেছিলাম আমরা। কোতোয়ালী থেকেও আর কোনো খবর আসেনি।

ডায়ার বললেন,—

রাত্রি আর দিন এক নয়। তাছাড়া কোতায়ালীর উপর কী নির্ভর? কোতোয়ালীর চোখের সামনে ওরা ব্যাংক পোড়ায়নি? আমি নিজে যাচ্ছি। আপনিও চলুন সঙ্গে।

ডায়ার আর আরভিং আবার ঢুকলেন শহরের মধ্যে। তখন দ্বিপ্রহর পার,—কিন্তু চারদিকে যেন রাত্রির নিস্তব্ধতা। পথে লোক নেই বললেই চলে,—দোকান বাজার সব বন্ধ। ডায়ারের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদল মার্চ করতে করতে চলল। সেই শব্দ শুনে রাস্তার ধারে ধারে

কিছু লোক জমা হোলো,—তারা নীরবে তাদের দেখল,—একটি শব্দ পর্যন্ত করল না।

কোতোয়ালীতে পৌঁছে ডায়ার হাঁক দিলেন,—

সব ঠিক আছে।

হাঁ সরকার, সব ঠিক আছে,

লোকজন ডাকো, আমরা বক্তৃতা দেব।

কিছু লোক জমায়েত হোলো। আরভিং-এর মুখ অনেকের চেনা। কেউ কেউ তার সামনে হাতজোড় করল। আরভিং বললেন,—

সরকারের শক্তির পরিচয় তোমরা পেয়েছ। সরকার জার্মানদের হারিয়েছে,—তোমাদেব শাসন করার শক্তি সরকারের আছে। সেই সরকারের ক্ষমতা জেনারেল সাহেব তোমাদের দেখিয়েছেন। তিনিই এখন শহরের মালিক। তিনি তোমাদের হুকুম দিতে এসেছেন। তাঁর হুকুম তোমাদের মানতে হবে।

জেনারেল ডায়ার তখন বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। সেই মুহূর্তের বীরপুঙ্গব তিনি,—দেড় লক্ষ অমৃতসরবাসীর দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। নিজের শক্তি অধিকার আর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

তিনি উদ্বেলিত কণ্ঠে কম্প্রপ্রাণ প্রজাদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন,—

তোমরা জানো আমি একজন মিলিটারি লোক। আমি সৈনিক,—যুদ্ধ করতে আমি ভয় পাইনে, সন্ধি করতেও আমি পিছপাও নই। তোমাদের সাফ কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি,—তোমরা যুদ্ধ চাও না শান্তি চাও? যদি যুদ্ধ চাও, তাহলে যুদ্ধের জন্যে আমরাও প্রস্তুত। যুদ্ধ কাকে বলে তা আমি দেখিয়ে দেব। যদি শান্তি চাও, তাহলে আমার হুকুম পালন করো। এক্ষুনি সব দোকানপাট খোলো। আমার কথা যদি না শোনো তাহলে আবার আমি গুলি চালাব। এ আমার এক কথা—আমি মিলিটারিম্যান, আমি ডানদিকে ফিরিনে, বাঁদিকে ফিরিনে। আমি সোজা চলি,—আর সোজা গুলি চালাই।

আমার কাছে জার্মানীর যুদ্ধক্ষেত্র আর অমৃতসরের যুদ্ধক্ষেত্র দুই-ই সমান। যদি যুদ্ধ চাও তো বলো। যুদ্ধই আমি করব। আমার হুকুম যদি না মানো, দোকানপাট যদি না খোলো, তাহলে রাইফেল দিয়ে দোকান খুলিয়ে আমি ছাড়ব। হাঁ, তোমরা সব সরকারবিরোধী কথা বলো, সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো। এই সব বদমাইসি আমি মূল থেকে উপড়ে আনব। এই সব বদমাইসদের আমি গুলি করে মারব। যদি শান্তি চাও তো আমার হুকুম মানবে,—না যদি মানো, চলে এসো,—সামনে এগিয়ে এসে বলো,—কে যুদ্ধ চাও?

ডায়ারের এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দেবার মতো কেউ সেখানে ছিল না। যারা শান্তিকামী নিরীহ মানুষ তারাই তাঁর গর্বোদ্ধত বক্তৃতা শুনতে এসেছিল। তারাই অমৃতসরের সমস্ত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি—যারা যুদ্ধও করেনি, বিদ্রোহও করেনি, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্তও করেনি। আর তাদেরই প্রতিনিধি গত দিনকার জালিয়ানওয়ালাবাগ সভার সেই তিনশো নিরপরাধ লোক,—যাদের অনেকের মৃতদেহের সংকার এখনো পর্যন্ত হয়নি।

শ্রোতাদের বিনম্র নীরবতা লক্ষ্য করে ডায়ার প্রসন্ন হলেন। মৃতদেহগুলির সংকারের অনুমতি তিনি দিলেন।

পরদিন ১৫ই এপ্রিল তারিখে অমৃতসরে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হোলো। চব্বিশ ঘণ্টা পরে ডায়ার লাহোরে গেলেন গভর্ণর ও-ডায়ারের সঙ্গে আলোচনা করতে। পাঞ্জাব বিভীষিকার দুই অধিনায়ক ডায়ার ও ও-ডায়ারের প্রথম মুখোমুখি আলাপ হোলো সেদিন। ডায়ার তার কর্মপন্থার বিবরণ দিলেন,—ও-ডায়ার তাঁর পিঠ চাপড়ালেন। গভর্ণরের মনে একটি সন্দেহ ছিল। ডায়ার স্বচ্ছন্দে সেই সন্দেহের নিরসন করলেন। বললেন,—

মোটেই ভাববেন না সার যে সৈন্যবাহিনীর গায়ে বিদ্রোহের ছোঁয়াচ লেগেছে। এ সব বদমাইসদের বিদ্রোহ,—তা সায়েস্তা করতে

আমি জানি। জালিয়ানওয়ালাবাগে আমার হুকুমে কারা গুলি চালিয়েছিল জানেন? তারা সবাই দেশী সৈন্য।

সামরিক শাসন প্রবর্তিত হবার আগেই বিদ্রোহ চূর্ণ হয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে সে বিদ্রোহ চূর্ণ করেছেন জেনারেল ডায়ার। তবু সামরিক শাসনের প্রয়োজন এখন আছে। বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে হবে, জালিয়ানওয়ালাবাগে সে শাস্তি সম্পূর্ণ হয়নি।

বেসামরিক শাসনব্যবস্থা হাত গুটিয়ে নিল। সিভিলিয়ান অফিসারের আর কোনো কাজ নয়, কাজ মিলিটারি অফিসারের। গভর্ণরের দায়িত্বও যুদ্ধাধিনায়কের উপর ন্যস্ত। বেসামরিক আইন মূক,—কোর্ট-কাছারির দরজা বন্ধ। শাসন করবে মিলিটারি, বিচার করবে মিলিটারি, শাস্তি দেবে মিলিটারি। বিদ্রোহের সরাসরি বিচার, রাজদ্রোহের সহজ শাস্তি। সে শাস্তি প্রাণদণ্ড। নিতান্ত দয়া করলে দ্বীপান্তর বা দীর্ঘ কারাবাস।

সে শাস্তির জন্যেও অবশ্য বিচারশালা আছে,—জেনারেল ডায়ারের শাস্তি অন্য। শাস্তি অভিযুক্তের জন্যে নয়,—অপরাধী নিরপরাধী সকলের জন্যে। এ শাস্তি রাজদ্রোহের চিন্তামাত্রকে অপমানের কলঙ্কে কলুষিত করবে। এ শাস্তি আদর্শ উদাহরণ। এমন শাস্তির ব্যবস্থা আইনের নয়, আদালতের নয়,—জেনারেল ডায়ারের নিজস্ব।

জেনারেল ডায়ার দুদিন পরে লাহোর থেকে অমৃতসরে ফিরলেন এমনি শাস্তির পরিকল্পনা নিয়ে। পরিকল্পনাকে কাজে লাগাবার আগে তিনি তাঁর নিজের একটি উপযুক্ত মানসিক পটভূমিকা রচনা করতে চাইলেন। তাই গেলেন গোবিন্দগড় কেল্লায়,—যেখানে অন্যান্য শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে রয়েছেন আহত মিস্ মারসেলা শেরউড। ১১ই এপ্রিল তারিখে তিনি অমৃতসরে এসেছিলেন আর মিস্ শেরউডের সঙ্গে দেখা করলেন ১৯ তারিখে।

মিস্ শেরউড তখনো শয্যায় শায়িত,—তার দেহের নানা স্থানে

তখনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এক অসহায় ইংরেজ নারীকে কাপুরুষ দেশীয় প্রজারা এমনি ঘৃণ্য ও বীভৎসভাবে আহত করেছে,—নিজে চোখে তাই দেখে ডায়ার শিউরে উঠলেন। নিরীহ নিরস্ত্র নিরপরাধের প্রতি এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রত্যক্ষ পরিচয় দেখে তাঁর মানবতাবোধ উদ্বেল হয়ে উঠল। তিনি দুর্গ থেকে শহরে ফিরে এলেন আর সঙ্গে সঙ্গে জারি করলেন তাঁর কুখ্যাত হামাগুড়ি হুকুম।

মিস্ শেরউড যে গলিটির মধ্যে আক্রান্ত হয়েছিলেন তার নাম কড়েঁওয়ালা গলি। শহরের অন্য সব গলির মতো এগলিটিও খুব সরু। দুধারে বিভিন্ন তলাবিশিষ্ট ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ি। প্রত্যেক বাড়িতে ঠেসাঠেসি লোক। গলির একমুখে একটি ছোট ইঁদারা,—সেই ইঁদারাই সারা গলির সমস্ত অধিবাসীর জলের উৎস। প্রতিটি পরিবারের মেয়েরা সকাল বিকেল পানীয় জল তুলে নিয়ে যায়।

জেনারেল ডায়ার এই কড়েঁওয়ালা গলির দুধারে মিলিটারি পাহারা বসালেন। কোনো নাগরিক এই গলি দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে না। যদি কাউকে যেতে হয়, তাহলে তাকে হামাগুড়ি দিয়ে বুকে হেঁটে যেতে হবে। গলির মাঝখানে তিনি তিনটি শক্ত খুঁটি পুঁতলেন। মিস্ শেরউডের আঘাতের জন্য যারা দায়ী তাদের ঐ খুঁটিতে বেঁধে চাবুক মারা হবে।

১৯ তারিখ থেকে ২৫,—পুরো সাত দিন এই হামাগুড়ি হুকুম বলবৎ ছিল। এই কদিন স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ,—যে এই রাস্তা দিয়ে গেছে তাকে বুকে হেঁটে যেতে হয়েছে। এমনি ভাবে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে ক্লান্ত হয়ে যদি কেউ মাথা উঁচু করে উঠে বসেছে, বন্দুকের বাঁট বা বুটের লাথি দিয়ে তক্ষুনি তাকে পথের উপর উপুড় করে ফেলা হয়েছে। সম্মানী অধিবাসী আর নিরন্ন ভিক্ষুক,—কেউ এই হুকুম থেকে রেহাই পায়নি। অন্য রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে এই গলির মধ্যে পুরে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা হয়েছে। সাত দিন

ধরে এই গলির অধিবাসীরা রাস্তায় বার হতে পারেনি। মেয়েরা জল আনতে পারেনি। সাতদিন ধরে সারা গলি জুড়ে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়েছে।

কড়েঁওয়ালা গলির উপরের বারান্দা আর জানালা থেকে বন্দী অধিবাসীরা বিস্ফারিত চোখে আরো এক বীভৎস দেখেছে। মিলিটারি টহলদাররা ছ-জন ছেলেকে ঐ গলির মধ্যে ধরে এনেছে। মিস শেরউডের উপর হানাদারির জন্যে তারাই নাকি দায়ী। একের পর এক তাদের প্রত্যেককে উলঙ্গ করে ঐ খুটির সঙ্গে বাঁধা হয়েছে। ভারি বেত দিয়ে প্রত্যেককে মারা হয়েছে। কয়েক ঘা আঘাতের পর কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। তখন তাদের গায়ে মাথায় জল ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে এনে আবার চাবুক চালানো হয়েছে। তারপর তাদের অর্ধমূর্ছিত রক্তাক্ত দেহগুলোকে টেনে নিয়ে গিয়েছে সৈন্যরা।

এই হামাগুড়ি হুকুমের উদ্ভাবক ডায়ার লিখেছিলেন,—

একদল ঘৃণা কাপুরুষ এক অসহায় নারীকে নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছিল। তাকে তারা জুতো দিয়ে মেরেছিল, লাঠি দিয়ে পিটিয়েছিল,—মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়েছিল। এই অপরাধের কী শাস্তি হতে পারে? জুতোর আঘাত ভারতবাসীর পক্ষে সবচেয়ে অপমানকর। তার চেয়েও অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা না হলে চলবে না। অনেক চিন্তা করে সেই শাস্তি আমি উদ্ভাবন করলাম।

মিস্ শেরউড যেখানে আহত হয়েছিলেন সেই জায়গাটা আমি পরিদর্শন করলাম। সেইখানে আমি একটি ত্রিকোণাকৃতি খুঁটি পুঁতলাম। তারপর সেই গলির দুধারে আমি বৃটিশ পাহারাদার সৈন্য খাড়া করে দিলাম। হুকুম দিলাম, এই গলির মধ্যে দিয়ে কোনো ভারতীয় হাঁটতে পারবে না। যদি কেউ যায় তাকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। অবশ্য আমি আশাই করিনি যে কোনো বুদ্ধিমান লোক ঐ গলি দিয়ে যাওয়া-আসা করবে। তাছাড়া আমার ধারণা ছিল যে

ঐ গলির দুপাশের বাড়ির পিছনদিকের দরজা আছে, যা দিয়ে অধিবাসীদের খাদ্য ও পানীয় জল আনবার অসুবিধা হবে না।

হামাগুড়ি হুকুম ঘোষণার পর আমি শাস্তির ব্যবস্থায় আরো এগোলাম। শহরের এগারোজন বদমাসকে গ্রেপ্তার করে পরদিন সকালে আমার কাছে ধরে আনার নির্দেশ আমি দিলাম। পুলিস সেই এগারোজনকে গ্রেপ্তার করে ঐ গলির মধ্যে দিয়ে তাদের নিয়ে এল। আমার হুকুমমতো তাদের বুকে হেঁটে ঐ গলি পার হতে হোলো। এই হুকুম যে কদিন বলবৎ ছিল তার মধ্যে জন পঞ্চাশ লোক এমনি ভাবে ঐ গলি পার হয়েছিল। কিন্তু তারা তো ঐ গলি দিয়ে না গেলেও পারত। আমার পাহারাদার সার্জেন্টের কথা শুনে আমার ধারণা হয়েছে যে ঐ প্রথম এগারোজন কয়েদী ছাড়া আর যারা ঐ গলি দিয়ে গিয়েছিল,—তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু বাহাদুরী দেখানো।

ডায়ারের এই বিবৃতি ঘটনার চারমাস পরেকার রচনা। নিজের কৃতকর্মের এক সহজ সাফাই তিনি এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা আর বে-আইনি বেত্রাঘাত, শহরজোড়া কার্ফু আর কড়েঁওয়ালা গলির হামাগুড়ি হুকুম,—একই লোকের কীর্তি,—আর একই উদ্দেশ্য নিয়ে। সে উদ্দেশ্য এক অমানুষিক আর হিংস্র প্রতিহিংসার চরিতার্থতা।

হাণ্টার কমিটির সামনে ডায়ার যখন উপস্থিত হন তখন কমিটির নানা সভ্যের নানা প্রশ্ন তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নবানে জর্জরিত হবার মতো দুর্বলচিত্ত ডায়ার নন। দ্বিধাহীন জবাব দিয়েছিলেন তিনি।

তাঁর হামাগুড়ি হুকুম সম্পর্কে লর্ড হাণ্টারের প্রশ্নের উত্তরে ডায়ার বলেছিলেন,—

নারীমাত্রকেই আমি পবিত্র জ্ঞান করি। কাপুরুষদের হাতে আক্রান্ত হয়ে মিস্ শেরউডের দেহটি যেখানে লুটিয়ে পড়েছিল,—সেই

জায়গাটিও আমি পবিত্র মনে করেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম এমনি ঘৃণ্য অন্যায় কাজ যারা করেছে তাদের শাস্তি হোক।

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল,—

আপনি ঐ গলির দুধার বন্ধ করে দিয়েছিলেন, ঐ গলি দিয়ে যেতে হলে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন.—এতে অধিবাসীদের কতোটা অসুবিধে হতে পারে তা কি বোঝেননি?

বুঝেছিলাম বৈকি। অধিবাসীদের কষ্ট দেওয়া শাস্তি দেওয়াই তো আমার উদ্দেশ্য ছিল। যারা অবস্থা চোখে দেখেও মিস্ শেরউডকে সাহায্য করতে আসেনি,—তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আর অসুবিধার কথা যদি বলেন,—সারা শহর জুড়ে তারা যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে, সে তুলনায় ঐ গলির লোকদের অসুবিধা তো কিছুই না। দোকানপাট বন্ধ রাখলে লোকের অসুবিধা হয় না? আমি তো গুলির ভয় দেখিয়ে দোকান খুলিয়েছিলাম।

ছ-জন ছেলেকে কড়েঁওয়ালা গড়ির মধ্যে চাবুক মারার প্রসঙ্গে ডায়ার বলেছিলেন,—

ওরাই ছিল আসল আসামী। ওরাই মিস্ শেরউডকে প্রহার করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে ঐ ছ-জন তরুণকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারা হাজতবাসের সময় নিয়মকানুন মানতে চায়নি, দুর্বিনীত ব্যবহার করেছিল। তারাই যে মিস্ শেরউডকে আক্রমণ করেছিল তার কোনো প্রমাণ নেই, প্রমাণ করার চেষ্টাও হয়নি।

কমিটি সে কথা জেনে ডায়ারকে প্রশ্ন করেন,—আপনি কী করে জানলেন যে এই ছেলেগুলিই মিস্ শেরউডকে মেরেছিল? সেই অপরাধের জন্যেই তো ওদের উপর আপনি বেত্রাঘাত চালিয়েছিলেন?

ডায়ার আমতা আমতা করে বলেন,—

অন্য অপরাধের জন্য আমি ওদের বেত মেরেছিলাম বটে, কিন্তু আসলে ওরাই মিস্ শেরউডকে মেরেছিল?

কী করে আপনি তা জানলেন?

জানার অসুবিধা কী? সবাই জানত ওরাই দোষী। দোষীদের শাস্তি না দিলে চলে?

তাই যদি হয়, সবাই যদি জানে যে ওরাই দোষী তাহলে ওদের বিচার হোলো না কেন? দোষী প্রমাণিত হলে উচিত শাস্তি পেত।

ডায়ার স্বীকার করেন আদালতে অভিযুক্ত হলে সম্ভবত তাদের দোষী প্রমাণ করা যেত না। সেই জন্যেই তিনি তাদের সরাসরি কড়ওয়ালা গলিতে টেনে এনে উচিত শাস্তি দিয়েছিলেন।

সত্যিই যারা মিস্ শেরউডকে আক্রমণ করেছিল তাদের সন্ধান কর্তৃপক্ষ পরে পেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই ডায়ার নিরপরাধ লোককে শাস্তি দিয়ে বসে আছেন। নিষ্ঠুর প্রতিহিংসামূলক শাস্তি। অপরাধ প্রমাণ হবার আগে পর্যন্ত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। ন্যায়নীতির এই মূল কথা। কোনো ন্যায়নীতির ধার ধারবার মানুষ ডায়ার ছিলেন না। ন্যায়নীতিকে না মেনে কাজ করলে সে কাজ অন্যায় হয়। হাণ্টার কমিটির সামনে দাঁড়িয়ে ডায়ার তাঁদের জেরার উত্তরে অনেক অসংলগ্ন কথা বলেছেন,—কিন্তু একবারের জন্যেও অন্যায় স্বীকার করেননি। তাঁর কথায় একবারও প্রকাশ পায়নি যে অনুতাপের বিন্দুমাত্র বাষ্পও তাঁর মনে জমেছে।

হাণ্টার কমিটির তদন্ত অবশ্য অনেক পরের কথা। ডায়ারের হামাগুড়ি হুকুম ও তার ব্যবস্থার খবর শুনে ভারতের উর্ধ্বতম বৃটিশ শাসক পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত হয়েছিলেন। ভারতবাসী পরাধীন হতে পারে,—তবু তার ইতিহাস আছে, সংস্কৃতি আছে, মর্যাদাবোধ আছে। ডায়ারের হিংস্র হুকুম ভারতীয় প্রজার জাতীয় মর্যাদাকে অপমানের ধূলায় লুণ্ঠিত করার ক্রূর ব্যবস্থা,—কোনো সভ্য মানুষ এমনি ব্যবস্থায় সায় দিতে পারেনা। ভারতের বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড স্বয়ং একথা পাঞ্জাবের গভর্ণর ও-ডায়ারকে জানিয়েছিলেন। ও-ডায়ার উত্তরে সাফাই গেয়েছিলেন,—পাঞ্জাবে এখন মিলিটারি শাসন,—সেই

শাসনের অন্তর্ভুক্ত কোনো হুকুমকে রদ করবার অধিকার তাঁর নেই। অনুরোধ করতে পারেন মাত্র। সেই অনুরোধ তিনি করেছিলেন। তাতে সাতদিন পরে এই হুকুম রদ হয়েছিল।

সামরিক বেসামরিক সমস্ত প্রকার অত্যাচারকে সমর্থন করেছিলেন গভর্ণর ও-ডায়ার। তিনি পাঞ্জাবের বিশৃঙ্খলার জনক। তিনিই গান্ধীজীকে পাঞ্জাবে ঢুকতে দেননি। ডাক্তার কিচলু ও ডাক্তার সত্যপালকে মিথ্যা আমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে এনে বন্দী করার নির্দেশ তিনিই দিয়েছিলেন অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনারকে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য ডায়ারকে তিনিই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তিনিই পাঞ্জাবে সামরিক শাসনের সুপারিশ করেছিলেন এবং নিজে সরে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজের প্রদেশে সামরিক শাসনের বর্বর লীলা প্রসন্ন মনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হাণ্টার কমিটির মূল বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত হননি। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে পাঞ্জাবের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ এক সুপরিকল্পিত সহিংস বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হয়েছিল,—যে বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়েছিলেন গান্ধী নামে এক মহাচক্রী। সেই বিদ্রোহ থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ডায়ারই বাঁচিয়েছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ সেই বিদ্রোহ থেকে ভারতে বৃটিশ শাসনকে রক্ষা করেছিল।

কিন্তু এই কুখ্যাত হামাগুড়ি হুকুমকে ও-ডায়ারও সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর মতো জবরদস্ত শাসনকর্তার পক্ষেও এই হুকুমের নিষ্ঠুরতা অসহ্য মনে হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছিল। ভাইসরয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডও বলেছিলেন এই হুকুম অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায়।

॥ ১৩ ॥

জেনারেল রেজিন্যালড্ ডায়ার সেই প্রহরের বীর। বিপদে তিনি স্থির, কর্তব্যে তিনি অটল। ভারতে বৃটিশ শাসনের তিনি পরিত্রাতা। সামরিক শাসনের নায়ক হিসেবে তিনি অমৃতসরে দায়িত্বপালনের চূড়ান্ত উদাহরণ দেখিয়েছেন। দুষ্টের দমনে তিনি চুলমাত্র টলেননি, অথচ নিঃসহায় নারীর বেদনায় তাঁর হৃদয় আকুল হয়ে উঠেছে। হরতালের বন্ধ দোকান তিনি খুলেছেন,—শহরে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে এনেছেন,—বৃটিশ শক্তির প্রতি প্রজাকুলকে চূড়ান্ত নতিস্বীকারে বাধ্য করেছেন।

তিনি আদর্শ সৈনিক, আদর্শ শাসক। বিদ্রোহী পাঞ্জাবের প্রতিটি সামরিক অফিসার তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে তাঁকে অনুকরণ করতে ব্যাকুল। বিদ্রোহদমনে তিনি যে কুশলতা দেখিয়েছেন তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে ব্যস্ত।

১৫ই এপ্রিল থেকে পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল সামরিক শাসনের লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হোলো। লৌহযবনিকার আড়ালে বীভৎস তাণ্ডবলীলা শুরু হোলো। বেসামরিক সরকার হাত গুটিয়ে নিলেন, বাইরের কোনো লোকের সে সব অঞ্চলে প্রবেশের অধিকার রইল না। সামরিক চণ্ডনায়করা হিংস্র বর্বরতার বন্যা বইয়ে দিলেন।

এই বর্বরতায় অমৃতসরের নায়ক জেনারেল ডায়ারের সঙ্গে যাঁরা পাল্লা দিলেন তাঁদের মধ্যে ক্যাপ্টেন ডাভটনের নাম উল্লেখযোগ্য।

কসুরের হাঙ্গামাকে ঠাণ্ডা করবার ভার পড়েছিল ক্যাপটেন ডাভটনের উপর। তিনি এলোপাথাড়ি লোকদের কয়েদ করতে লাগলেন। এপ্রিলের প্রচণ্ড গরমে একটা উন্মুক্ত খাঁচা বানিয়ে তার মধ্যে বিনাবিচারে বন্দীদের রাখা হোলো। প্রকাশ্য স্থানে তাদের মাটিতে নাকখৎ দেওয়ানো হোলো। নির্মমভাবে বেত মারা হোলো।

একজন সাধুকে এমনিভাবে নাকখৎ দিতে বাধ্য করায় লোকেরা খুব মর্মাহত হোলো। তা দেখে ডাভটন খুব আনন্দ পেলেন। তিনি দেখলেন ভারতীয় সাধুরা গায়ে সামান্য বস্ত্র পরেন ও ছাই মাখেন। অন্য বন্দীদের তিনি অর্ধোলঙ্গ করে গায়ে ছাই মাখিয়ে নাকখৎ দেওয়াতে লাগলেন। বন্দীদের চাবুক মারার উৎসবকে তিনি আরো নাটকীয় করতে চাইলেন। শহর থেকে একদল বারবনিতাকে তিনি ধরে আনলেন। তাদের সামনে শহরের সম্ভ্রান্ত লোকদের বেত মারা হতে লাগল। তাদের রক্তাক্ত দেহ দেখে বারবনিতারাও শিউরে উঠে চোখে আঁচল চাপা দিল।

সন্দেহমাত্রে লোককে ধরে এনে প্রকাশ্য ভাবে চাবুক মারা সামরিক শাসনের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন শহরের জনবহুল জায়গায় জায়গায় এজন্যে প্রহারবেদীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সমস্ত জায়গায় বন্দীদের বেঁধে এনে চাবুক মারা হোতো। নির্মম সে শাসন থেকে বালক বৃদ্ধ কাউকে বাদ দেওয়া হোতো না। এবং সেই ঘৃণ্য শাসন দেখবার জন্যে অন্য লোকদের ধরে এনে জড়ো করা হোতো। কোন্ দলকে ক-ঘা চাবুক মারতে হবে তা স্থানীয় মিলিটারি অফিসারের মর্জি। শাসনের মাঝখানে আঘাতে যন্ত্রণায় অনেকে মূর্ছিত হয়ে পড়ত,—তাতেও তাদের মুক্তি ছিলনা। জ্ঞান ফিরে আসার পর বাকি শাসন সম্পূর্ণ করা হোতো।

চাবুকের মতো শাসন নেই—তাই ছিল মিলিটারি কর্তাদের মত। এক হাজার সৈন্য মোতায়েন করে যে কাজ না হয়, সেই কাজ হয় কয়েকটা চাবুক-পেটানোর প্রদর্শনী করে। সামরিক শাসনের সময়ে পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে এমনি দুশো সত্তরটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে লাহোরে আশিটি, কসুরে পঁচাশিটি, অমৃতসরে আটত্রিশটি, গুজরানওয়ালায় ছাব্বিশটি।

কসুরের একটি ঘটনা। রাজদ্রোহীদের দলে ছাত্ররা আছে,—অতএব ছাত্রদের শাসন করা দরকার। কিশোর-দলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে

সামরিক অফিসাররা এক স্কুলে গেলেন। হেডমাস্টারকে হেঁকে বললেন,—

আপনি ছটা ছেলেকে বেছে দিন। তাদের স্কুলের সামনে বেত মারা হবে।

হেডমাস্টার ছটি ছাত্রকে মিলিটারি কর্তাদের সামনে হাজির করতে বাধ্য হলেন। কর্তারা ক্রুর হেসে বললেন,—

এই আপনার পছন্দ? এরা যে সব রোগাপটকার দল! এমনি করে হবে না। স্কুলের সব ছাত্রদের আমাদের সামনে প্যারেড করান!

সবচেয়ে বড়োসড়ো চেহারায় ছটি ছাত্রকে বেছে নেওয়া হোলো,—তারপর তাদের পিঠে পড়ল বেতের পরে বেত।

এই ঘটনার নায়ক ছিলেন একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল,—কোনো ছোটখাটো অফিসার নন যাঁর দায়িত্বজ্ঞান কম।

এই কর্নেলকে হাণ্টার কমিটির সামনে ডাকা হয়েছিল।

কমিটি প্রশ্ন করলেন,—

ছটি ছাত্রকে বেত মারবার উদ্দেশ্য আপনার ছিল,—সেজন্যে ছটি সবচেয়ে বড়ো চেহারার ছেলেকে আপনি বেছে নিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, তা নিয়েছিলাম। ছেলেকটার দুর্ভাগ্য যে তারা চেহারায় সবচেয়ে বড়ো ছিল।

তারা দোষী কি নির্দোষ তার কোনো বিচার নেই? চেহারায় বড়ো বলেই তাদের শাস্তি পেতে হয়েছিল?

হ্যাঁ।

এটা কি বিচার হোলো?

আমার মনে হয় অবস্থা বিশেষে এটাই ন্যায়বিচার।

একটা ছেলে অন্য একটা ছেলের চেয়ে দেখতে বড়ো। এটা কি তার অপরাধ যার জন্যে তাকে শাস্তি পেতে হবে?

অপরাধ কি না বলব না, তবে হ্যাঁ,—এটা তার দুর্ভাগ্য।

কসুরের কাছাকাছি এক গ্রামের প্রধানকে বলা হোলো,—

এখানকার টেলিগ্রাফের তার কে কেটেছে?

প্রধান কোনো উত্তর দিতে পারল না। তাকে একটা গাছে বেঁধে গ্রামবাসীদের সামনে বেদম বেত্রাঘাত করা হোলো। পরে কর্তারা জানলেন টেলিগ্রাফের তার সে গ্রামে কাটাই হয়নি,—কাটা হয়েছে অন্য এক গ্রামে। কিন্তু তখন নির্বিচার শাস্তি দেওয়া হয়ে গেছে।

সামরিক শাসনকর্তারা রাজদ্রোহ দমনের নামে শুধু যে পৈশাচিক দৈহিক শাস্তি দিয়েছিলেন তাই নয়,— তাঁরা শাস্তিদানের নানা বিচিত্র উপায় উদ্ভাবনে তৎপর ছিলেন যা মানবতার বিরোধী,—মনুষ্যত্বের অবমাননা যার প্রধান লক্ষ্য। ভারতীয় নাগরিক মানুষ নয়, মানুষের মৌলিক সম্ভ্রমবোধ তার নেই,—সভ্য নাগরিকের স্বাভাবিক অধিকার থেকে সে বঞ্চিত,—এই কুটিল ধারণা নিয়ে শাস্তির মূলনীতি প্রণয়ণ করা হয়েছিল ও শাস্তির নামে বীভৎস অন্যায় তার উপর বর্ষিত হয়েছিল।

জেনারেল ডায়ার অমৃতসরের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। লাহোরের সামরিক কর্তা কর্নেল জনসন শহরের সম্ভ্রান্ত লোকদের গাড়ি কেড়ে নিয়েছিলেন,—তাদের উচিত শিক্ষা দেবেন এই উদ্দেশ্যে। শহরের ডাক্তারদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁরা কোন্ কোন্ লোকেব আঘাতের শুশ্রূষা করেছিলেন তাদের নামধাম জানাতে বাধ্য করা হয়েছিল। যারা পুলিস আর মিলিটারির হাতে আহত হয়েছে,—এইভাবে তাদের পরিচয় সংগ্রহ করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সামরিক আইনের নোটিস যে সব বড় বড় বাড়ির দেয়ালে আঁটা হয়েছিল, সেই সব বাড়ির মালিকদের হুকুম করা হয়েছিল তারা যেন নোটিসগুলি সদাসর্বদা পাহারা দেয়। যদি কোনো

নোটিস কেউ ছেঁড়ে বা নষ্ট করে তাহলে বাড়ির মালিকরা কঠিন সাজা পাবে। যে সব নাগরিকদের উত্যক্ত করবার অপমানিত করবার উদ্দেশ্য ছিল,—তাদের বাড়ির দেয়ালেই এই সব বিজ্ঞপ্তি আঁটা হয়েছিল।

এমনি অপমানকর শাস্তির বিধান কোন্ আইনে করা হয়েছিল হাণ্টার কমিটি কর্নেল জনসনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

কর্নেল জনসন বেপরোয়াভাবে বলেছিলেন,—

সামরিক আইনে।

চতুর হাসি হেসে আরো বলেছিলেন,—

এমনি সাজার ব্যবস্থা কেতাবে পাওয়া যায় না। আমাকে অনেক ভেবেচিন্তে আবিষ্কার করতে হয়েছিল।

লাহোরের এক কলেজের দেয়ালে লাগানো এমনি এক নোটিস ছেঁড়া অবস্থায় দেখা গেল। কর্নেলের হুকুমে সেই কলেজের পঁয়ষট্টি জন ছাত্র ও অধ্যাপকদের তিন মাইল হাঁটিয়ে এনে সারাদিন রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হোলো। এইভাবে ছাত্র-শিক্ষক সম্প্রদায়কে দেখানো হোলো মিলিটারী শাসন কাকে বলে।

আর একদল ছাত্রকে শাস্তিস্বরূপ মার্চ করানো হয়েছিল একটানা সতেরো মাইল। হাণ্টার কমিটির একজন সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে কর্নেল জনসন বলেছিলেন,—

এ আবার শাস্তি নাকি? ডাগড়া জোয়ান ছেলে,—মাইল ষোলো সতেরো হাঁটবে,—এতো স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম!

আর একজন মিলিটারী অফিসার বলেছিলেন,—

ছোকরাদের ভালোর জন্যেই তো চাবুক মারা! চাবুক খেলে দেহেরও ভালো মনেরও ভালো।

লায়ালপুরে কর্নেল ও-ব্রায়েন হুকুম দিয়েছিলেন কোনো ইয়ুরোপীয়ান অফিসারকে দেখলেই পথে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সেলাম করতে হবে। যদি কেউ ছাতা মাথায় দিয়ে যায় তাহলে ছাতা বন্ধ

করে সেলাম করতে হবে। যদি কেউ গাড়ি চেপে যায়, তাহলে গাড়ি থামিয়ে পথে নেমে সেলাম করতে হবে। যদি কেউ এ হুকুমের অমান্য করে তাহলে সে লোক যেই হোক না কেন, তাকে ধরে চাবুক মারা হবে, ফাইন করা হবে। গুজরানওয়ালাতে জেনারেল ক্যাম্পবেলও এমনি হুকুম চালিয়েছিলে

এমনি হুকুমের উদ্দেশ্য মিলিটারি শাসনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রজা-সাধারণকে সচেতন করা।

এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি,—প্রায় তিন মাস পাঞ্জাবে মিলিটারি শাসন বলবৎ ছিল। এই তিন মাস ধরে পাঞ্জাবে বিভীষিকার রাজত্ব চলেছিল। বিভীষিকার বেড়াজাল পাঞ্জাববাসীদের ঘিরে ছিল। বাইরের কোনো লোককে পাঞ্জাবে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সামরিক শাসনের নামে পাঞ্জাবে কী পাশবিক তাণ্ডব চলছে তা কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি। শত্রুরাজ্য জয় করার পর নৃশংস সেনাদল বিজিত রাজ্যে গিয়ে যেরূপ ব্যবহার করে তার থেকে নৃশংসতর ব্যবহার করা হয়েছিল নিজের রাজ্যের নিরীহ প্রজাদের উপর। তাদের উপর দৈহিক অত্যাচারের সীমা তো ছিলই না,—যে সুপরিকল্পিত মানসিক অত্যাচার করা হয়েছিল তা লৌহ যবনিকার অন্তরালের শাসনকে হার মানায়।

পাঞ্জাবের এই তিনমাসের সামরিক শাসনের কাহিনী হাণ্টার কমিটির অনুসন্ধানে কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু সবটা নয়। প্রধান কারণ হাণ্টার কমিটি সরকারী কমিটি। তাঁদের সামনে পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ আসতে পারেনি,—জানাতে পারেনি তাদের মর্মব্যথা।

তারা এসেছিল সমব্যথী দেশের মানুষের সামনে,—জাতীয় কংগ্রেসের অনুসন্ধানব্রতীদের সামনে। তাও সকলে নয়। অনেকেই আসেনি,—হয় ভয়ে না হয় লজ্জায়, হয় বেদনায় না হয় হতাশায়।

এই অনুসন্ধানব্রতীদের নেতৃত্ব করেছিলেন গান্ধীজী। কংগ্রেস অনুসন্ধান সাব-কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিল এক হাজার সাতশো লোক,—পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ,—শহর ও গ্রামের মানুষ,—পুরুষ ও নারী। হান্টার কমিটি তাঁদের রিপোর্টে লিখেছিলেন,—পাঞ্জাবে সামরিক শাসন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অস্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিহীন ও দায়িত্বহীন কাজের দ্বারা কলুষিত হয়েছিল। মিলিটারি শাসকদের মনে ছিল না যে তাঁরা কোনো শত্রু এলাকা শাসন করছেন না। তাঁরা দেশের এমন একটি অঞ্চলের সাময়িক ভার নিয়েছেন যেখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর অন্যায় ও তিক্ততার স্বল্পতম চিহ্ন রেখে তাঁদের ফিরে যেতে হবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ ও পাঞ্জাবের মিলিটারি শাসন প্রমাণ করেছিল যে ভারতে বৃটিশ শাসন অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসন সমস্ত দেশবাসীর মনে যে তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল তা থেকে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীনতার গণ-আন্দোলন।

এই অন্যায়ের অসংখ্য তিক্ত করুণ কাহিনী পাঞ্জাববাসীরা কংগ্রেস সাব-কমিটির কাছে এসে বলেছিল। তাদের কান্নাকে জাতীয় নেতারা বৃটিশ শাসকদের কানে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। শাসকরা কান পাতেনি। কিন্তু সারা ভারতের মানুষ শুনেছিল। সমবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল মন। ধীক্কারে উদ্যত হয়েছিল কণ্ঠ। প্রতিজ্ঞায় স্পন্দিত হয়েছিল হৃদয়।

এসেছিল সদ্যবিধবা রতনদেবী,—সেই সর্বনাশা ১৩ই এপ্রিল তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগের মধ্যে স্বামীর রক্তমাখা মৃতদেহ কোলে নিয়ে একলা রাত যে কাটিয়েছিল। এসেছিল প্রতাপ সিং, আবদুল আজিজ, করণচাঁদ, অর্জুন সিং, গিরিধারীলাল, ডাক্তার মণিরাম, লালা জ্ঞানচাঁদ, লালা রামগোপাল ও আরো অনেকে,—যারা সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল ও প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল। জেনারেল ডায়ারের হত্যালীলার সুস্পষ্ট বিবরণ তারা দিয়েছিল। হান্টার

কমিটির সংগৃহীত বিবরণ থেকে একচুল পার্থক্য ছিল না তাদের বর্ণনায়।

মিস্ শেরউডকে মারার অপরাধে অপরাধী না হয়েও কড়েঁওয়ালা গলির মধ্যে টেনে নিয়ে যে ছ-জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, সে শাস্তির বিবরণও স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা কংগ্রেস সাব-কমিটির কাছে দিয়েছিল। সেই অন্যায় ও নির্মম অত্যাচারের কথা ডায়ার শুধু স্বীকারই করেননি,—আস্ফালন করে বলেছিলেন হাণ্টার কমিটির সামনে।

সামরিক শাসনের বে-আইনি নৃশংসতার কাহিনী বিভিন্ন সাক্ষী কংগ্রেস সাব-কমিটির সামনে উদ্ঘাটিত করেছিল। লাহোরের মিউনিসিপাল মার্কেটে দোষী নির্দোষী লোককে ধরে এনে চাবুক মারা হোতো। প্রত্যক্ষদর্শী গণেশদাসের কথা,—

এ দৃশ্য চোখে দেখতেও বুক ফেটে যেত। খুঁটির সঙ্গে দুহাত বাঁধা, উলঙ্গ দেহ,—পিঠে চাবুকের পর চাবুক,—কাতর আর্তনাদ। সাহেবরা চারদিক ঘিরে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখছে আর চিৎকার করছে,—আরো জোরে, আরো জোরে লাগাও!

প্রত্যক্ষদর্শী পণ্ডিত কুশলচাঁদ আর মিয়া আল্লাবক্সের বর্ণনা,—

এমনি চাবুক মারার সময় ইংরেজ মহিলারাও দর্শকরূপে যোগ দিয়েছে আর আনন্দে হি-হি করে হেসেছে।

জেনারেল ডায়ার বলেছিলেন আহত মিস্ শেরউড যেখানে লুটিয়ে পড়েছিলেন,—সে স্থান পবিত্র ভূমি। তিনি চেয়েছিলেন সেখান দিয়ে যে কোনো ভারতবাসী যাবে সে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করবে,—হাঁটু গেড়ে বসবে। বিপন্ন নারীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন কড়েঁওয়ালা গলির হামাগুড়ি হুকুম।

একজন অন্ধ সেই কড়েঁওয়ালা গলি দিয়ে গিয়েছিল। সে যাতে ঠিক ভাবে হামাগুড়ি দিতে পারে তার জন্যে সৈন্যরা তাকে সাহায্য করেছিল,—কাঁধে বন্দুকের হাতল দিয়ে আঘাত করে আর পিঠে বুটের

লাথি মেরে। শুধু তাকে নয়,—ঐ পথে যারা গিয়েছিল তাদের অনেককেই।

শুধু পুরুষ নয়, মেয়েদেরও উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল। সে অত্যাচারের কথা না বললেও চলে। কিন্তু সামরিক শাসনের একটি বিশেষ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। নিরপেক্ষ নিরীহ প্রজাদের উপর আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ। এই শাসনের পন্থা নির্দেশ করেছিলেন গভর্ণর ও-ডায়ার স্বয়ং।

১৪ই এপ্রিল সকালবেলা গুজরানওয়ালা শহরে গণ্ডগোল হয়েছিল। সেদিন দুপুরবেলা শহর থেকে দুই মাইল দূরে ধূলা গ্রামের আকাশে একটি এরোপ্লেন উড়ে এল। এরোপ্লেন থেকে ক্যাপটেন কারবেরী দেখলেন গ্রামের প্রান্তে একটি জমায়েত। তিনি ভাবলেন এরা নিশ্চয়ই হামলাবাজের দল। তৎক্ষণাৎ তিনি এরোপ্লেন থেকে তিনটি বোমা ফেললেন। দুটি বোমা ফাটল। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি স্ত্রীলোক ও একটি বালক বোমার আঘাতে মরল, বাকি অনেক হতাহত হোলো। গ্রামবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল। এরোপ্লেন নিচে নেমে এল,—তারপর প্লেনের মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হোলো। পঞ্চাশ রাউণ্ড গুলি চালাবার পর কারবেরী সন্তুষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করলেন যে তাঁর লক্ষ্যস্থল ফাঁকা। তখন তিনি তাঁর প্লেন নিয়ে এগোলেন।

কিছু দূরে ঘরজাখ গ্রাম। কারবেরী লক্ষ্য করলেন সেখানেও একটি জমায়েত। সঙ্গে সঙ্গে বোমা পড়ল,—ও তারপর প্লেন নামিয়ে পলায়মান জনতার উপর কয়েক ঝাঁক মেশিনগানের গুলি চলল।

গুজরানওয়ালার কাছে পৌঁছে তিনি আকাশ থেকে দেখলেন একটা লাল বাড়ির ধারে ফাকা মাঠে একটা ভিড়। লাল বাড়িটি এটিক স্কুল। স্কুলের সামনে ছাত্র জমায়েত। তৎক্ষণাৎ বোমা বর্ষণ ও মেশিনগানের গুলি। অনেকে ছাত্র হতাহত হোলো। তারপর শহরের

এদিক ওদিক তিনি যথেচ্ছভাবে বোমা ফেললেন ও শ-দেড়েক রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করলেন। তারপর প্লেন লাহোরে ফিরে গেল।

এমনি এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণ ও এরোপ্লেনের মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ পরের দিনও চলল। শুধু গুজরানওয়ালা শহরের উপরেই আড়াইশো রাউণ্ডের বেশি মেশিনগানের গুলি বর্ষিত হয়েছিল এই দুই দিনে। এরোপ্লেনের পাইলট শহর ও গ্রামের নিরীহ নিরস্ত্র অধিবাসীদের উপর মাত্র শ-দুই ফুট উঁচু থেকে গুলি চালিয়েছিল। দোষী-নির্দোষী বিচার করেনি। পলায়মান জনতা গ্রামের মধ্যে আশ্রয়ের জন্য ছুটেছিল,—নির্বিচারে তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের হতাহত করা হয়েছিল। স্থানীয় বৃটিশ ডেপুটি কমিশনার স্বীকার করেছিলেন যে গুজরানওয়ালা অঞ্চলে ভিড় দেখলেই এরোপ্লেন থেকে গুলি চালানো হয়েছিল। কারবেরী হাণ্টার কমিটির সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—

হাঁা, প্রথম বোমা তারপর গুলি,—এই ছিল আমার আক্রমণের পন্থা। দেশ কয়েকশো রাউণ্ড গুলি আমি চালিয়েছিলাম। কে দোষী আর কে নির্দোষ,—তা আমি লক্ষ্য করিনি। গ্রামবাসীদের উপর যে গুলি চালিয়েছিলাম, তা তাদেরই ভালোরই জন্যে। তারা যেন একটা নৈতিক শিক্ষা পায়।

গুজরানওয়ালায় বিমানহানার সমর্থনে গভর্ণর ও-ডায়ার বলেছিলেন সেখানে বিদ্রোহ দমনের মতো স্থলসৈন্যের অভাব ছিল। সে অবস্থায় বিমানবাহিনীকে কাজে লাগানো খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছিল। এমনি বিমানহানা গণবিদ্রোহের উপযুক্ত দাওয়াই।

হাণ্টার কমিটি গভর্ণর ও-ডায়ারের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারেন নি। তাঁরা গুজরানওয়ালা শহরের ইয়ুরোপীয় অধিবাসীদের ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বিমানের ব্যবহারকে অন্যায় বলে মনে করেননি। কিন্তু গ্রামবাসীদের উপর এমনি বিধ্বংসী আক্রমণ কেন? এরোপ্লেন নিয়ে পলায়মান জনতার পিছনে ধাওয়া

করে মেশিনগান দিয়ে তাদের মারা কেন? কী তাদের অপরাধ? কাদের তারা মেরেছে,—রাজদ্রোহের কোন্ ইঙ্গিত তারা দিয়েছে? কমিটির সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ এমনি বৈমানিক অভিযানের নিন্দা করেছিলেন।

তিনমাসব্যাপী সামরিক শাসনের সময়ে পাঞ্জাবে আদালত বন্ধ ছিল,—আইন বলতে কিছু ছিল না। বিচারের ভার ছিল সামরিক ট্রিবিউন্যালের হাতে। বিচারবিধির অনেক পদ্ধতিকে সামরিক শাসনের সংকটাপন্ন অবস্থার প্রয়োজনে পরিহার করতে হয়। বিশেষ করে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিধিকে তখন সংকীর্ণ করতে হয়। আদালতকে অনেক দ্রুতগতিতে কাজ করতে হয়,—দ্রুত বিচার সমাধা করতে হয়। সামরিক শাসন স্বাভাবিক অবস্থার শাসন নয়। কিন্তু সিভিল কোর্টের বিচারই হোক আর মিলিটারি ট্রিবিউন্যালের বিচারই হোক,—বিচার বিচারই। বিচারকে ন্যায়বিচার হতে হবে,—বিচারককে বিধানকে ন্যায়নীতির ও মানবতার পবিপন্থী হলে চলবেনা।

সারা ইংরেজ শাসনের যুগে শেষ মিলিটারি শাসন হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহের সময়। বাষট্টি বছর পরে সেই শাসনের স্বরূপ নূতন করে প্রকাশ পেল ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে। সামরিক বিচারের পরিচয় নূতন করে পেল দেশবাসী। এ বিচারে বিচারের প্রহসন ছিল,—ন্যায়বিচারের চিহ্নটুক্ ছিল না। বিনা বিচারে শাস্তি আর বিচার অনুসারে শাস্তি,—এই দুইএর মাঝখানের প্রভেদ ছিল যৎসামান্য। সামরিক আদালতগুলি নামেই আদালত ছিল,—আসলে তারা ছিল নিষ্পেশনের যন্ত্র।

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে সামরিক আদালত পাঁচশো একাশিজন লোককে শাস্তি দিয়েছিল। প্রাণদণ্ড ঘোষণা হয়েছিল একশো আট জনের বিরুদ্ধে, দুশো পঁয়ষট্টি জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, পাঁচজনের দশ বছর ও পঁচাশি জনের সাত বছর কারাবাস। সাত

বছরের কম বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল একশো চারজন। লক্ষ্য করার কথা যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নানাবিধ শাস্তির তুলনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোককে ফাঁসিতে লটকাবার হুকুম দেওয়া হয়েছিল।

সুখের কথা মিলিটারি শাসন অবসান হবার পর বেসামরিক প্রাদেশিক আদালত ভয়ংকর বিচারের ভয়ংকর শাস্তিকে বহু ক্ষেত্রেই লঘু করেছিলেন। একশো আটজনের মধ্যে তেইশ জনের প্রাণদণ্ড হয়েছিল। দুশো পঁয়ষট্টি জনের মধ্যে মাত্র দুজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল। কারাবাসের মেয়াদও অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস হয়েছিল ও অনেক অভিযুক্ত কিছুদিন পরেই মুক্তি পেয়েছিল।

হান্টার কমিটি এও বলেছিলেন যে দীর্ঘ তিনমাস ধরে পাঞ্জাবে সামরিক শাসন বলবৎ রাখার প্রয়োজন ছিল না। এই চণ্ড শাসনের দ্রুততর অবসান মঙ্গলকরই হোলো।

॥ ১৪ ॥

পাঞ্জাবে সেই রক্তঝরা তিনটি মাসের আলোচনা প্রসঙ্গে স্মরণ করি এক সেবাপ্রাণ সর্বত্যাগী ইংরেজ সন্ন্যাসীকে। তাঁর নাম চার্লস ফ্রিয়ার অ্যানড্রুজ।

১৯০৪ সালের ২০শে মার্চ তারিখে অ্যানড্রুজ প্রথম ভারতে পদার্পণ করেন। এই দিনটিকে অ্যানড্রুজ সারা জীবন স্মরণে রেখেছিলেন। তিনি বলতেন,—ভারতভূমিতে আমি নবজন্ম লাভ করেছি,—এই দিনটি আমার দ্বিতীয় জন্মদিন।

খৃস্টান মিশনারী অধ্যাপকের বৃত্তি নিয়ে অ্যানড্রুজ ভারতে আসেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর সাম্রাজ্যবাদী মদমত্ততা ও বর্ণবিদ্বেষের কুৎসিত হিংস্রতার সঙ্গে পরিচিত হলেন। বৃটিশের তথাকথিত উদার প্রজাশাসন কেমন করে ভারতের অর্থনীতিকে দিনে দিনে শোষণ করে ভারতবাসীকে নিঃশক্ত নীরক্ত করে তুলছে,— সরকারী শাসন ও বিচারের প্রহসন কেমন ভাবে জাতি-অহমিকার অনাচারে ভারতবাসীকে নিষ্পিষ্ট করছে,—তার প্রত্যক্ষ চিত্র তিনি দেখলেন।

অ্যানড্রুজ বুঝলেন বিদেশী মিশনারী ধর্মপ্রচারকের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টি নিয়ে ভারত-সংস্কৃতিকে চেনা যাবেনা,—ভারতাত্মার সঙ্গে একাত্ম হওয়া যাবে না। অ্যানড্রুজ তাঁর পরিবেশের গণ্ডি থেকে বার হয়ে এলেন, ছুড়ে ফেললেন তাঁর ধর্মপ্রচারকের পোশাক। ভারতাত্মার বাণীমূর্তি রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি এলেন। গুরুদেব বলে পদধূলি গ্রহণ করলেন তাঁর।

কৃষ্ণকায় ভারতবাসীর মধ্যে অ্যানড্রুজ তাঁর অন্তরদেবতা যীশু-খৃস্টকে চিনলেন। চেনালেন মহাত্মা গান্ধী। তখন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা শ্বেতকায় রাজশক্তির রোষভয়কে জয় করতে শিখেছে,—

আত্ম-উদ্বোধনের দীক্ষা তারা গ্রহণ করেছে। গান্ধীজী তাদের দীক্ষা-গুরু। অ্যানড্রুজ দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন। শ্বেতকায় শক্তির মুখোমুখি গান্ধীজীর পাশে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণকায়দের মানবত্বের দাবী ঘোষণা করলেন।

সত্যাগ্রহের আদর্শকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন অ্যানাড্রুজ। সত্যাগ্রহের শক্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। রাওলাট আইন নিয়ে বিক্ষোভ যখন আরম্ভ হয়েছে তখন তিনি কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে। এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সমর্থন করে তিনি গান্ধীজীকে লিখলেন।

দীনবন্ধু অ্যানড্রুজ, ভারতবন্ধু অ্যানড্রুজ। ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯,—জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের দিন অ্যানড্রুজ শান্তিনিকেতনে। তার ছায়াঘেরা বসন্ত-পরিবেশে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পাশে। ডায়ারের এই কীর্তিকাহিনী দিল্লী-সিমলার উর্ধ্বতন সরকারী মহলে সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। অমৃতসর ছেড়ে পালানো সন্ত্রস্ত মানুষের মুখের খবর কিছু কিছু ছড়াতেও দেরি হয়নি। ভাসাভাসা বিবরণ পেয়েছিল ভারতের বিভিন্ন শহর।

শান্তিপূর্ণ শান্তিনিকেতনে জালিওয়ানওয়ালাবাগের খবর যখন পৌঁছলো তখন শোকের ও দুঃখের ছায়া নেমে এল সমস্ত আশ্রমে। ইংরেজ সেনাধ্যক্ষের নির্দেশে শত শত দুর্ভাগা দেশবাসীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। চঞ্চল হয়ে উঠলেন অ্যানড্রুজ। তিনিও ইংরেজ, কিন্তু ভারতবাসী তাঁর ভাই। ভারতবর্ষ তাঁর নবজন্মভূমি।

অ্যানড্রুজ স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি যাত্রা করলেন পাঞ্জাবে। গান্ধীজীকে ওরা পাঞ্জাবে ঢুকতে দেয়নি,—কিন্তু তাঁকে নিশ্চয় দেবে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের পরীক্ষা এবারের মতো বিফল হয়েছে, আর সেই বিফলতার সুযোগের অহিংস ভারতবাসীর বুকে ইংরেজের হিংস্র অস্ত্র গভীর ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। সেই

ক্ষতের যন্ত্রণা মোচন করবে কে? তিনি ইংরেজ, ইংরেজদের রক্ত তাঁর দেহে। একাজে তাঁকেই ছুটে যেতে হবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ বিভীষিকার মাত্র চারদিন পরেই অ্যানড্রুজ দিল্লী পৌঁছলেন। সেখান থেকে সোজা যাবেন পাঞ্জাবে,—লাহোরে আর অমৃতসরে। অত্যাচারিতের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন, নিপীড়িতের সেবা করবেন। পাঞ্জাবে তখন সামরিক শাসন আরম্ভ হয়ে গেছে। অমৃতসর স্টেশনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোলো। বন্দী অবস্থায় তাঁকে ফেরৎ পাঠানো হোলো দিল্লীতে।

দিল্লীতে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে ধরল। প্রধান বন্ধু তাঁর অধ্যাপক-জীবনের সহকর্মী মহাপ্রাণ সুশীলকুমার রুদ্র। সুশীলকুমার রুদ্রই অ্যানড্রুজের প্রথম ভারতীয় বন্ধু। তিনিই প্রথম অ্যানড্রুজকে ভারতবর্ষ চেনান, ভারতবাসীকে ভালোবাসতে শেখান। আর একবন্ধু স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে অ্যানড্রুজ গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর গুরুকুল আশ্রমের আদর্শেই রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের প্রতি তিনি উৎসুক হয়েছিলেন।

৩০শে মার্চের পর থেকে রাজধানী দিল্লীর অবস্থা দিনে দিনে শঙ্কটাপন্ন হয়ে আসছিল। সেদিনকার অবস্থাকে স্বামী শ্রদ্ধানন্দই শান্ত করেছিলেন। তারপর এপর্যন্ত দিল্লীতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এমন কি ১০ তারিখে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদেও না। কিন্তু দিল্লীর সরকারী বেসরকারী ইংরেজ সমাজ দিনে দিনে মারমুখী হয়ে উঠছিল। পাঞ্জাবের ঘটনায় তাদের প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি উদ্দাম হয়ে উঠছিল,—তাতে নির্লজ্জ ভাবে ইন্ধন জোগাচ্ছিল তাদের ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি। এদিকে পাঞ্জাবে তখন সামরিক শাসনের কৃষ্ণ-যবনিকা। সেই যবনিকার প্রান্ত ভেদ করে যেটুকু খবর আসছিল,—তা রক্তবর্ণ হিংস্রতার ক্বচিৎ-ছটা। মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে লোককে হিংসার পথে প্ররোচিত করবার মতো দুষ্কৃতিকারীরও অভাব ছিল

না। স্থানীয় নেতারা ভয় করছিলেন দিল্লীতেও সামরিক শাসন প্রবর্তিত হোলো বলে।

অ্যানড্রুজ কাজে ঝাঁপ দিলেন। একদিকে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, অন্যদিকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ উভয়ের মাঝখানে তিনি দাঁড়ালেন। প্রাণপণ চেষ্টায় দিল্লীতে সামরিক শাসনের সম্ভাবনাকে রোধ করলেন।

অমৃতসরে তাঁর প্রবেশ বন্ধ,—কিন্তু অমৃতসরের সামরিক শাসনের নানা খবর তাঁর কানে আসতে লাগল। নির্দোষী লোককে ধরে ধরে প্রকাশ্যস্থানে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হচ্ছে, হামাগুড়ি হুকুম আর সরকার সেলামে বাধ্য করে পাঞ্জাববাসীর আত্মসম্মানকে পথের ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জন্তুর চেয়েও হীন ব্যবহার করে মানবাত্মাকে অন্যায়ের কলঙ্ক পঙ্কে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কে করছে? যাঁরা তারই স্বদেশবাসী। কেন করছে? পদানত জাতিকে শাসনের অছিলায়।

কেন্দ্রীয় সরকার তখন শিমলায়। অ্যানড্রুজ সেখানে ছুটে গেলেন। তিনি নিজে ইংরেজ। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করার তাঁর সুবিধা,—তাদের মনে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করা তাঁর কর্তব্য।

অনেক চেষ্টা তিনি করলেন,—অনেক যুক্তি, অনেক তর্ক, অনেক অনুনয়। রাজপুরুষরা তাঁব কোনো কথা শুনলেন না। বললেন,—

বেত না মারলে চলবে কেন? তা নইলে সরকারের নৈতিক মর্যাদার প্রমাণ হবে কী করে?

ব্যর্থকাম বিফলমনোরথ অ্যানড্রুজ ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। মে মাসের শেষাশেষি। কবি শুনলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী। তিনি শান্তিনিকেতন থেকে এলেন কলকাতায়। অ্যানড্রুজ তাঁর সঙ্গী।

পাঞ্জাবের মিলিটারি শাসনের প্রায় দেড় মাস তখন অতিক্রান্ত হয়েছে। সারা পাঞ্জাবের সীমান্ত জুড়ে তখন কড়া পাহারা। অন্য

প্রদেশের কোনো লোককে,—এমন কি স্বদেশী পত্রিকার সাংবাদিকদেরও পাঞ্জাবে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। লাহোরের জাতীয়তাবাদী ইংরেজি দৈনিকের কণ্ঠ বন্ধ করে তার সম্পাদক কালীনাথ রায়কে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। পাঞ্জাব থেকে যদি কেউ বাইরে আসতে চায় রেলস্টেশনে খানাতল্লাসী করা হয়েছে। শুধু পাঞ্জাবের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খবরের কাগজে সরকারী অনুমোদিত খবর প্রকাশ হচ্ছে। সামরিক শাসনব্যবস্থার সমস্ত খবর গোপন করার জন্যে সরকার কঠোর ব্যবস্থা করেছেন। তবু সেনসর এড়ানো চিঠিপত্রে যেটুকু খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা ভয়াবহ। কতো লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার,—কতো লোকের ফাঁসি, কতো লোকের দ্বীপান্তর, কতো লোকের সুদীর্ঘ কারাবাস।

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক প্রিয় বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবি আলোচনা করলেন। তারপর গভীর রাত্রি জেগে তিনি একটি চিঠি লিখলেন। চিঠি লিখলেন ভারতের বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে। সেদিন ২৯শে মে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই পত্র জালিয়ানওয়ালাবাগ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দলিল। এই পত্রে তিনি তাঁর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে কবি লিখলেন,—

কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে। হতভাগ্য পাঞ্জাবীদের যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই দণ্ড প্রয়োগ-বিধির বিশেষত্ব, আমাদের মত কয়েকটি আধুনিক ও পূর্বতন দৃষ্টান্ত বাদে সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনাহীন। যে প্রজাদের প্রতি এই বিধান করা হইয়াছে, যখন চিন্তা করিয়া দেখা যায় তাহারা কিরূপ নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল, এবং যাঁহারা এইরূপ

বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের লোকহনন-ব্যবস্থা কিরূপ নিদারুণ নৈপুণ্য-শালী, তখন একথা আমাদিগকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে, যে এরূপ বিধান পোলিটিক্যাল প্রয়োজন বা ধর্মবিচারের দোহাই দিয়া নিজের সাফাই করিতে পারে না।

পাঞ্জাবী নেতারা যে অপমান ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, নিষেধরুদ্ধ কঠোর বাধা ভেদ করিয়াও তাহার বিষ ভারতবর্ষের দূরে দূরান্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তদুপলক্ষে সর্বত্র জনসাধারণের মনে যে বেদনাপূর্ণ ধিক্কার জাগ্রত হইল আমাদের কর্তৃপক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং সম্ভবত এই কল্পনা করিয়া তাঁহারা আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন যে, ইহাতে আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইল।

এখানকার ইংরেজচালিত অধিকাংশ সংবাদপত্র এই নির্মমতার প্রশংসা করিয়াছে এবং কোনো কোনো কাগজে পাশব নৈষ্ঠুর্যের সহিত আমাদের দুঃখভোগ লইয়া পরিহাস করা হইয়াছে। অথচ আমাদের যে সকল শাসনকর্তা পীড়িতপক্ষের সংবাদপত্রে ব্যথিতের আর্তধ্বনি বা শাসননীতির ঔচিত্য আলোচনা বলপূর্বক অবরুদ্ধ করিবার জন্য নিদারুণ তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই উক্ত ইংরেজচালিত সংবাদপত্রের কোনো চাঞ্চল্যকে কিছু মাত্র নিবারণ করেন নাই।

যখন জানিলাম যে, আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল, যখন দেখা গেল প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিতে আমাদের গভর্ণমেণ্টের রাজধর্মদৃষ্টি অন্ধ করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্ম-নিয়মের অনুযায়িক মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সহজ কার্য ছিল, তখন স্বদেশের কল্যাণ কামনায় আমি এইটুকু মাত্র করিবার সংকল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহু কোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণী দান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব।

অদ্যকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দিকবর্তী

জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্তত আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে-সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি।

রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার উদারচিত্ততার প্রতি আমার চিরদিন পরম শ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণবশত বড়ো দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইতেছি যে সেই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতি-দান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

সিংহল থেকে ডাক এসেছিল। সেখানে এক শ্রমিক-বিক্ষোভ অনুসন্ধান করতে অ্যানড্রুজ গিয়েছিলেন। ফিরলেন আগস্ট মাসের শেষে। পাঞ্জাবে সামরিক শাসন তখন শেষ হয়েছে,—সার মাইকেল ও-ডায়ারও আর গভর্নর নেই। অ্যানড্রুজের পাঞ্জাব প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। গান্ধীজীও তাকে ডেকেছেন।

ভারত সরকার ঘোষণা করেছেন পাঞ্জাবের হাঙ্গামার ব্যাপক তদন্ত হবে। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হবেন বৃটিশ বিচারপতি লর্ড হাণ্টার। এই তদন্তে সাধারণের বিভ্রান্ত ভয়ার্ত ভাষা কি কেউ শুনবে? পাঞ্জাববাসীর উপর যে অত্যাচার ও অপমান বর্ষিত হয়েছে তার নিষ্ঠুর করুণ কাহিনী কি প্রকাশ পাবে? আর্ত ত্রস্ত প্রজা কি পুলিস আর সি-আইডির ধমকে বিপর্যস্ত না হয়ে সরল ও সহজ ভাষায় তার মর্মবেদনাকে উদ্ঘাটিত করতে পারবে?

অ্যানড্রুজ স্থির করলেন তিনি যাবেন নিপীড়িত মানুষের দ্বারে

দ্বারে। তাদের ডেকে ডেকে বলবেন,—ভয় পেয়ো না, মুখ ফিরিয়ে থেকো না, আমার কাছে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে খুলে বলো তোমার বেদনার কথা, অপমানের কথা, শোকের কথা। তোমাদের সব কথা আমি পৌঁছে দেব তদন্ত কমিটির কানে।

লাহোর অমৃতসর উভয় শহরেই অ্যানড্রুজ পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গেল। ধনীদরিদ্র ছোটবড়ো কতো লোক যে তাঁর কাছে ছুটে এল তার ইয়ত্তা নেই। ভোর থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত লোকের আর বিরাম নেই। অ্যানড্রুজ দীনবন্ধু,—যারা দীন যারা দুর্গত, তারা তাঁর কাছে শরণ নিতে চায়,—তিনি তাদের দিতে চান সাহস শান্তি ও সান্ত্বনা।

নূতন গভর্ণর ও-ডায়ারের মতো নন। সরকারী উর্ধ্বতন কর্তারাও সহজে অ্যানড্রুজকে ফেরাতে পারেন না। লাহোরে গভর্ণমেণ্ট হাউসের দ্বার অ্যানণ্ড্রুজের কাছে অবারিত হোলো। দিনে রাত্রে যখন খুসি তিনি সেখানে যান,—তাঁর মুখের সামনে গেট বন্ধ করতে কেউ পারে না। আবার তার দ্বারও অবারিত সাধারণ মানুষের কাছে,—সে দ্বারে কোনো পাহারা নেই। সামরিক শাসনের অনেক অন্যায় বিচারকে তিনি বেসামরিক সরকারের সামনে একে একে তুলে ধরলেন। অনেক দণ্ডের কঠোরতাকে তিনি শিথিল করালেন।

অ্যানড্রুজের প্রধান উদ্দেশ্য হাণ্টার কমিটির সামনে সাধারণ প্রজার অন্তর্জ্বালাকে তুলে ধরবেন। এই জ্বালা প্রশমিত না হলে শান্তি নেই। তদন্তের যে প্রক্রিয়াই কমিশন নিন না কেন,—অবিচারকে উপলব্ধি করতে হবে। অন্যায়কে স্বীকার করতে হবে, নৈতিক আশ্বাসকে ফিরিয়ে আনতে হবে। যে কাজ তদন্ত কমিশন করতে পারবে না, সেই তদন্ত তিনি করবেন। তারপর তাঁর রিপোর্ট তিনি সরাসরি পাঠাবেন লর্ড হাণ্টারের হাতে।

শহরের কাজ শেষ করে অ্যানড্রুজ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন

পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে। রামনগর গ্রামের প্রজারা তখনো ভয়ে থর থর করে কাঁপছে,—মুখে তাদের কথা নেই। অভিযোগ ছিল গ্রামবাসীরা নাকি সম্রাটের একটা মূর্তি বানিয়ে সেটা দাহ করেছে,—ফলে সারা গ্রামের উপর দিয়ে শাসনের ঝড় বয়ে গিয়েছে। সাহেব দেখলে তারা শিউরে ওঠে,—সেই সাহেব অ্যানড্রুজও। অ্যানড্রুজ লোকের দ্বারে দ্বারে গেলেন। কিন্তু কেউ তাঁর কাছে মুখ খুলল না। কেউ তাঁকে বিশ্বাস করল না। সারা গ্রামবাসীর বিষতিক্ত মনের নীরব ঘৃণাকে সহ্য করে অ্যানড্রুজ সেই গ্রামে কাটালেন দিনের পর দিন।

একদিন প্রত্যূষে গুরুদ্বারে প্রার্থনা সভা। মেয়েপুরুষ জমায়েত হয়েছে, প্রার্থনাগান হচ্ছে, গ্রন্থসাহেব থেকে পাঠ করছেন পুরোহিত। অ্যানড্রুজ সেখানে গেলেন,—সকলের পিছনে গিয়ে বসলেন। অনুষ্ঠানের শেষে অ্যানড্রুজ সামনে এগিয়ে গেলেন। হাতজোড় করে দাঁড়ালেন সকলের সামনে। বৃদ্ধ পুরোহিতের চোখে জল,—তিনি অ্যানড্রুজকে সমাদরে পাশে বসালেন। সামরিক শাসনের সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী শিশুর মতো সত্য সারল্যের সঙ্গে তিনি তাঁকে বললেন।

সত্যমিথ্যা আপনি যাচাই হয়ে যেত অ্যানড্রুজের চরিত্রগুণে। একবার এক গ্রামে গভীর রাত্রে একজন লোক চুপি চুপি তাঁর কাছে এল। এক বাণ্ডিল কাগজ তাঁর হাতে দিয়ে সরে পড়ল। সেই গ্রামে সামরিক অত্যাচারের বিবরণী।

লাহোরে ফিরে তিনি যখন রিপোর্ট লিখছেন তখন এই বিবরণীটি তিনি পড়তে বসলেন। পড়তে পড়তে তাঁর মনে হতে লাগল,—এ যেন খাঁটি সত্য নয়,—এ যেন অতিরঞ্জিত বিবরণ।

একজন গ্রামবাসী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। সেই গ্রাম থেকে সে লাহোরে ছুটে এসেছে তাঁর কাছে। বললে,—

সাহেব, আমরা যা লিখেছিলাম তা সত্যি নয়। তোমার চোখে ধুলো দেব ভেবে অনেক কিছু বাড়িয়ে লিখেছিলাম। কিন্তু তুমি চলে আসার পর আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলা যায় না সাহেব!

সেই যেখানে বোমার অত্যাচারের তাণ্ডব হয়েছিল সেই গুজরানওয়ালা শহরে গেলেন অ্যানড্রুজ। কাটালেন দিনের পর দিন। একদিন শুনলেন অদূরের গ্রামের এক শিখ লম্বরদারের কাহিনী। গত মহাযুদ্ধে সে লড়াই করেছিল বৃটিশ প্রভুর হয়ে। সাহসী ও বিশ্বস্ত সৈনিকরূপে নির্ণিত হয়েছিল তার নাম। রেল লাইনের ধারে তার গ্রাম। সেখানে টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়েছিল। মিথ্যা সন্দেহে তাকে ধরা হয়েছিল। সর্বসমক্ষে তার নগ্ন দেহে বর্ষিত হয়েছিল চাবুকের পর চাবুক।

অ্যানড্রুজ খুঁজে খুঁজে তার কাছে গেলেন। বেদনায় অপমানে লোকটির প্রায় উন্মাদ অবস্থা।

সে অ্যানড্রুজকে দেখে চিৎকার করে উঠল,—

চলে যাও আমার কাছ থেকে। কোনো কথা নেই তোমার সঙ্গে। অনেক ইংরেজ আমি দেখেছি,—আর নয়।

সজলচক্ষে অ্যানড্রুজ তাকে বললেন,—

না আমি যাব না। ফিরে যাব বলে তোমার কাছে আমি আসিনি। তোমার কথা আমাকে বলতেই হবে।

অ্যানড্রুজের কথা শুনে লোকটা অবাক হয়ে গেল। এও ইংরেজ,—এরও গায়ের চামড়া শাদা। পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে ক্ষণকাল। তারপর তার গায়ের জামাটা খুলে বললে,—

ছাখো সাহেব ছাখো,—আমার কিছু বলবার নেই।

ক্ষতচিহ্ন এখনো মিলিয়ে যায়নি। সারা পিঠ জুড়ে নৃশংস

চাবুকের দাগ। এই চাবুক তারা মেরেছে যাদের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দিতে সে গিয়েছিল।

অ্যানড্রুজ বিস্ফারিত চোখে দেখলেন সেই কৃতঘ্ন নিষ্ঠুরতার নিদর্শন। তারপর সেই ধূলিধূসর পথের ধারে সর্বসমক্ষে লোকটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। দুহাতে তার পা জড়িয়ে ধরে বললেন,—

গুরু নানক তাঁর গ্রন্থসাহেবে বলেছেন,—ক্ষমা করো। তুমি আমাকে ক্ষমা করো,—আমার দেশের লোক তোমার উপর যা করেছে,—এ আমার পাপ!

না, না,—লাফিয়ে সরে যেতে চাইল লোকটি। তারপর তারও দুচোখ জলে ভেসে গেল। অ্যানড্রুজ উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

অনেকক্ষণ ধরে লোকটি কথা বলতে পারল না। তারপর চোখের জল মুছে বললে,—

সাহেব,—গত ছমাস ধরে বুকের মধ্যে জ্বালা পুষে রেখেছিলাম। সেই জ্বালা আজ তুমি নিবিয়ে দিলে! আর আমার কোনো দুঃখ নেই!

গান্ধীজী এলেন, মালব্যজী এলেন, মতিলালজী এলেন। পাঞ্জাবের নিপীড়িত মানুষদের কাছে তাঁরা নিয়ে এলেন সান্ত্বনার স্পর্শ। কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটি শহরে গ্রামে পরিভ্রমণ শুরু করলেন। অ্যানড্রুজের কাজ ফুরিয়ে এল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আবার তাঁর জরুরী আহ্বান এসেছে।

লাহোরে এক বিশাল সভায় তিনি পাঞ্জাববাসীদের তাঁর বিদায় বাণী দিলেন। শোনালেন যীশুর পরমপ্রেমের কথা,—শান্তির কথা, ক্ষমার কথা।

বললেন,—আমি খৃস্টান, আমার যিনি প্রভু—তাঁর নাম নিয়ে আমি আপনাদের বলছি,—আপনারা ক্ষমাসহিষ্ণু মন নিয়ে মাথা

উঁচু করে দাঁড়ান। প্রতিহিংসার তাড়নাকে মন থেকে বিসর্জন দিন। অপমানের গ্লানি থেকে মুক্ত হোন। সত্য ও অহিংসাকে জীবনের ব্রত করুন।

মাত্র কদিন আগে এক খৃস্টান গির্জাতে ওরা অ্যানড্রুজকে ঢুকতে দেয়নি। বলেছিল,—ভগবানের মন্দির, এখানে বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহীর স্থান নেই।

বলেছিল যারা তাঁর জাতভাই। যে জাতির হয়ে তিনি অপমানিত উৎপীড়িত মানবতার কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করেছেন।

॥ ১৫ ॥

সেই প্রহরের বীর জেনারেল ডায়ার। জালিয়ানওয়ালাবাগের মহাবীর। সারা ভারতব্যাপী বিপ্লবসম্ভাবনাকে তিনি সমূলে ধ্বংস করেছেন,—অপ্রতিহত রেখেছেন ভারতে বৃটিশ শাসন। আভ্যন্তরীণ বিপ্লবকে দমন করার পর তিনি জয়যাত্রা করলেন বহিঃশত্রুকে দমন করার উদ্দেশ্যে।

ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন আফগানিস্তানের আমীর আমান্-উল্লা। তৃতীয় আফগান যুদ্ধ। এর পূর্বে আফগানিস্তান কখনো বৃটিশ ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেনি। এই প্রথম।

সেই আক্রমণকে প্রতিহত করার কাজে ডাক পড়ল ডায়ারের। তিনি তাঁর ব্রিগেড নিয়ে গেলেন পেশোয়ার। তারপর শত্রু এলাকার মধ্যে অভিযান পরিচালনা করলেন। থাল নামক শত্রুবেষ্টিত এক শহর তিনি মুক্ত করলেন। কিন্তু জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে পেশোয়ারে নিয়ে আসা হোলো। ভারতের প্রধান সেনাপতি তাঁর বীরত্বের প্রভূত প্রশংসা করলেন।

সার মাইকেল ও-ডায়ার বললেন,—

পাঞ্জাবের ব্যাপক বিদ্রোহ আফগানদের এই আক্রমণে প্রণোদিত করেছে। আভ্যন্তরীণ শত্রুদের সঙ্গে বহিঃশত্রুর গভীর ষড়যন্ত্রমূলক যোগাযোগ ছিল। পাঞ্জাবে যখনি বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে তখনই আফগানিস্তানও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করবে এই ছিল পরিকল্পনা।

অতএব ডায়ারের জয়জয়কার।

তবু ডায়ারের মন একেবারে দুশ্চিন্তামুক্ত হয় নি। আফগান

যুদ্ধে যোগ দেবার আগে পেশোয়ারে পৌঁছে তিনি সেখানকার সেনানায়ককে বলেছিলেন,—

যদিও সবাই আমাকে সমর্থন করেছেন, তবু অমৃতসরের ব্যাপার নিয়ে এখনো আমার ভাবনা হচ্ছে।

সেনানায়ক উত্তরে বললেন,—

পাগল হয়েছ তুমি? ও সব দুর্ভাবনা ছাড়ো। ভাববার মতো কিছু থাকত তো আগেই খবর পেতে!

সত্যই তো, ভাবনার কোনো কারণই তো নেই। গত ২২শে মে ভারত-সচিব মনটেগু ইংলণ্ডের কমনস্ সভায় পাঞ্জাবের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনিও রাজদ্রোহ ও বিপ্লবের কথা বলেছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা তিনি উল্লেখও করেন নি। বরং অবস্থা আয়ত্তে আনবার কাজে যে সব অফিসাররা গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন অপ্রিয় কর্তব্যের মুখোমুখি হয়েছেন সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের তারিফ করেছেন।

অসুস্থ ও কর্তব্যক্লান্ত ডায়ার ছুটি নিলেন। গেলেন ডালহৌসিতে। সেখানে তিনি বিশ্রাম করবেন। প্রধান সেনানায়কের নির্দেশ মতো অমৃতসরের ঘটনা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টও এবার তিনি তৈরি করবেন।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে সামরিক শাসন শেষ হয়েছে।। জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের খবর সারা দেশে ছড়িয়েছে,—পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানে মিলিটারি শাসনের বর্বরতার কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সমস্ত ভারতবাসী স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বৃটিশ শাসনের প্রতি প্রজার এতো ঘৃণা বোধহয় পূবে কখনো পুঞ্জীভূত হয়নি। ভারত-সচিব গভীর চিন্তিত,—এই ঘৃণার পাহাড় অতিক্রম করে তিনি তাঁর প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারকে ভারতে প্রবর্তন করবেন কী করে?

২৫শে আগস্ট ডায়ার তাঁর রিপোর্ট সিমলার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠালেন। সুদীর্ঘ রিপোর্টে তিনি ১৩ই এপ্রিলের পূর্বেকার

অমৃতসরের সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করলেন। ১১ই এপ্রিল অমৃতসরে পৌঁছে কী অবস্থার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন তাও বললেন। বেসামরিক কর্তৃপক্ষ অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়ে তাঁর হাতে শহরের ভার তুলে দিয়েছিলেন। সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে তিনি একলা অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন,—একথা তিনি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে লিখলেন।

কী সে অবস্থা? সারা শহর তখন বিদ্রোহীদের করায়ত্ত। তারা ইংরেজ খুন করেছে। সম্পত্তি লুট করেছে। বাড়ি পুড়িয়েছে। টেলিগ্রাফের তার কেটেছে, রেলের যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। গ্রামের লোক সবাই দলে দলে শহরে আসছে,—বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিরাট এক ডাণ্ডাফৌজ বানাচ্ছে। হিন্দুমুসলমান এক হোক বলে চিৎকার করছে।

তখনই তিনি বুঝেছিলেন,—গুলি করতেই হবে। প্রতি-আক্রমণ করে এই বিদ্রোহকে দমন করতে হবে। ১৩ই তারিখে ডায়ার ঘোষণা করলেন,—সভা কোরো না। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীরা ঘোষণা করল,—আলবৎ সভা হবে। বৃটিশরাজ শেষ হয়েছে, গুলি বন্দুককে আর আমরা ভয় পাইনে। জালিয়ানওয়ালাবাগের সভা প্রকাশ্য বিদ্রোহের অভিব্যক্তি,—সে বিদ্রোহকে দমন করাই ছিল তাঁর কর্তব্য।

ডায়ার বললেন,—

কী গুরু দায়িত্ব, কী বিস্বাদ কর্তব্য আমি পালন করেছিলাম তা শুধু আমিই জানি। আমার কর্তব্যবোধ, আমার বিবেক আমার মিলিটারি চেতনা আমাকে এই কাজে প্রণোদিত করেছিল। যদি অল্পস্বল্প গুলি চালাতাম, তাহলে তা অন্যায় হোতো, চরম মূর্খতা হোতো।

গুলি চালিয়ে ভিড় হটানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক শিক্ষা দেবার। শুধু ঐ সভার লোকদের নয়,—

সারা পাঞ্জাবের অধিবাসীদের। যদি আমার হাতে সৈন্য বেশি থাকত, তাহলে লোক আরো বেশি হতাহত হোতো। সে অবস্থায় যতোটুকু কঠোর হওয়া প্রয়োজন তার বেশি আমি হইনি।

তিনি আরো লিখলেন,—

আমাকে সামরিক দিক থেকে অবস্থার বিচার করতে হয়েছিল। যদি জনতা এগিয়ে এসে আমার সৈন্যদের ঘিরে ধরত, তাহলে আমাদের রক্ষা ছিল না। জনতাকে সেই সুযোগ আমি দিইনি। ঠাণ্ডা মাথায় আমি গুলি চালিয়েছিলাম। যেখানে মানুষের চাপ বেশি, ঠিক সেই সেই জায়গায় বেশি করে গুলি করবার নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম। জনতা যখন একেবারে বিধ্বস্ত, ততোক্ষণে আমার সৈন্যদের বুলেটের রসদও ফুরিয়ে এল। হতাহত কতো হয়েছে তা না দেখে আমি আমার সৈন্য নিয়ে রামবাগে ফিরে এলাম। হতাহতের ব্যবস্থার দায়িত্ব আমার ছিল না।

ডায়ার লিখলেন,—

তাঁর এই দৃঢ় কর্তব্যের প্রশংসা শুধু পাঞ্জাব সরকার করেননি, অমৃতসর শহরের বহু গণ্যমান্য প্রজা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বলেছেন,—শুধু অমৃতসরকে নয়, সারা পাঞ্জাবকেই তিনি রক্ষা করেছেন।

তাঁর এবং পাঞ্জাব সরকারেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে ১৩ই এপ্রিলের নিরুপায় কর্তব্য পালিত না হলে অবস্থা কোথায় ও কীভাবে যে শেষ হোতো, কতো অঘটন যে ঘটত, কতো রক্তপাত যে হোতো তা বলার নয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতব্যাপী বিপ্লবের বন্যাকে প্রতিহত করেছিল।

সার মাইকেল ও-ডায়ারের কথার প্রতিধ্বনি করে ডায়ার আরো লিখলেন,—

পাঞ্জাবের এপ্রিলের বিদ্রোহকে যে দৃঢ়তা ও দ্রুততার সঙ্গে দমন করা হয়েছিল, তা যদি না হোতো তাহলে টেলিগ্রাম আর রেল লাইন

আরো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোতো। আফগানদের বিরুদ্ধে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে আমাদের প্রতিরোধ দুর্বলতর হোতো। আফগান আক্রমণ ঠেকানো হয়তো অসম্ভব হয়ে পড়ত। ভারত-সরকারের উপর অকল্পনীয় দুর্যোগ ঘনিয়ে আসত।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে ডায়ার তাঁর রিপোর্টে যুক্তিজাল বিস্তারে কোনো কার্পণ্য করেননি। এরোপ্লেন, ভারী বোমা আর উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যে অভিযানকে দমন করতে বৃটিশ সামরিক শক্তির কয়েক সপ্তাহের বেশি লাগেনি, সেই আফগান অভিযানকেও তাঁর যুক্তির মধ্যে তিনি টেনে এনেছিলেন।

কেবল একটি কথা তিনি বলেননি।

তিনি বলেননি যে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র মানুষের সভায় এমন কিছু আসন্ন বিপদের আভাস তিনি দেখেছিলেন কি না যাতে করে তাঁকে একবারও সাবধান না করে সরাসরি তাদের উপর গুলি চালাতে হয়েছিল। গুলি চালাতে হয়েছিল দশ মিনিট ধরে। গুলির রসদ ফুরিয়ে না আসা পর্যন্ত।

গুলি করতে ডায়ার বাধ্য হননি। তিনি স্বেচ্ছায় গুলি করেছিলেন তিনি অবাধ্য প্রজাদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন,—সেই শাস্তি নির্বিচার ও ব্যাপক নরহত্যা।

সেই প্রহরের বীর জেনারেল ডায়ারেব মনে শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রসাদ ছিল যে তিনি পাঞ্জাবকে এবং সেই সঙ্গে সমগ্র বৃটিশ ভারতকে দ্বিতীয় মহাবিদ্রোহ থেকে রক্ষা করেছিলেন। এ আত্মপ্রসাদের মূলে কোনো সত্য ছিল না,—এ আত্মছলনার অভিব্যক্তি।

জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে যারা গুলি চালিয়েছিল তারা প্রত্যেকটাই ভারতীয় সৈন্য,—গোরা সৈন্য নয়। নব্বইটি সৈন্য দশ মিনিটের মধ্যে গুলি চালিয়ে দুহাজার লোককে হতাহত করেছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের সভায় যারা মহাবিদ্রোহের নিশান দেখে-ছিলেন—ডায়ার আর ও-ডায়ার—তারা উভয়েই জানতেন যে আধুনিক

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে একদল সুসংবদ্ধ হত্যাকারীর কাছে ভারতের লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র প্রজা কিছুই না।

বন্দুকহাতে একজন সাধারণ সৈনিকও একথা জানে। জানতেন পাঞ্জাবের সেনানায়ক, ভারতের সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তাঁরা অকুণ্ঠভাবে ডায়ারকে সমর্থন করেছিলেন। ডায়ারের পদোন্নতি হতে দেরি হয়নি। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার একটি পুরো ডিভিসনের কর্তা হয়েছিলেন অচিরে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের দু-সপ্তাহের মধ্যেই বৃটেনের কমনস্ সভায় ভারত-সচিব মনটেগু পাঞ্জাব সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়েছিলেন। তখনই তিনি স্বীকার করেছিলেন,—এ ব্যাপারে একটা তদন্তের প্রয়োজন।

তখন পাঞ্জাবে সামরিক শাসন চলছে। শাসকদের মতে,—বিদ্রোহের আগুন তখনো ধিকিধিকি জ্বলছে। সামরিক শাসন সযত্নে ও সন্তর্পণে এই আগুন নেবাবার কাজে ব্যস্ত।

মনটেগু ঘোষণা করলেন,—তদন্ত অবশ্যই হবে,—তবে আগে আগুন নিবুক তারপর।

তিনি বললেন,—বৃটিশ পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে যে বাণী এখন আমরা ভারতে পাঠাচ্ছি তা হোলো পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজে যাঁদের উপর গুরু দায়িত্ব পড়েছে তাঁদের প্রতি আমাদের আস্থার ও সহানুভূতির বাণী। এরপর আমরা তদন্ত করব। সেই তদন্তের ফলে দ্বিবিধ লাভ আমাদের হবে। যে সব কারণে পাঞ্জাবে এই দুঃখকর পরিস্থিতি ঘটেছে সেই সব কারণগুলি অপসারণ করতে এই তদন্ত আমাদের সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত এই সব হাঙ্গামার ব্যাপারে যে সব বৃটিশ সৈন্য ও অফিসারদের অপ্রিয় কর্তব্য করতে হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে যে কুৎসা-সংবাদ ভরা অভিযোগ করা হয়েছে, সেই সব অভিযোগও চিরকালের মতো আমরা খণ্ডন করতে পারব।

সেই তদন্তের ব্যবস্থা হোলো প্রায় সাত মাস পরে। এমনি ঘটনা যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোনো শাদা চামড়ার অধিবাসীদের দেশে ঘটত, তাহলে অবিলম্বে সরকারী বা বিচার-বিভাগীয় অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হোতো। কিন্তু পাঞ্জাবে সামরিক শাসন শেষ হবারও চারমাসের আগে বৃটিশ গভমেণ্টের ঘুম ভাঙল না। এই তাণ্ডবলীলার ধাক্কারে সারা ভারতের জনমত যদি উত্তাল না হয়ে উঠত, তাহলে ঘুম হয়তো একেবারেও ভাঙত না।

অক্টোবর মাসে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলেন পাঞ্জাব বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে তদন্তকারী কমিটির নিয়োগ। এই কমিটির সভাপতি হলেন স্কটিশ হাইকোর্টের বিচারপতি লর্ড হাণ্টার। এই কমিটি হাণ্টার কমিটি নামে বিশ্রুত।

লর্ড হাণ্টার ছাড়া এই কমিটিতে আরো সাতজন সদস্য নিয়োজিত হলেন। সবশুদ্ধ আটজন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন ইংরেজ ও তিনজন ভারতীয়। সভাপতি লর্ড হাণ্টার ছাড়া বাকি সাতজন সদস্য হলেন,—

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিস্টার জি সি র‍্যাংকিন,

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারি মিস্টার ডবলু এফ রাইস,

পেশোয়ার ডিভিসনের সামরিক অধিকর্তা মেজর জেনারেল সার জর্জ ব্যারো,

যুক্তপ্রদেশের গভর্ণরের আইন পরিষদের সদস্য মিস্টার টমাস স্মিথ,

যুক্তপ্রদেশের গভর্ণরের আইন পরিষদের সদস্য পণ্ডিত জগৎনারায়ণ,

বোম্বাই হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট সার চিমনলাল শীতলবাদ,

ব্যারিস্টার সর্দার সহিবজাদা সুলতান আমেদ খান।

খুব সাবধানতার সঙ্গে এই কমিটির সভ্য নির্বাচন করা হয়েছিল। সরকারী অনুসন্ধান,—অতএব সরকারী কর্তৃপক্ষ ও তাঁদের খুব নিকটস্থ ব্যক্তিদের নিয়েই কমিটি গঠিত হয়েছিল। কোনো জনপ্রতিনিধির স্থান ছিল না এ কমিটিতে।

হান্টার কমিটির অধিবেশন বসেছিল আটদিন দিল্লীতে, ঊনত্রিশ দিন লাহোরে ও তিনদিন বোম্বাইতে। জেনারেল ডায়ার কমিটির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন লাহোরে,—১৯শে নভেম্বর তারিখে। জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার পর সাত মাস তখন কেটে গেছে। এই সাতমাসের মধ্যে ডায়ার একবারও তার কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা অনুভব করেন নি।

লাহোরে হান্টার কমিটির সামনে সাক্ষ্য শেষ করে জেনারেল ডায়ার ফিরে যাচ্ছেন। সঙ্গে আরো কয়েকজন সামরিক সতীর্থ। লাহোর থেকে দিল্লীগামী ট্রেনে তাঁরা চলেছেন। তাঁদের কামরার কেবল উপরের একটি ছাড়া সব কটি বার্থ ই ভর্তি। বৃটিশ অফিসারদের দখলে।

গভীর রাত্রে অমৃতসর স্টেশনে গাড়ি থামল। ট্রেনের সেই কামরায় উঠলেন একজন ভারতীয় যুবক। এলাহাবাদে তাঁর বাড়ি। এলাহাবাদ থেকে অমৃতসরে তিনি এসেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখতে। মিলিটারি শাসনের অত্যাচারে পাঞ্জাবের জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শুনতে। পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে তাদের বেদনার বেদী থেকে দেশাত্মবোধের মন্ত্রলাভ করতে। তাঁকে ডেকে ছিলেন গান্ধীজী।

আধো-অন্ধকার কামরার অন্য যাত্রীরা নিদ্রামগ্ন। আগন্তুক তাঁর বার্থের উপর উঠে শুয়ে পড়লেন। সারাদিনের অনেক পরিশ্রমের পর চোখে ঘুম আসতে দেরি হোলো না।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভেঙে তাঁর চোখে পড়ল সেই কামরায় তিনিই একমাত্র ভারতীয়,—বাকি আর সকলেই বৃটিশ মিলিটারি অফিসার। তিনি চুপ করে তাদের দেখতে লাগলেন। তারা যথারীতি হৈ চৈ করতে লাগল,—গলা চড়িয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল। উপরের বার্থে একলা একটা ভারতীয় প্রজা

বসে আছে,—মুখ বুজে বসে থাক। যা শুনছে শুনুক,—তাতে কী এসে যায়!

পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। একজন অফিসার রুক্ষকঠিন বিদ্রূপভরা গলায় তাঁর অমৃতসরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন। আর সেই বর্ণনার মাঝে মাঝে তাকে সহর্ষে তারিফ করছিল তাঁর বন্ধু অফিসাররা।

তিনি বলছিলেন,—কেমন করে জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালিয়ে একদিনে সারা শহরটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে তিনি এনেছিলেন।

তিনি বলছিলেন,—জালিয়ানওয়ালাবাগ তো কিছুই না, আমার ইচ্ছে ছিল সারা শহরটাকে গুঁড়িয়ে পুড়িয়ে ছাইগাদা বানিয়ে ছাড়ব,—তবে নিতান্ত দয়া হোলো বলেই অতোটা করিনি।

ভারতীয় নীরব শ্রোতাটি এইসব কথা শুনে শিউরে উঠেছিল। আগে কখনো না দেখলেও বক্তাকে চিনতে তার ভুল হয়নি। এই সেই জেনারেল ডায়ার!

এমন হৃদয়হীন, এমন নিষ্ঠুর মানুষে হতে পারে? হত্যার গর্বে মানুষ এমনি অমানুষ হতে পারে? হত্যাকারী যদি মানুষ হয়, হত্যার দম্ভ যদি এতো উল্লসিত হয়,—তাহলে যাদের সে হত্যা করেছে তারা কি মানুষ নয়? স্বৈরাচারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চোখে ভারতের পরাধীন প্রজা কি মানুষ নয়?

লাহোর-দিল্লী ট্রেনের রেল-কামরার সেই একলা ভারতীয় যাত্রীটির নাম জহরলাল নেহরু।

॥ ১৬ ॥

১৯শে নভেম্বর লাহোরে হাণ্টার কমিটির সামনে দাঁড়ালেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিন্যাল্ড ডায়ার। সাত মাস আগেকার অমৃতসরের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য তিনি বলবেন। কমিটির সদস্যদের প্রশ্নের তিনি উত্তর দেবেন। তিনিই সেই ঘটনার নায়ক,—হাণ্টার কমিটির সামনে তিনিই সবচেয়ে মূল্যবান সাক্ষী।

এই সাত মাস ধরে চিন্তা করার অনেক সময় পেয়েছিলেন রেজিন্যাল্ড ডায়ার। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সেই দৃশ্য অনেকবার তাঁর স্মৃতিপটে উদিত হয়েছিল। সেই স্মৃতিকে তিনি আজ অকপটে উদ্ঘাটন করবেন কমিটির সামনে।

বন্ধুরা তাকে ঘিরে ধরল।

গুলি করা এক কথা, আর গুলির যাথার্থ্য প্রমাণ করা আর এক কথা। কী বলবে আর কী না বলবে,—ভেবেচিন্তে রেখেছ কী?

ডায়ার মৃদু হাসলেন। ভেবেছি বৈকি,—অনেক ভেবেছি। আর ভাবনার কিছু নেই।

বন্ধুরা বললে,—বরং এক কাজ করো। তোমার জবানবন্দী তৈরির জন্যে ভালো আইনজ্ঞের পরামর্শ নাও।

ডায়ার ধিক্কারের সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। আমার যা বলবার তা আমিই বলতে পারব,—উকিল আমাকে কী সাহায্য করবে? উকিল কি আমার হয়ে গুলি চালিয়েছে?

বন্ধুরা তাঁর চরিত্র জানত। উপদেশ দিল, তিনি যেন বাগাড়ম্বর না করেন,—ঠাণ্ডা মাথায় স্বল্প কথায় প্রশ্নের জবাব দেন।

ডায়ার বললেন,—

ঠিক আছে। আমি ঘাবড়াবার পাত্র নই। শুধু স্বল্প কথায় নয়,—স্পষ্ট কথায় আমি উত্তর দেব।

আর এক বন্ধু শেষবারের মতো বললেন,—

মনে রেখো কমিটিতে ভারতীয় সদস্যও আছে। তিনজন,—আর তিনজনই বিশিষ্ট আইনজ্ঞ। তারাও তোমাকে জেরা করবে। খুব সাবধান!

ডায়ার বেপরোয়া হাসি হেসে এগোলেন। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন কমিটির সামনে।

কমিটির সভাপতি লর্ড হান্টারের সামনে স্পষ্টভাবেই ডায়ার তাঁর বক্তব্য রাখলেন। বললেন,—

সমবেত হতে বারণ করা সত্ত্বেও যে জনতা সেই বারণ না মানে, সেই জনতার উপর গুলি চালানো সামরিক আইনে ন্যায়সংগত। তাঁর নির্দেশ জেনে শুনেও জালিয়ানওয়ালাবাগের সভায় যারা জমায়েত হয়েছিল, তাদের প্রাপ্য শাস্তিই তারা পেয়েছিল।

লর্ড হান্টার সরলভাবে প্রশ্ন করলেন,—

কিন্তু আপনার সেই নির্দেশ কি সারা অমৃতসরের লোকই শুনতে পেয়েছিল?

এ প্রশ্নেরও সরল উত্তরই দিলেন ডায়ার। তিনি স্বীকার করলেন যে শহরের সব মহল্লাতে তাঁর নির্দেশ ঘোষণা করা হয়নি। তবে কেউ কেউ যদি তাঁর নির্দেশ নিজের কানে না শুনে থাকে তাতে কী এসে যায়? তাঁর নির্দেশ শুনেও যে শহরবাসীরা তা অমান্য করেছিল,—জালিয়ানওয়ালাবাগের সভার বিপুল জনতাই তো তার প্রমাণ। সামরিক নির্দেশ না মানলে গুলি খেতেই হবে,—গুলি চালিয়ে সেই বে-আইনি সভা ভেঙে দেওয়াই ছিল তাঁর কর্তব্য।

ঠিক কী উদ্দেশ্যে আপনি গুলি চালিয়েছিলেন?

সভা ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে,—তাই সভার জনতা যতোক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়েছিল, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি গুলি চালিয়েছিলাম।

আপনি গুলি চালাবার সঙ্গে সঙ্গেই তো জনতা হটতে শুরু করেছিল,—তাই না ?

ঠিক তাই,—কিন্তু তা দেখে গুলি চালানো আমি বন্ধ করিনি।

এই প্রসঙ্গে ডায়ার আরো বুঝিয়ে বললেন,—

হয়তো গুলি না চালিয়েও আমি জনতাকে হটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু জনতা যদি না হটত, তাহলে আমাকে হাস্যাস্পদ হতে হোতো। সভায় যারা এসেছিল, তারা সব হাঙ্গামাকারী—এক ব্যাপকতর আন্দোলনের তারা অংশ। তারা সব বিদ্রোহী,—আমার কর্তব্য ছিল এই সব বিদ্রোহীদের জমায়েতের উপর গুলি করা,—এবং উত্তম করে গুলি করা।

ডায়ার ঠিকই বলেছিলেন। বিদ্রোহ দমন করতে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে তিনি অমৃতসর পৌঁছেছিলেন। সেই রাত্রেই তিনি শহরের মধ্যে ঢুকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন,—বুঝেছিলেন শহরের ঐ উঁচু উঁচু বাড়ি আর সরু সরু গলির মধ্যে সৈন্য নিয়ে ঢুকে বিদ্রোহীদের খুঁজে খুঁজে শায়েস্তা করা অসম্ভব। জালিয়ানওয়ালা-বাগের মতো একটা সভা মনে মনে তিনি চাইছিলেন, যেখানে ফাঁকা জায়গায় সব বিদ্রোহীকে এক জমায়েতের মধ্যে পেয়ে তিনি তাদের ধ্বংস করতে পারবেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের সভায় প্রার্থিত সুযোগের তিনি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

গত সাত মাসের মধ্যে জেনারেল ডায়ারের মনে কৃতকর্মের জন্যে একবিন্দু অনুশোচনার বাষ্পও কি জমেনি? বীভৎস হত্যালীলা সম্পন্ন করার পর সেই বিভীষিকাময়ী সন্ধ্যায় তাঁর মনের অবস্থা কী হয়েছিল তা তিনিই জানেন। দুশ্চিন্তা অন্তত তাঁর হয়েছিল,—দুঃস্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন। কিন্তু সেই দুশ্চিন্তা আর দুঃস্বপ্নকে সহজেই তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন। একবারও যদি তিনি ভেবে থাকেন যে তিনি ভুল করেছেন অন্যায় করেছেন, মনের সে দুর্বলতা জয় করতে তার সময় লাগেনি। তাঁর সহকর্মীরা তাঁর পিঠ চাপড়িয়েছেন, তাঁর

কর্তৃস্থানীয়রা তাঁকে তারিফ করেছেন, ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকাগুলি তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়েছে,—সারা ইংরেজসমাজ তাঁকে পরিত্রাতা বলে দাবী করেছে। জয়ধ্বনির সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে তাঁর নাম।

লর্ড হাণ্টারের সামনে তিনি ভালোই বলেছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা তিনি রাখেননি। তিনি বিদ্রোহীদের জয় করেছেন, বিদ্রোহকে চূর্ণ করেছেন। প্রকাশ্য দরবারে তদন্তসভা বসেছে। শ্রোতারা তাঁর কথা শুনে গুঞ্জন করছে। সেই গুঞ্জনধ্বনি তাঁর কানে জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়ে বাজছে। আর তিনি নার্ভাস নন।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি র‍্যাংকিন এবার প্রশ্ন শুরু করলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর শুনেই সকলে শিউরে উঠল।

ডায়ার বললেন,—আমি জালিয়ানওয়ালাবাগে যাবার আগেই মনস্থির করেছিলাম যে গুলি আমাকে চালাতেই হবে। সেজন্যে তৈরী হয়েই আমাকে যেতে হবে। যদি বিদ্রোহীরা সভা চালিয়ে যেত তাহলে সেখানকার প্রত্যেকটা লোককে আমি সাবাড় করতাম,—এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা।

একটু স্তব্ধ থেকে বিচারপতি র‍্যাংকিন শুধোলেন,—

এমনি প্রতিজ্ঞা আপনি করেছিলেন কেন?

দৃপ্তকণ্ঠে ডায়ার জবাব দিলেন,—

তার কারণ আমার হুকুম তারা মানেনি। এই হুকুম না মানাই বিদ্রোহ ঘোষণা। শুধু অমৃতসরবাসীর বিদ্রোহ নয়, সারা পাঞ্জাবজোড়া বিদ্রোহ। আমি স্থির করেছিলাম, আমাকে শক্ত হতেই হবে, শক্ত কাজ করতেই হবে।

শক্ত কাজের নাম করে আপনি যা করেছিলেন তার নাম বিভীষিকা,—তাই নয়?

না, তা নয়,—অপরাধীর শাস্তিদান বিভীষিকা নয়।

পর পর দুজন ইংরেজ বিচারপতির সামনে ডায়ারের বক্তব্য

ভালোই হোলো। এইবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন একজন ভারতীয়। ডায়ারের আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তার বদলে তাঁর মেজাজ আরো দম্ভকঠোর হয়ে উঠল।

প্রশ্ন শুরু করলেন সার চিমনলাল শীতলবাদ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—

আপনি কি জালিয়ানওয়ালাবাগে দুটো সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

ঐ দুই সাঁজোয়া গাড়িতে মেশিনগান বসানো ছিল ?

হ্যাঁ।

সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন কেন ? সভার জনতার উপর মেশিনগান চালাবেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে ? তাই না ?

দরকার হলে মেশিনগান চালাতে হতে পারে সেই ভেবে ?

কী রকম দরকারের কথা আপনি ভেবেছিলেন ?

যদি জনতা দ্বারা আমি আক্রান্ত হতাম, বা অন্য কোনো দরকার হোতো তাহলে মেশিনগান আমি ব্যবহার করতাম।

আপনি যখন পৌঁছলেন তখন দেখলেন রাস্তা খুব সরু,—তাই আপনি সাঁজোয়া গাড়িদুটোকে বাগের মধ্যে ঢোকাতে পারলেন না,—তাই না ?

হ্যাঁ।

তাই শুধু বন্দুকধারী সৈন্য নিয়েই আপনি সরু গলি দিয়ে বাগের মধ্যে ঢুকলেন। আক্রান্ত না হয়েও আপনি সেখানে জনতার উপর গুলি চালিয়েছিলেন,—তাই না ? ধরুন যদি গলিটা খুব সরু না হোতো। সাঁজোয়া গাড়ি দুটোকে আপনি বাগে ঢোকাতে পারতেন,—তাহলে বন্দুকের বদলে মেশিনগান দিয়েই আপনি গুলি শুরু করতেন না কি ?

হ্যাঁ, সম্ভবত তাই করতাম।

তাহলে হতাহতের সংখ্যাও আরো অনেক বেশি হোতো ?

হ্যাঁ, তা হোতো।

আপনি যে বন্দুকের বদলে মেশিনগান দিয়ে গুলি চালাননি, তার সোজা কারণ হচ্ছে এই যে আপনি সাঁজোয়া গাড়িদুটোকে বাগের মধ্যে নিয়ে যেতে পারেননি।

ডায়ার কাঁধঝাঁকি দিয়ে উত্তর দিলেন,—

এ কথার উত্তর আমি আগেই দিয়েছি। আমি বলেছি যে মেশিনগান যদি হাতে থাকত, তাহলে সম্ভবত আমি সেগুলো দিয়েই গুলি শুরু করতাম।

মেশিনগানের গুলি ?

হ্যাঁ, সোজা মেশিনগানের গুলি।

সার চিমনলালের আর বেশি কিছু প্রশ্ন ছিল না। তাঁর উত্তর তিনি পেয়ে গেছেন। তবু আরো কিছু প্রশ্ন তিনি করলেন। ডায়ার উত্তরও দিলেন দম্ভভরে। বন্দুকের গুলিই ডায়ার চালিয়েছিলেন,—মেশিনগানের নয়। গুলি চালিয়েছিলেন জনতাকে একবারও সাবধান না করে, জনতার কোনো আক্রমণাত্মক চিহ্ন লক্ষ্য না করে। যতোক্ষণ না গুলির রসদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল, ততোক্ষণ তিনি থামেননি, গুলি চালাবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি যাত্রা করেছিলেন,—দরকার হলে বে-আইনি সভার প্রত্যেকটা লোককে তিনি সাবাড় করবেন,—এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। মেশিনগানের সাহায্য পেলে এই প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ই তিনি পূর্ণ করতে পারতেন।

শীতলবাদ এবার প্রশ্ন করলেন,—

আমি কি ধারণা করতে পারি যে জালিয়ানওয়ালাবাগে আপনার কাজের মাধ্যমে আপনি শুধু অমৃতসরে নয় সারা পাঞ্জাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন ?

ডায়ার গর্বিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—

আপনি যাই বলুন, আমি চেয়েছিলাম অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে,—সেই সঙ্গে চেয়েছিলাম একটা ব্যাপক ফল আদায় করতে। বিদ্রোহীদের মনোবলকে চূর্ণ করতে।

আপনার কি মনে হয়েছিল যে বৃটিশরাজের মহা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

ডায়ার শ্লেষভরা কণ্ঠে বললেন,—আজ্ঞে না, বৃটিশরাজের শক্তি অপরিসীম। তবে আমি যা করেছিলাম তাতে অনেক ধন সম্পত্তি আর অনেক প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল,—বিদ্রোহের প্রসার আমি রোধ করেছিলাম।

সার চিমনলালের কণ্ঠ কঠোর হোলো। তিনি বললেন,—

শুনতে খারাপ লাগলেও আপনার কাজের অপর নাম বিভীষিকা। আপনার কি একবারও মনে হয়নি যে এই বিভীষিকা দ্বারা আপনি বৃটিশরাজের ক্ষতিই করেছেন,—প্রজার অসন্তোষকে গভীরে ঠেলে দিয়েছেন ?

না, আমি যা করেছি তা কঠোর কর্তব্য। এমন অপ্রিয় কর্তব্য পালন করা সহজ নয়। কিন্তু ধনপ্রাণ রক্ষা করার জন্যে এই একমাত্র কর্তব্য,—অপ্রিয় হলেও কঠোর হলেও। যে কোনো বিচারশীল মানুষই উপলব্ধি করবে যে আমি ঠিক কাজই করেছিলাম। অপ্রিয় হলেও নিরুপায়, ভয়ংকর হলেও করুণাকর,—এই কর্তব্য পালনের জন্যে আমার ধন্যবাদ পাওয়াই উচিত। তাই আমি মনে করেছি।

ডায়ার স্বীকার করলেন যে ভিড় দেখে দেখে তিনি গুলি চালিয়েছিলেন। গুলির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে লোকে মাটিতে শুয়ে পড়েছিল.—তিনি সেই লুটিয়ে পড়া মানুষদের উপর গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এও তিনি স্বীকার করলেন যে তাঁর গুলিতে আহত লোকদের শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থাই তিনি করেননি। গুলি চালাবার একটু

পরেই কার্ফু নেমে এসেছিল। সেই কার্ফুর মধ্যে হতাহতদের দেখবার সুযোগ কোথায়?

উত্তরে নির্লিপ্ত হৃদয়হীনতার সঙ্গে ডায়ার বললেন,—

যার দরকার সে আমার কাছে রাত্রে বার হবার অনুমতি চাইলেই পারত? চায়নি কেন জানেন? যে কেউ অনুমতি চাইতে আসত,—সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যেত যে সেও ঐ বে-আইনি ভিড়ের মধ্যে ছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ে যেত!

শেষ পর্যন্ত ডায়ার ঘোষণা করলেন যে তিনি খুব উত্তম কাজ করেছিলেন,—অপরাধীকে একেবারে ঠাণ্ডা করার মতো সঠিক শাস্তি দিয়েছিলেন।

সার চিমনলালের সামনে ডায়ার যা বললেন, তাতে বুঝতে বাকি রইল না যে ডায়ার শাস্তির নামে প্রজাহত্যা করতেই চেয়েছিলেন,—এবং এই হত্যালীলা প্রজাশাসনের অতি উত্তম ও উপযুক্ত ব্যবস্থা,—এই ছিল তাঁর স্থির ধারণা।

পেশোয়ার ডিভিসনের সেনানায়ক মেজর জেনারেল সার জর্জ ব্যারো হাণ্টার কমিটির সামরিক সদস্য। তিনি এতোক্ষণ ডায়ারের জবানবন্দী শুনছিলেন। মনে মনে তিনি ভাবছিলেন বেপরোয়া ও উদ্ধত ভাষণে ডায়ার নিজের সমূহ ক্ষতি করছেন। এই ক্ষতি থেকে তিনি ডায়ারকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করলেন।

জেনারেল ব্যারো বললেন,—

আপনি নিশ্চয়ই জানতেন যে সামরিক বিধানে বে-আইনি জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে হলে অস্ত্র ব্যবহার সংগত এমনকি সেই জনতা সহিংস না হলেও?

ডায়ারের উত্তর তিনি প্রশ্নের মধ্যেই জুগিয়ে রেখেছিলেন। ডায়ার বললেন,—

হ্যাঁ, আমি জানতাম।

অমৃতসরের অবস্থা তখন যেমন হয়েছিল তার গুরুত্ব অবস্থার প্রত্যক্ষভাবে সম্মুখীন যে হয় সেই বুঝতে পারে, আর কেউ নয়,—ঠিক না ?

ডায়ার বললেন,—আপনি ঠিকই বলেছেন।

অবস্থা নিশ্চয়ই এমনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ভেবেচিন্তে দেরি করবার অবসর তখন ছিল না, একটু সময় নষ্ট না করে অবস্থার মোকাবিলা করাই তখন ছিল কর্তব্য,—তাই না ?

ঠিক তাই।

আপনি সেই অবস্থায় যা করতে চলেছেন তার ভবিষ্যৎ ফলাফল কী হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করবার সময় নিশ্চয় আপনার ছিল না ?

ঠিকই আপনি বলেছেন। আমার তখন কাজের সময়। ভাবনা চিন্তার সময় নেই।

সেই গুরু বিপদের সময়ে আপনি যা উপযুক্ত কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন,—তা করতে আপনি পিছপাও হননি।

না, তাহলে আমাকে কর্তব্যভ্রষ্ট হতে হোতো।

ডায়ার যে একজন কর্তব্যপরায়ণ সামরিক অফিসার, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করার জন্যেই তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনা ঘটাতে বাধ্য হয়েছিলেন,—ভাবনাচিন্তা করবার মতো সময় তখন ছিল না বরং ভাবনাচিন্তা করে সময় নষ্ট করলে কর্তব্যচ্যুতি হোতো,—এইটুকু কথা তিনি ডায়ারের মুখ দিয়ে বার করিয়ে নিলেন।

তারপরে ডায়ারকে প্রশ্ন করতে এগিয়ে এলেন পণ্ডিত জগৎ নারায়ণ। প্রশ্নের জালে তিনি ডায়ারকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন,—জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের রোমহর্ষক কাহিনী তাঁর এক এক প্রশ্নের উত্তরে ডায়ারের মুখ থেকে উদ্ঘাটিত হতে লাগল।

ডায়ার স্বীকার করলেন অমৃতসরবাসীদের কোনো সহিংস ব্যবহার তিনি নিজের চোখে দেখেননি,—কেননা ১০ই এপ্রিলের পর,

জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার আগে ও পরে কোনো হাঙ্গামাই অমৃতসর-বাসীরা করে নি।

তাহলে ১৩ই এপ্রিল তারিখের বিকেলে আপনি অমৃতসরে এমনি নৃশংস তাণ্ডব করেছিলেন কেন!

ডায়ার বললেন,—

শুধু অমৃতসরের কথা ভেবেই আমি জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালাইনি।

তাহলে কী ভেবে গুলি চালিয়েছিলেন?

সারা পাঞ্জাবের বিদ্রোহের কথা ভেবে।

পাঞ্জাবের কোন বিদ্রোহের ঘটনা কি আপনি নিজের চোখে দেখেছিলেন?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর ডায়ার দিতে পারলেন না। কেননা কিছুই তিনি দেখেননি। তিনি ঘুরিয়ে বললেন,—

অমৃতসর ও অন্যত্র যে সব ঘটনা ঘটেছিল তা থেকে আমার ধারণা হয়েছিল যে বিদ্রোহের একটা সুসংবদ্ধ ষড়যন্ত্র চলেছে।

প্রশ্ন করলেন সার সুলতান আমেদ,—

এমনি কোনো ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনার কাছে ছিল?

এ প্রশ্নেরও সোজা উত্তর নেই। কেননা কিছুই ডায়ার জানতেন না। ডায়ার বললেন,—

তা ছিল না বটে, তবে দেখেশুনে মনে হয়েছিল এক ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটতে চলেছে?

এমনি ব্যাপক বিদ্রোহ-প্রচেষ্টার কোনো শাখাদল অমৃতসরে ছিল কিনা আপনি খবর নিয়েছিলেন?

এ প্রশ্নের উত্তরও ডায়ার দিতে পারলেন না।

তখন সার সুলতান আমেদ জিজ্ঞাসা করলেন,—

বিদ্রোহ বলতে আপনি কি বোঝেন?

বেসরকারী শাসন যখন ভেঙে পড়ে তখনি বিদ্রোহের অবস্থা হয়।

আমি যখন অমৃতসরে পৌঁছই তখন বেসামরিক শাসনব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শাসনভার আমি আমার হাতে তুলে নিয়েছিলাম।

কোন্ অধিকারে? সামরিক শাসন তখনো তো প্রবর্তিত হয়নি!

তা হয়নি, তবে শাসনভার নিয়েছিলাম আমি। তার প্রয়োজন ছিল।

আপনি কি কোনো ঘোষণা করেছিলেন, যে তখন থেকে আপনিই অমৃতসরের একছত্র শাসক?

না, তা করিনি।

তবু আপনিই স্থির করেছিলেন যে সারা অমৃতসর বিদ্রোহ করেছে,—আর এই বিদ্রোহ দমনের একমাত্র এবং সর্বময় কর্তা আপনি?

হ্যাঁ, আমি তাই স্থির করেছিলাম, ডায়ার কর্কশকণ্ঠে বললেন,—আর আপনারা যাই বলুন, বিদ্রোহ দমনও আমি করেছিলাম।

বিচক্ষণ নিষ্ঠুরতার যে পরিচয় ডায়ার দিয়েছিলেন, মানবতার ন্যূনতম মূল্যবোধকে তিনি যেভাবে পরিহার করেছিলেন তা তাঁর নিজের ভাষাতেই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। সরকারী অ্যাডভোকেট মিস্টার হার্বার্ট ব্যাপারটা একটু নরম করতে চাইলেন। তিনি মন্তব্য করলেন,—

জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘিরে যে সব উঁচুউঁচু বাড়ি রয়েছে, তার দোতলা তিনতলার দেয়ালেও গুলির চিহ্ন রয়েছে। এর থেকে মনে হয় ডায়ার প্রথমটা উঁচু দিকে গুলি ছুঁড়ে জনতাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ডায়ার প্রতিবাদ করলেন। বললেন,—

মোটেই না,—আমি উঁচুদিকে গুলি ছুঁড়বার হুকুম দিইনি। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গুলিবর্ষণ পরিচালনা করেছিলাম। লোকের মাথার উপর দিয়ে গুলি চালিয়ে বুলেট নষ্ট করার লোক আমি নই।

অমৃতসরে সামরিক শাসনকালের ডায়ারের বিভিন্ন হুকুমের কথা

সরকারী অ্যাডভোকেট উল্লেখ করলেন। দীর্ঘস্থায়ী কার্ফু, সরকার সেলাম, হামাগুড়ি হুকুম,—এই সমস্ত অমানুষিক নির্দেশ। তিনি ডায়ারকে প্রশ্ন করলেন,—

গত যুদ্ধের সময় জার্মানিরা বেলজিয়াম দখল করে সেখানকার অধিবাসীদের উপর যে রকম হুকুম চালিয়েছিল,—আপনার হুকুমগুলি কি অনেকটা সেই রকমের ছিল না?

ডায়ার বললেন,—

বেলজিয়ামের কথা আমার মনে পড়েনি। এ সব হুকুম আমারই আবিষ্কার।

জেনারেল ডায়ারের বক্তব্য শেষ হোলো। কমিটিরুম থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সত্যিই তিনি খুব ক্লান্ত। অনেক কথা তিনি বলেছেন,—দম্ভভরা কথা। অনেক প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন,—গর্বোদ্ধত উত্তর। হাণ্টার কমিটির সামনে তাঁর বক্তব্যের কিছু নমুনা আগেও বর্ণিত হয়েছে।

একজন বন্ধু তাঁর পাশে ছুটে এলেন। ব্যাকুল গলায় বললেন,—

কমিটির সামনে তুমি ও কথা বললে কেন?

কী কথা?

যে গুলি করার উদ্দেশ্য :নিয়েই তুমি জালিয়ানওয়ালাবাগে ঢুকেছিলে?

বলেছিলাম নাকি! তা ঠিকই তো বলেছিলাম,—গুলি চালাবার জন্যে তৈরি হয়েই তো গিয়েছিলাম,—অবশ্য দরকার বুঝলে।

দরকার হয়েছিল কি?

হয়নি? কী যে বলো তুমি!

॥ ১৭ ॥

হাণ্টার কমিটির সামনে আর এক সাক্ষী। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

সার মাইকেল ও-ডায়ার হুমকি দিয়েছিলেন,—গান্ধীই নাটের গুরু। তিনি বলেছিলেন পাঞ্জাবে যা কিছু ঘটেছে তার জন্যে দায়ী ঐ গান্ধী। তিনিই আগুন জ্বেলেছেন।

কিন্তু ঐ গান্ধীকে তিনি পাঞ্জাবে ঢুকতে দেননি। গান্ধীজী যদি উপস্থিত হতেন তাহলে পাঞ্জাবে যা কিছু ঘটেছিল, তার অনেক কিছু ঘটাবার সুযোগ নিশ্চয়ই তিনি পেতেন না। হিংসার ইন্ধন জ্বালিয়ে সেই হিংসাদমনের অছিলায় সারা পাঞ্জাবে অমানুষিক প্রতিহিংসার দাবানল তিনি জ্বালতে পারতেন না।

শাসকের অত্যাচারে গান্ধীজী ভয় পাননি। তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন অন্য কারণে। দেশবাসী সত্যাগ্রহের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, হিংসার পথে অগ্রসর হয়েছে,—সম্পত্তিনাশ করেছে, নরহত্যা করেছে। তিনি বুঝেছিলেন,—অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রামের জন্য দেশবাসী এখনো প্রস্তুত হয়নি,—দীক্ষিত হয়নি। এই সংগ্রামে যারা সৈন্য হবে তাদের অনেক সাধনা অনেক পরীক্ষা এখনো বাকি।

গান্ধীজী নিজের ভুল স্বীকার করেছিলেন,—অনতিবিলম্বে আন্দোলন বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটে গেছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত করার পর মাসের পর মাস ধরে পাঞ্জাবে সামরিক শাসনের তাণ্ডব চালিয়ে গিয়েছেন গভর্ণর ও-ডায়ার।

এই নাটের গুরু গান্ধীও হাণ্টার কমিটির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। লর্ড হাণ্টার শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর কথা শুনেছিলেন। শুনেছিলেন সত্যাগ্রহের মর্মব্যাখ্যা।

৯ই জানুয়ারী, ১৯২০ সাল।

স্থান আমেদাবাদ।

লর্ড হান্টার গান্ধীজীকে বললেন,--

মিস্টার গান্ধী, আপনিই তো সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্রষ্টা?

হ্যাঁ, মাই লর্ড।

এই আন্দোলন কী, তা কি আপনি সংক্ষেপে বলবেন?

গান্ধীজী বললেন,—

এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হিংসাত্মক ব্যবহারকে অপসরণ করা। একমাত্র সত্যের উপর এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা। সত্য ও অহিংসা,—আমার আন্দোলনের মূলমন্ত্র। যে সহজ নীতিতে মানব পরিবার পরিচালিত,—সেই নীতিই রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি প্রসারিত করেছি।

তাঁর সহজ নীতিকে অতি সহজ উদাহরণ দিয়ে গান্ধী বুঝিয়ে দিলেন। পরিবারের মানুষদের মধ্যেও বিরোধ থাকে,—সেই বিরোধ মেটায় সত্যের দাবী,—কিন্তু সেই দাবী হিংস্রতা আর সংঘাতের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেনা।

গান্ধীজী আরো বললেন,—

দুঃখের কারণ যতো বাড়ে, দুঃখ থেকে মুক্তির আকুলতাও ততো বাড়ে। দুঃখমোচনের এই আকুলতা সারা দেশে সহিংস বিক্ষোভ হয়ে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনা থেকে দেশকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় সত্যাগ্রহ।

লর্ড হান্টারকে গান্ধীজী বললেন রাওলাট আইনের প্রতিবাদে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন ঘোষণা করেছিলেন। এই আইন নীতিহীন, —এবং সেই নীতিহীনতার শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদ অহিংস সত্যাগ্রহ।

লর্ড হান্টার প্রশ্ন করলেন,—আপনি আপনার দেশবাসীকে সত্যাগ্রহের শপথ গ্রহণ করতে আহবান করেছিলেন?

হ্যাঁ, মাই লর্ড।

আপনি কি আপনার এই আন্দোলনে যতো লোক সম্ভব দলভুক্ত করতে চেয়েছিলেন ?

হ্যাঁ,—অবশ্য সত্য ও অহিংসা এই দুই মূলনীতির ভিত্তিতে। সত্য ও অহিংসার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দশ লক্ষ লোক আমি যদি পেতাম, তাহলে তাদের প্রত্যেককেই আমি আমার আন্দোলনভুক্ত করতাম।

গান্ধীজী গোপন করলেন না যে তিনি তাঁর আন্দোলনকে ব্যাপক গণ-আন্দোলনে পরিণত করার আশা করেছিলেন। লর্ড হাণ্টার প্রশ্ন করলেন,—

আপনার এই আন্দোলন কি আসলে সরকারবিরোধী নয়,—কেন না সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞাকে খাড়া করতে চেয়েছেন ?

গান্ধীজী ক্ষোভের সঙ্গে স্মরণ করলেন জনসাধারণ কীভাবে সত্যাগ্রহ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে,—যে কারণে তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছেন। মুখে শুধু বললেন,—

বিরোধ মানে হিংসা নয়, মাই লর্ড। আমার আন্দোলনের মর্ম জনসাধারণ এখনো বুঝতে পারেনি।

লর্ড হাণ্টার এবার স্পষ্টকথা বললেন,—

আপনি সরকারের দৃষ্টি দিয়ে ব্যাপারটা দেখুন। আপনি যে আন্দোলন করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল আপনার সত্যাগ্রহ কমিটি যে সব আইন অমান্যের নির্দেশ দেবে, লোকে সেই সব আইন অমান্য করবে। আপনি নিজে যদি গভর্ণর হতেন, তা হলে এ ক্ষেত্রে আপনি কি করতেন ?

গান্ধীজী উদার হাসি হাসলেন। বললেন,—

মাই লর্ড, একদল সত্যসন্ধানী লোক অন্যায় আইনের নাগপাশ থেকে দেশবাসীকে মুক্তি দেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এগিয়েছে,—অথচ যে পথে তারা চলতে চেয়েছে তা অহিংসার পথ। গভর্ণমেণ্ট যদি আমার হাতে থাকত আর আমি যদি এই লোকদের মুখোমুখি

হতাম, তাহলে আমি ভাবতাম যে এদের মতো আইন-মানা লোক আর কোথাও নেই। আমি যদি গভর্ণর হতাম তাহলে আমি এদের আমার কাছে ডাকতাম, পাশে বসাতাম,—বিশ্বাস করতাম এরাই আমাকে প্রকৃত মন্ত্রণা দেবে, আমাকে ঠিক পথ দেখাবে।

লর্ড হাণ্টার একটু ভাবলেন। তারপর বললেন,—

কোনো আইন ন্যায় কি অন্যায়,—এই নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে।

নিশ্চয়ই পারে। এবার গান্ধীজী বললেন আশ্চর্য কথা,—

সেই জন্যেই সত্যাগ্রহে হিংসার স্থান নেই। সত্যাগ্রহী তার নিজের মনোভাব আর বিশ্বাসে যে স্বাধীনতা রাখে, তার বিরুদ্ধ-বাদীকেও সেই স্বাধীনতা দেয়। হিংসা দিয়ে সে জোর করে না।

গান্ধীজী রাওলাট আইনের প্রতিবাদে আন্দোলনের যে ডাক দিয়েছিলেন,—সেই ডাক গণ-আন্দোলনের ডাক। কিন্তু তার পিছনে কোনো চক্রান্ত ছিল না, ধ্বংসকারী গণবিপ্লবের কোনো গোপন প্রস্তুতি ছিল না। তিনি সরকারকে ধ্বংস করতে চাননি,—সংশোধন করতে চেয়েছিলেন, সহৃদয় করতে চেয়েছিলেন।

লর্ড হাণ্টার বললেন,—

মিষ্টার গান্ধী, আমি এই ব্যাপারটাকে গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্বের দিক থেকে চিন্তা করে দেখছি। আপনি এমন একটা জনগোষ্ঠী গঠন করতে চাইছেন যারা গভর্ণমেণ্টের কথা মানবে না, তার বদলে আপনার সত্যাগ্রহ কমিটির কথা মানবে। এমনি জনগোষ্ঠী যদি আপনি গড়ে তুলতে পারেন তাহলে সরকার থাকবে কী?

গান্ধী উত্তর দিলেন,—

দক্ষিণ আফ্রিকায় আট বছরের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে এমনি সত্যাগ্রহপন্থী জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা সম্ভব। আর এই দীর্ঘ আন্দোলনের সঙ্গে যিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই জেনারেল স্মাটস্ শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন যে

সকলেই যদি সত্যাগ্রহীর মতো ব্যবহার করে, তাহলে ভয় করবার কিছু নেই।

লর্ড হাণ্টার বললেন,—

সত্যাগ্রহীর এই প্রতিজ্ঞায় আপনি নির্দেশ করেছেন যে আপনাদের কমিটি যে সব আইন অমান্য করতে নির্দেশ দেবে সেইসব আইনই তারা অমান্য করবে,—তাই না ?

ঠিকই বলেছেন, মাই লর্ড। আমি জানি এমনি নির্দেশ ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। কিন্তু আইন অমান্যের অর্থ যার যা খুশি বে-আইনি কাজ করা নয়। আমি চাই আমার আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হোক। তার জন্যে নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন। কমিটি যে আইনকে যেভাবে অমান্য করতে নির্দেশ দেবেন, সত্যাগ্রহ কর্মীরা সেই নির্দেশ মেনে সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করবেন। তাই আমি চেয়েছি।

গান্ধীজী কোনো গোপন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে নামেননি। সত্যাগ্রহের অমোঘ অস্ত্র আইন অমান্য। এই অস্ত্রকে তিমি প্রথম থেকেই মেলে ধরেছিলেন। সব অস্ত্রেরই কোথাও না কোথাও দুর্বলতা থাকে,—সেই দুর্বলতাকে লুকিয়ে রাখতে হয়। গান্ধীজী সেই দুর্বলতাকেও লুকিয়ে রাখেননি। আইন অমান্য কে করতে পারে ? যে আইনকে মানে, সেই। আইন ভাঙলে শাস্তি পেতে হবে এই ভয়ে যে আইন মানে সে কিন্তু নয়। আইনকে যে ভয় পায় না, আইনকে সমাজের সত্য শৃঙ্খলা বলে বিশ্বাস করে এবং পবিত্র কর্তব্য বলে মান্য করে সেই সত্যাগ্রহী। তখনই সে সত্যভাবে বিচার করতে পারে কোন্ আইন ভালো আর কোন্ আইন ন্যায়বিরুদ্ধ। তখনি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কোনো আইনকে আপন বিবেকে অমান্য করার অধিকার তার জন্মায়। আইন অমান্য দায়িত্বহীনতা নয়, মাৎসন্যায় বা নৈরাজ্য নয়,—সত্যাগ্রহের কঠিন পরীক্ষা।

হাণ্টার কমিটির সামনে গান্ধীজীকে যাঁর সবচেয়ে চতুর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তিনি সার চিমনলাল শীতলবাদ। বিখ্যাত আইনজ্ঞ তিনি,—ক্ষুরধার তাঁর বুদ্ধি।

সার চিমনলাল আরম্ভ করলেন,—

মিস্টার গান্ধী, আমি যতোদূর বুঝেছি, আপনার সত্যাগ্রহের মর্ম হোলো এই যে সত্যের অনুসরণ করতে হবে, এবং এই অনুসরণের প্রয়াসে যতো দুঃখ আসুক, অপরকে আঘাত না করে সেই দুঃখকে সহ্য করতে হবে।

গান্ধীজী বললেন,—ঠিকই বুঝেছেন, সার।

দেখুন, যতো গভীরভাবেই একজন সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুক না কেন, সে যাকে সত্য সত্য বলে ধারণা করে অপরের ধারণা তার সঙ্গে নাও মিলতে পারে? তাই না?

তাই সার।

তাহলে সত্য যে কী,—তা নির্ণয় করবে কে?

ব্যক্তিবিশেষই নির্ণয় করবে।

তাহলে ভিন্ন ভিন্ন লোকের সত্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা হবে। তাতে বিভ্রান্তি ঘটবে না কি?

না, আমার তা মনে হয় না।

বলেন কি মিস্টার গান্ধী? সত্যের তো নানা রূপ! এ বলবে আমার ধারণাই সত্য,—আর একজন বলবে, না আমার ধারণাই সত্য। তখন উপায়?

গান্ধীজী শান্ত হেসে বললেন,—

উপায় অহিংসা। অহিংসা ছাড়া সত্যাগ্রহ হয় না। অহিংসা যদি না থাকে তাহলে সত্যের নামে শুধু বিভ্রান্তি কেন, আরো অনেক কিছু হতে পারে। তা কি আপনার অজানা?

সার চিমনলাল আলোচনার দিক পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। বললেন,—

আচ্ছা, এই যাঁরা সত্যকে অনুসরণ করবেন তাঁদের খুব উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক চরিত্রের লোক হওয়া কি দরকার নয় ?

না, আমি তা মনে করি না। সকলেই খুব উঁচু মনের হবেন, এমনি আশা করা অসম্ভব। একজন হয়তো সত্যের উপলব্ধি করবেন অপরে তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করবে—এই স্বাভাবিক।

আপনি বলছেন উচ্চস্তরের একজন নির্দেশ দেবেন, আর অন্যেরা যাদের নৈতিক ও মানসিক শক্তি কম তারা অন্ধের মতো তাঁর নির্দেশ মেনে ছুটবে ?

গান্ধীজী বললেন,—

অন্ধের মতো ছুটবে কেন ? প্রত্যেকেরই বুদ্ধি আছে, চেতনা আছে। প্রত্যেকেই তো সত্যসন্ধানী। তবে একজন যদি সত্যপথ নির্ণয় করে অপরকে সেই পথে আহ্বান করে, আর অপরে যদি সেই আহ্বানে সাড়া দেয়,—তা তো অস্বাভাবিক নয়। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সাধারণ বিচারবুদ্ধি আর সাধারণ প্রবণতা আশা করাই তো স্বাভাবিক।

এবার সার চিমনলাল বললেন,—

আপনিই বলেছেন যে আপনি এখনো প্রকৃত সত্যাগ্রহী হতে পারেননি। সত্যাগ্রহীর রূপে আপনারই যদি ত্রুটি থাকে, তাহলে দেশের জনসাধারণের তো কথাই নেই !

গান্ধীজী বুঝলেন সার চিমনলাল আসলে কী বলতে চাইছেন। তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফল হয়নি, সম্পূর্ণ অহিংস হয়নি। সেই কটাক্ষ রয়েছে এই প্রশ্নে।

তিনি উত্তর দিলেন,—

আমি নিজেকে কোনো অত্যাশ্চর্য মানুষ বলে মনে করি না। সত্যকে নির্ণয় করার, সত্যকে অনুসরণ করার মতো আমার থেকে অনেক উপযুক্ত মানুষ থাকতে পারে বৈকি! দক্ষিণ আফ্রিকার চল্লিশ হাজার ভারতবাসী,—অধিকাংশই অশিক্ষিত,—তারা সত্যকে

উপলব্ধি করেছিল,—সত্যাগ্রহী হয়েছিল। সেখানকার চমকপ্রদ ঘটনাবলীর মধ্যে আমি যদি আপনাকে নিয়ে যেতে পারতাম তাহলে দেখতেন আপনার দেশবাসীরা কী কঠোর আত্মসংযমের পরীক্ষা দিয়েছিল।

কিন্তু সেখানে সবাই একমত ছিল।

আফ্রিকায় ভারতবাসীদের জনমতের যে ঐক্য, এখানে সে ঐক্য অনেক বেশি।

কী করে হবে? সেখানে আপনাদের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল, এখানে তো তা নেই।

এখানেও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে,—ঐ রাওলাট আইনকে মুছে ফেলা।

সার চিমনলাল শেষ প্রশ্ন করলেন,—

আচ্ছা মিস্টার গান্ধী, আপনি প্রথমেই বলেছেন সত্যাগ্রহীকে দুঃখবরণ করে যেতে হবে। এমনি দুঃখবরণ কি সহজ লোকে পারে? যে পারে তার পক্ষে অসাধারণ আত্মসংযমের দরকার হয় না কি?

উদার হাসি হাসলেন গান্ধীজী। তিনি ভারতবাসীকে দুই মহাদেশে দেখেছেন,—দেখেছেন শ্বেত শাসকের অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট জর্জরিত জাতির দুই অংশকে। যারা বঞ্চিত ও ভাগ্যহত, যারা দুর্বল ও অশক্ত। দুঃখবরণই যাদের জীবনের একমাত্র অধিকার।

উত্তরে তিনি বললেন,—

না সার চিমনলাল, দুঃখবরণের জন্যে এমন কিছু অসাধারণ সংযমের দরকার করে না। আপনার সাধারণ দেশবাসীদের মধ্যেই সে সংযম আছে,—এবং ব্যাপক ক্ষেত্রে সে সংযমের পরিচয়ও তারা দিয়ে এসেছে।

সেই অসহনীয় দুঃখবরণের অসংখ্য উদাহরণ গান্ধীজী দিনের পর দিন দেখে এসেছেন পাঞ্জাবে। নিজের কানে শুনে এসেছেন

মর্মন্তুদ কাহিনীর পর কাহিনী। অহিংসার পথ থেকে সামান্য বিচ্যুতির জন্যে তিনি জনসাধারণকে ভর্ৎসনা করেছেন,—সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করেছেন। কিন্তু শাসকের যে হিংস্র বর্বরতার পরিচয় পাঞ্জাবে তিনি পেয়েছেন, তার জন্যে তিনি ভর্ৎসনা করবেন কাকে?

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের খবর প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর প্রাণ পাঞ্জাবে যাবার জন্যে আকুল হয়ে উঠল। কিন্তু সেখানে তখন সামরিক শাসন,—সামনে লৌহ যবনিকা। সেই যবনিকা পার হবার কোনো উপায় নেই।

সামরিক শাসনের অবসানের পরও গান্ধীজীর পাঞ্জাব যাবার অনুমতি মিললনা। তাঁর উপর ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞা তখনো বলবৎ রয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা তিনি অমান্য করতে পারেন। কিন্তু তার ফল ভালোর চেয়ে মন্দই হবে। জোর করে তিনি পাঞ্জাবে ঢুকতে পারবেন না। পথের মাঝখানেই তিনি গ্রেপ্তার হবেন,—হয়তো তাঁকে কয়েদ করে রাখবে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে দেশে নূতন করে আগুন জ্বলবে,—হিংসার আর প্রতিহিংসার। ম্লানতর হবে তাঁর আদর্শ,—গভীরতর হবে দুঃখের কালিমা।

অ্যানড্রুজ গেলেন। তিনি ঘুরে বেড়ালেন পাঞ্জাবের শহরে আর গ্রামে। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে দীর্ঘ পত্র পাঠালেন গান্ধীর কাছে। পাঞ্জাবের জন্যে গান্ধীজীর মন প্রাণ ছটফট করতে লাগল। তিনি বারে বারে পাঞ্জাবে যাবার অনুমতির আবেদন করতে লাগলেন বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের কাছে।

অবশেষে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হোলো,—১৯১৯ সালের ২০শে অক্টোবর নাগাদ গান্ধীজী অমৃতসর পৌঁছলেন। এর আগে তিনি কখনো সেখানে যাননি। যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু,—ডাক্তার কিচলু, ডাক্তার সত্যপাল বা পণ্ডিত রামভূজ দত্ত,—তাঁরা কেউ উপস্থিত নেই। তাঁরা সকলেই জেলে। সারা অমৃতসরের সাধারণ মানুষ তাঁকে স্বাগত জানাল।

আরো অনেকে এলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহরু, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, চিত্তরঞ্জন দাশ, আব্বাস তায়েবজী, এম আর জয়াকর প্রভৃতি সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ। ইতিমধ্যে হাণ্টার কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটি তাঁদের কাজ শুরু করলেন ৩০শে অক্টোবর। কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও এক অনুসন্ধান সাব-কমিটি গঠিত হোলো। এই কমিটির নেতৃত্ব করলেন গান্ধীজী।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের অধ্যুষিত এলাকায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন পণ্ডিত মালব্য। অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি। সামরিক শাসনের বর্বরতার সুস্পষ্ট ধারণা তিনি পেয়েছেন। কংগ্রেস নেতারা স্থির করলেন হাণ্টার কমিটির সঙ্গে তাঁরা সহযোগিতা করবেন। কমিটি নিরপেক্ষ তদন্ত করুন, এই তাঁরা চান। সেই নিরপেক্ষ তদন্তে সম্পূর্ণ সত্য যাতে প্রকাশ পায় তার জন্য কমিটিকে তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। এই সহযোগিতার ভিত্তিতে তাঁরা পাঞ্জাব সরকার ও হাণ্টার কমিটির কাছে কয়েকটি প্রস্তাব করলেন।

প্রথম প্রস্তাব,—

পাঞ্জাবের অবরুদ্ধ নেতাদের মুক্তি দেওয়া হোক ও কমিটির সামনে তাঁদের উপস্থিত করা হোক। তাঁরা পাঞ্জাবের জননেতা। পাঞ্জাববাসী যদি অন্যায় করে থাকে, সে অন্যায়ের তাঁরা অংশভাগী,—তারা যদি উৎপীড়িত ধর্ষিত হয়ে থাকে,—সেই লাঞ্ছনার তাঁরা বেদনার্ত সাক্ষী। হাণ্টার কমিটি তাঁদের যদি না ডাকেন, তাহলে পাঞ্জাবের সাধারণ প্রজার কথা তাঁরা কেমন করে জানবেন, কে শোনাবে তাদের বিভ্রম-বেদনার কাহিনী?

এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হোলো।

দ্বিতীয় প্রস্তাব,—

কংগ্রেস মনোনীত লোকদের সাক্ষ্য হাণ্টার কমিটি নেবেন ও কংগ্রেস তরফ থেকে সরকারী সাক্ষীদের জেরা করতে দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবও সত্যপ্রকাশের প্রয়োজনে। কংগ্রেস সাব-কমিটি ইতিমধ্যে

তথ্যসন্ধান আরম্ভ করেছেন। সেই সব তথ্য হাণ্টার কমিটি কেমন করে জানবেন যদি না সাধারণ মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন? সেই সাধারণ মানুষকেও হাণ্টার কমিটি কেমন করে চিনবেন যদি না কংগ্রেস তাদের নির্বাচিত করে কমিটির সামনে উপস্থিত করে? সরকার যে সব সাক্ষীকে উপস্থিত করবেন শুধু তাদের কথা শুনলে সম্যক সত্য উদ্ঘাটিত হবে না। বিশেষ করে যদি তাদের জেরা করা না হয়। সরকার পক্ষীয় উকিল যদি সাক্ষীদের দিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন, তাহলে কংগ্রেস পক্ষীয় উকিলও তাদের জেরা করে তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা পরীক্ষা করবেন না কেন?

কংগ্রেসের এই দ্বিতীয় প্রস্তাবও গৃহীত হোলো না। কংগ্রেস তখন হাণ্টার কমিটিকে বর্জন করা স্থির করলেন। কংগ্রেস সাবকমিটি স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করে চললেন।

সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন মালব্যজী আর শ্রদ্ধানন্দজী। অনুসন্ধান সাব-কমিটিতে নিয়োজিত হলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আব্বাস তায়েবজী, ফজলুল হক ও গান্ধীজী। অমৃতসর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় মতিলালের পরিবর্তে সাব-কমিটিতে যোগ দিলেন এম আর জয়াকর। দেশবন্ধুকে সাহায্য করবার জন্য মতিলাল নেহরু পাঠালেন তাঁর তরুণ পুত্র জহরলালকে। কংগ্রেস সাব-কমিটির এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে দেশবাসীর দুঃখবেদনার সঙ্গে জহরলাল নেহরুর প্রথম পরিচয়,—জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ।

সারা পাঞ্জাবের অধ্যুষিত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে কংগ্রেস সাব-কমিটির সদস্যরা উৎপীড়িত দেশবাসীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করলেন। হাণ্টার কমিটির মতো সুনির্দিষ্ট সরকার-মনোনীত সাক্ষীদের সুচিন্তিত জবানবন্দী তাঁরা গ্রহণ করেননি। তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে আত্মজন হয়ে গেছেন,—তারাও আকুল বেদনা নিয়ে তাঁদের কাছে ছুটে

এসেছে। স্বস্তি ও নির্ভরতার সঙ্গে তাদের মূক হৃদয়কে প্রকাশ করেছে তাঁদের সামনে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিল আর দৈবের অনুগ্রহে ডায়ারের গুলি থেকে যারা পরিত্রাণ পেয়েছিল এমনি লোক সাক্ষ্য দিয়েছে,—কড়েঁওয়ালা গলিতে যারা বুকে হাঁটতে বাধ্য হয়েছিল, বেত্রবেদীতে বেঁধে যাদের নগ্ন পিঠ চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল,—তারা সাক্ষ্য দিয়েছে। বিমান হতে গুলিবর্ষণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যারা জন্তুর মতো বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল,—তারা বলেছে তাদের কাহিনী। সতেরো শো লোকের সাক্ষ্য কংগ্রেস সাব-কমিটি গ্রহণ করেছিলেন। তাই বলে এই অনুসন্ধানব্রতীরা ভাবাবেগে বিচলিত হননি, বিচারবোধ থেকে বিচ্যুত হননি। প্রতিটি সাক্ষ্যকে তাঁরা তীক্ষ্ণ কঠোরভাবে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, কোনো মিথ্যা কোনো অতিরঞ্জনকে তাঁরা গ্রহণ করেননি।

গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—

পাঞ্জাবের জনগণের উপর অত্যাচারের অনুসন্ধানে যতোই আমি অগ্রসর হতে লাগলাম সরকারী যথেচ্ছাচার ও অফিসারদের উচ্ছৃঙ্খল উৎপীড়নের এমন সব ভয়াবহ কাহিনী আমি শুনতে লাগলাম, যা আমি ভাবতেও পারিনি। আমার সমস্ত মন গভীর বিষাদে ভরে গেল। আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে-প্রদেশ যুদ্ধের সময় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সবচেয়ে বেশি সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছে, সেই প্রদেশই এমনি দানবীয় বর্বরতাকে নতমুখ সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করেছে।

অনুসন্ধান-কমিটির রিপোর্ট লেখার ভারও আমার উপর পড়েছিল। পাঞ্জাববাসীদের উপর কী প্রচণ্ড উৎপীড়ন করা হয়েছিল তা এই রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। একটি কথা কেবল আমি জানাতে চাই যে এই রিপোর্টে অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জনের লেশমাত্র নেই। প্রত্যেকটি উক্তিকে সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে বিচার করে তবে গ্রহণ করা হয়েছে। বরং আমাদের হাতে যে সব সাক্ষ্যবর্ণনা ছিল, তার অতি সামান্য অংশই

রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোনো বর্ণনা সম্বন্ধে সামান্যতম সন্দেহমাত্র সেটিকে রিপোর্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত সত্য যাতে প্রকাশ পায় তাই ছিল আমাদের কাজ,—যা সত্য নয় তেমনি একটি বাক্যও আমরা এই রিপোর্টে দিইনি। এই রিপোর্ট যাঁরা পড়বেন তাঁরা বুঝবেন ক্ষমতাকে কায়েম রাখার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কতো হিংস্র হতে পারে, কতো অমানুষ কতো বর্বর হতে পারে। আমি যতো দূর জানি, এই রিপোর্টের একটি কথাও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়নি।

॥ ১৮ ॥

নিরস্ত্র ও নিরপরাধ মানুষ, দুর্ভাগা ও দুর্বল প্রজা, বয়স্ক ও শিশু,—তাদের নির্মমভাবে হত্যা করার সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা, বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে তুলনাহীন দানবীয় ব্যবহার,—অমানুষিকতার জঘন্যতম নিদর্শন। জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনা সম্বন্ধে কংগ্রের অনুসন্ধান সাব-কমিটির এই বিচার।

২৬শে মার্চ ১৯২০ কংগ্রেস সাব-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হোলো। বিদেশী শাসকের সমস্ত ভয়াল কীর্তিকাহিনী সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত হলো। সেই রিপোর্ট পড়ে ঘৃণায় দুঃখে শিহরিত হোলো সর্বজন।

এই রিপোর্টে প্রথমেই উল্লিখিত হোলো যে অমৃতসর ও অন্যত্র উচ্ছৃঙ্খল জনতার আচরণ অসমর্থনীয় ও নিন্দনীয়। কিন্তু জনতার এই উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ কী? একের পর এক ঘটনা উদ্ঘাটন করে দেখানো হোলো যে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা সার মাইকেল ও-ডায়ার সমানে যে অবিচার চালিয়ে এসেছিলেন, তাতে পাঞ্জাববাসীরা আত্মসংযম ও ধৈর্য না হারিয়ে পারেনি।

বিশেষ করে গত বছর ১০ই মার্চের অমৃতসরের ঘটনা এই রিপোর্টে আলোচিত হলো। সেদিন জনতার উপর গুলি চালানো কেন হয়েছিল? জনতা উত্তেজিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা তো কোনো হিংস্র উদ্দেশ্য নিয়ে ডেপুটি কমিশনারের কাছে যাত্রা করেনি,—যাত্রা করেছিল দুঃখ নিয়ে আবেদন নিয়ে। গুলি চালাবার আগে পর্যন্ত তারা অহিংস ছিল। তাদের বোঝানো হয়নি, তাদের সমঝানো হয়নি, তাদের উপর কোনো ন্যূনতর শক্তি প্রয়োগ করা হয়নি। অধৈর্য আগ্রহে যদি তাঁদের উপর হিংস্রতম আক্রমণ করা না হোতো, তাহলে ক্ষুব্ধ জনতাও হিংস্র প্রতিহিংসায় উদ্বুদ্ধ হোতো না।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে বলা হোলো,—এই ঘটনা মানবতার দুরপনেয় কলঙ্ক। মদগর্বিত শাসকের পাশবিকতম ব্যবহার, —ইতিহাসে যার তুলনা নেই।

কংগ্রেস সাব-কমিটি বললেন,—

সরকারকে ধ্বংস করবার জন্য ভারতবাসী যে বিপ্লব বা যুদ্ধের ব্যাপক ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পনা করেছিল, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। হাণ্টার কমিটির সামনেই এ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এমনি বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের কোনো সংগঠনের সন্ধান সারা পাঞ্জাবে বা পাঞ্জাবের বাইরে কোথাও পাওয়া যায়নি। অতএব পাঞ্জাবে সামরিক শাসন এবং তার এতো দীর্ঘ মেয়াদ অন্যায় ও অসমর্থনীয়।

সামরিক শাসনের নামে, কংগ্রেস সাব-কমিটির মন্তব্য,—পাঞ্জাবে যে অমানুষিক ব্যবহার করা হয়েছিল, সে ব্যবহার যে কোনো সুসভ্য সরকারের পক্ষে অকল্পনীয়। প্রজারা যে অন্যায় করেছিল তার শাস্তির অছিলায় বীভৎস প্রতিহিংসার তাণ্ডব সৃষ্টি হয়েছিল। আইনের নামে সমস্ত ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। প্রায় বারো শো লোকের প্রাণহানি হয়েছিল, সাড়ে তিন হাজারের উপর লোককে আহত ও তাদের মধ্যে অনেককে চিরজীবনের মতো পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল।

এমন বীভৎসতার যারা নায়ক তারা সরকারী উচ্চক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। তারাই আমাদের দেশে শ্বেতাঙ্গ শাসনের কর্তা। তারাই ও-ডায়ার, ডায়ার, জনসন, ডাভটন, ও-ব্রায়েন, বসওয়েল স্মিথ। তারা প্রত্যেকেই অপরাধী,—যে অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। তাদের অবিলম্বে অপসারিত করে তাদের অপরাধের প্রকাশ্য বিচার করা উচিত।

কংগ্রেস সাব-কমিটি ভারত সরকারকেও দায়ী করলেন। তাঁরা বললেন,—

এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষ অংশ না নিলেও চরম নিষ্ক্রিয়তার জন্যে তাঁরাও দায়ী। ভাইসরয় চোখ বুজে পাঞ্জাব

সরকারের সমস্ত কুকার্যকে সমর্থন করেছেন। জেনেশুনে জনসাধারণ ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঞ্জাব সরকারের হত্যালীলা ও অন্যান্য দুষ্কৃতিকে গোপন রেখেছেন। প্রজার দুঃখের দিকে একবারও তিনি ফিরে তাকাননি। দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে পত্র ও টেলিগ্রামযোগে কতো বিনতি জানিয়েছে,—সে সবের প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপও করেননি।

হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হোলো মাস দুই পরে। ভারত-সরকার নিজের মন্তব্য সমেত সেই রিপোর্ট লণ্ডনে ভারত-সচিবের কাছে পাঠালেন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিলাতেরও অনেক উদারমনা মানুষ এই কমিটির সংগঠনের সমালোচনা করেছিলেন। সমালোচনার কারণ এই কমিটিতে ভারতের কোনো জন-প্রতিনিধিকে নেওয়া হয়নি। ইংরেজদের মধ্যে ছিলেন সামরিক ও বেসামরিক পদস্থ সরকারী কর্মচারী। যে তিনজন ভারতীয় ছিলেন, তাঁরাও সরকারের মনোনীত ব্যক্তি,—সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত।

তবু হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট সর্ববাদীসম্মত হোলো না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইংরেজ সদস্য আর সংখ্যালঘিষ্ঠ ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে অনেক ব্যাপারেই মতের অমিল হোলো। উভয় পক্ষের বিপরীত মতকে কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করতে হোলো।

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনই যে পাঞ্জাবের বেদনাকর ঘটনাবলীর পটভূমিকা—এ বিষয়ে হাণ্টার কমিটির সকল সদস্যই একমত হলেন। গান্ধীজী যদি ৬ই এপ্রিল তারিখে ভারতব্যাপী হরতালের ডাক না দিতেন, তাহলে কিছুই হোতো না। পরাধীন ভারতবাসী হিংস্র অহিংস কোনো আন্দোলনেই যেত না,—কারণই থাকত না কোনো গণ্ডোগোলের।

জালিয়ানওয়ালাবাগ ছাড়া এবং সামরিক শাসনের আগে পাঞ্জাবের অন্যত্র যে সব গুলিবর্ষণ হয়েছিল,—যেমন অমৃতসরে, কসুরে,

গুজরানওয়ালাতে,—সেগুলি সব সদস্যই মোটামুটি সমর্থন করলেন। শান্তিরক্ষার জন্যেই প্রধানত গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল। কোনো হিংস্র প্রতিশোধমূলক পরিকল্পনা নিয়ে করা হয়নি। জনতার হিংসাত্মক ব্যবহারকে খর্ব করার জন্যে যেটুকু শাসনের প্রয়োজন, যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে যেটুকু দৃঢ় ব্যবহার প্রয়োজন, তার মাত্রা এমন কিছু ছাড়ায়নি।

পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে যে সব গণ্ডোগোল হয়েছিল, সবগুলিই স্বতঃপ্রণোদিত,—সাময়িক উত্তেজনা থেকে উদ্ভূত। এ সম্বন্ধে পাঞ্জাব পুলিসের ডেপুটি ইনসপেকটর জেনারেলের এজাহারকে সমর্থন করে বলা হোলো যে এই সব বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খলার পিছনে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানের হাত ছিল,—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তা যদি সত্য হোতো তাহলে এমনি বিপ্লববাদী প্রতিষ্ঠানের খবর পুলিসের অজানা থাকত না। পাঞ্জাবের বিশৃঙ্খলার সঙ্গে আফগান যুদ্ধের সম্পর্কের কোনো ভিত্তি নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জালিয়ানওয়ালাবাগে ডায়ার যা করেছেন তা কোনোক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রথমত তিনি গুলি চালাবার আগে নিরস্ত্র জনতাকে বারেকের জন্যেও সাবধান করেন নি, দ্বিতীয়ত তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুলি চালিয়ে ছিলেন। কোনো প্রকার সাবধানবাণী উচ্চারণ না করে সরাসরি গুলি চালাবার মতো এমন কোনো বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন তিনি হননি, বরং তিনি নিজেই তাঁর এজাহারে উল্টো কথা বলেছেন।

তাঁর হুকুম না মেনে সভা করার অপরাধে তিনি জনতার উপর সরাসরি গুলি চালাবেন এ বিষয়ে মনস্থির করে ও প্রস্তুত হয়েই তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে গিয়েছিলেন। জনতার পলায়ন আরম্ভ হবার পরও তিনি গুলি চালিয়ে সাংঘাতিক ভুল করেছিলেন। তিনি বলেছেন, তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালিয়ে এক বিপ্লব বা সেনাবিদ্রোহকে দমন করেছিলেন। তাঁর এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সেনাবিদ্রোহের তো কোনো কথাই ওঠেনা। ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে বিদ্রোহের

চিহ্নমাত্র কোথাও ছিল না। তাঁর নির্দেশে ভারতীয় সৈন্যরাই জালিয়ানওয়ালাবাগে বন্দুক ধরেছিল।

হাণ্টার কমিটির ভারতীয় সদস্যরা ডায়ারকে সহজে ছাড়লেন না। তাঁরা ডায়ারের নিজের ভাষ্যকে অবলম্বন করেই তাঁকে কঠোর ভৎ‌র্সনা করলেন। তাঁরা বললেন,—সভা করা চলবেনা, ডায়ারের এ ঘোষণা অমৃতসরে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়নি। বিশেষ করে জালিয়ান-ওয়ালাবাগ এলাকায় ডায়ারের ঘোষণা জানানোই হয়নি। ডায়ার বিনা সাবধানে নিরস্ত্র নিরীহ জনতার উপর ব্যাপকভাবে গুলি চালিয়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিলেন। গত ১০ই এপ্রিল তারিখে যারা অমৃতসরে বিশৃঙ্খলা করেছিল, তারাই যে ১৩ই তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগে জমায়েত হয়েছিল,—এ খবর তিনি পেলেন কোথা থেকে? ডায়ার যে শুধু সভা হটানোর জন্যেই গুলি ছুড়েছিলেন, তা নয়,—যতোক্ষণ না পর্যন্ত রসদ ফুরিয়ে এসেছিল ততোক্ষণ তিনি গুলি চালিয়েছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালিয়ে সারা পাঞ্জাবকে নৈতিক শিক্ষা দেবার অধিকার কে তাঁকে দিয়েছিল? ডায়ার নিজে বলেছেন,—মেশিনগান নিয়ে যেতে পারলে আরো শিক্ষা তিনি দিতে পারতেন। আবার তিনি এও বলেছেন যে গুলি না চালিয়েও তিনি সভার ভিড় সরাতে পারতেন। তাঁরই গুলির আঘাতে যারা জখম হয়েছিল তাদের শুশ্রূষার পথও তিনি বন্ধ করে রেখেছিলেন। আসলে ডায়ার পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে ব্যাপকভাবে নরহত্যা করেছিলেন। তাঁর ব্যবহার কোনো সভ্য মানুষের ব্যবহার নয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ বৃটিশ জাতির দুরপনেয় কলঙ্ক।

পাঞ্জাবের হাঙ্গামার শুরু ১০ই এপ্রিল থেকে। হাণ্টার কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা বললেন,—সেদিন জনতার অমিতাচারকে ক্ষমা না করলেও একথা ঠিক যে জনতার মনে প্রথমে হিংসাত্মক মনোভাব ছিল না। গুলি চালাবার পরই তারা পাগল হয়ে উঠে হিংসার পথে এগিয়েছিল। সেদিন তারা যে নরহত্যা ও সম্পত্তিনাশ করেছিল তা

তারা কোনো পূর্বপরিকল্পনা থেকে করেনি। অমৃতসরের বেসামরিক কর্তৃপক্ষ যেভাবে তার পরে সামরিক-কর্তার হাতে সব ভার ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাতে বোঝা যায় যে প্রজাকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো দায়িত্ববোধ তাঁরা পালন করেননি। পাঞ্জাবের হাঙ্গামা কোনো ব্যাপক রাজদ্রোহ নয়। প্রজাদের বৃটিশ-বিদ্বেষী মেজাজও ১০ই এপ্রিলের আগে দেখা যায় নি।

পাঞ্জাবের সামরিক শাসনকে কমিটির শ্বেতাঙ্গ সদস্যরা সমর্থন করেছিলেন। ভারতীয় সদস্যদের মতে এই শাসনের কোনো প্রয়োজন ছিল না,—কেননা এই শাসন যখন প্রবর্তিত হয় তখন আসল সংকটকাল কেটে গেছে। সংকট উত্তীর্ণ হবার পর শাস্তিমূলক ভাবে এই শাসন শুরু নিয়মতান্ত্রিকতার দিক থেকে অন্যায়। কেননা শাসন ও শাস্তির নামে সামরিক শাসন প্রতিহিংসামূলক হিংস্রতারই সুযোগ নিয়েছিল।

সামরিক শাসনের বিভিন্ন বর্বর বিধানকে অবশ্য কমিটির সকল সদস্যই একযোগে নিন্দা করেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের হামাগুড়ি হুকুম, জেনারেল ক্যাম্পবেল ও কর্ণেল ও-ব্রায়েনের সরকার সেলাম, কর্ণেল জনসনের ছাত্রদের ও অন্য নিরপরাধ লোকদের উপর দৈহিক অত্যাচার, ক্যাপটেন ডাভটনের প্রকাশ্য বেত্রাঘাত ও নানা প্রকারের অমানুষিক শাস্তি,—এক এক করে তাঁরা আলোচনা করেছিলেন ও নিন্দা করেছিলেন।

গুজরানওয়ালাতে ক্যাপটেন কারবেরীর বোমাবর্ষণ ও মেশিনগান থেকে গুলি চালনাকে শ্বেতাঙ্গ সদস্যরা সমর্থন করলেও নিন্দা করেছিলেন ভারতীয় সদস্যরা। সামরিক শাসনকালে এই যে সমস্ত অবিচার ও শক্তির অপব্যবহার ঘটেছিল, এ সব কথা উল্লেখ করে শ্বেতাঙ্গ সদস্যরা বলেছিলেন দায়িত্বশীল নির্দেশের অভাব ও স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা সামরিক শাসনকে অবশ্য কিছুটা কলঙ্কিত করেছিল। তবে সাধারণ ভাবে অফিসাররা যথেষ্ট সংযমের পরিচয়

দিয়েছিলেন। ভারতীয় সদস্যরা উল্লেখ না করে পারেননি যে সামরিক শাসনের এই সব অনাচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিগতভাবে পরাধীন ভারতবাসীকে হেয় করা। তাঁরা বলেছিলেন এই সামরিক শাসন ইংরেজ প্রভু আর পরাধীন ভারতবাসীর মধ্যে যে জাতিগত বিদ্বেষের আগুন জ্বেলেছে, সেই আগুন নেবানো শক্ত হবে।

জেনারেল ডায়ারের কল্পনার প্রাসাদ ভেঙে পড়ল। সেনাবাহিনীর সর্বময় কর্তা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন,—তাঁর পদোন্নতি হয়েছিল। ভারত সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে পাঞ্জাবের বিপ্লবদমনে যেসব সামরিক অফিসার নিয়োজিত হয়েছিলেন, তাঁদের সব কাজ তাঁরা সমর্থন করবেন। কংগ্রেস সাব-কমিটি যা বলে বলুক, তাতে কিছু এসে যায় না,—কিন্তু হাণ্টার কমিটি ডায়ারকে বিন্দুমাত্র সমর্থন করলেন না, তাঁর প্রত্যেক কাজের নিন্দা করলেন। ভারত সরকার হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট ইংল্যাণ্ডে ভারত-সচিবের কাছে পাঠাবার সময় মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন,—

সমস্ত ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণভাবে পর্যালোচনা করে আমরা স্থির ধারণা করেছি যে জেনারেল ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করেছিলেন,—যেকোনো সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক যা করত, তার থেকে অনেক বাড়াবাড়ি তিনি করেছিলেন। তিনি মানবতার বিরোধী কাজ করেছিলেন,—যার ফলে বহু লোকের নিরুপায় প্রাণহানি হয়েছিল। জেনারেল ডায়ারের কৃতিত্বপূর্ণ সৈনিক-জীবনের রেকর্ড আমরা লক্ষ্য করেছি, সম্প্রতি আফগান যুদ্ধে তাঁর অবদানকেও আমরা ভুলিনি। তবুও জালিয়ানওয়ালাবাগে তিনি যা করেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়, এবং তাঁর সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে কমাণ্ডার-ইন-চীফকে নির্দেশ দেওয়া হোক।

জেনারেল ডায়ারের প্রতিটি কাজকে অকুণ্ঠভাবে যদি কেউ সমর্থন করে থাকেন, তিনি পাঞ্জাবের গভর্ণর সার মাইকেল ও-ডায়ার।

শেষদিন পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করেছিলেন ও এই বিশ্বাসকে যখনই সুযোগ পেয়েছেন ঘোষণা করেছেন যে জালিয়ানওয়ালাবাগে ডায়ার যে মহৎ কাজ করেছিলেন তার কোন তুলনা নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ডায়ারই রক্ষা করেছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ যদি না ঘটত, তাহলে ভারতে এক মহাবিপ্লবের দুর্যোগ ঘনিয়ে আসত, যে দুর্যোগের আঘাতে ইংরেজের ভারত সামাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু সার মাইকেল ও-ডায়ারের এই ভাষ্যে ভারত সরকার সায় দেননি,—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও মানতে পারেননি।

সামরিক সর্বাধিনায়ক সার চার্লস মনরোর কাছ থেকে নির্দেশ পেলেন ডায়ার। নির্দেশ এই,—তিনি যেন অবিলম্বে কর্মত্যাগের জন্যে দরখাস্ত করেন। ডায়ার বুঝলেন, আর তাঁর কিছু করার নেই। এ নির্দেশ তাঁকে মানতেই হবে। তিনি যদি কর্মত্যাগের দরখাস্ত না করেন, তাহলে তাঁকে কর্মচ্যুত করা হবে।

২৭শে মার্চ ১৯২০ সাল,—জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সাড়ে এগারো মাস পরে জেনারাল ডায়ার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর পদত্যাগের আবেদনপত্র পেশ করলেন। তিনি লিখলেন,—

সম্প্রতি আমি দিল্লী গিয়েছিলাম। তখন ভারতের আডজুট্যাণ্ট জেনারাল আমাকে জানান যে, গত ১৯১৯ সালে অমৃতসরে আমার কার্যাবলীর যে সমালোচনা হাণ্টার কমিটি করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার পক্ষে পদত্যাগ করাই শ্রেয়। আমি বর্তমানে পঞ্চম পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের দায়িত্ব বহন করছি। এই দায়িত্ব ও সামরিক কর্তব্যভার থেকে আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক,—এই আবেদন আমি করছি।

আবেদন মঞ্জুর হতে বিলম্ব হোলো না। জালন্ধর স্টেশনে অধস্তন সামরিক কর্মচারী ও সৈনিকরা তাঁর বিদায়-সম্বর্ধনায় যোগ দিল। ডায়ার ও তাঁর স্ত্রী বোম্বাই থেকে জাহাজে উঠলেন। ২রা মে তাঁরা ইংল্যাণ্ডে পৌঁছলেন। ডায়ার আর ভারতবর্ষে ফিরে আসেননি।

॥ ১৯ ॥

ইংরেজ জাত উদারতম সাম্রাজ্যবাদী জাত। তার সাম্রাজ্য অনুন্নত কৃষ্ণ পৃথিবীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে শ্বেতকায় জাতির মহান্ দায়িত্বের স্বরূপ। সেই দায়িত্বেরই প্রতিভূ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিন্যাল্ড ডায়ার।

তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেননি। হাণ্টার কমিটির ইংরেজ বিচারকরা তাঁর বিচার করেছে, ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার তাকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেছে। ডায়ারকে অবশ্য কোনো প্রত্যক্ষ শাস্তি দেয়নি। যে ভারতবর্ষে তিনি জন্মেছেন, যে ভারতবর্ষে তাঁর সমস্ত কর্মজীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন, সেই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে যাবার অনুমতি ও সুযোগ তাঁকে দিয়েছে। ইংল্যাণ্ডের উদার পরিবেশে তিনি তার অন্যায়কে উপলব্ধি করুন, অনুশোচনার তর্পণে তিনি মালিন্যমুক্ত হোন,—শান্তিতে অতিবাহিত করুন অবশিষ্ট জীবন।

কিন্তু শ্বেত সাম্রাজ্যবাদ মর্মান্তিক,—ঘৃণা আর বর্ণবিদ্বেষ তার ভিত্তি, পাশবশক্তি আর অমানুষিক শোষণ তার অস্ত্র। সাউদামটন বন্দরে পা দেবার সঙ্গে সারা ইংল্যাণ্ড ডায়ারের নামে জয়ধ্বনি করে উঠল। আবার তিনি সেই প্রহরের বীর। হাণ্টার কমিটি যা বলে বলুক, ভারত সরকার তাঁর বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থাই নিক,—ইংরেজ অকৃতজ্ঞ নয়, ইংরেজ ডায়ারকে ভুলবে না। তিনি বিদেশে কৃষ্ণকায় গুণ্ডাদের হাত থেকে বিপন্ন ইংরেজ নরনারীকে রক্ষা করেছেন, কৃষ্ণকায় বিপ্লবী প্রজাদের শায়েস্তা করে ইংরেজের সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন ইংরেজ মহিলার অসম্মানে তাঁর প্রাণ কেঁদেছে,—সে কান্না শুধু চোখের জল নয়,—অগ্নিবর্ষী শাস্তি। ধন্য ডায়ার,—তিনিই সুদূর ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা। গুণগ্রাহী বন্ধুর দল ডায়ারকে ঘিরে ধরল।

বৃটিশ পার্লামেণ্টে দাবী উঠল,—জেনারেল ডায়ারের প্রতি সুবিচার করা হোক। ডায়ার ইতিমধ্যে হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়লেন,—তারপর আপীল করলেন বৃটিশ আর্মি কাউন্সিলের সমীপে। হাণ্টার কমিটির সামনে যে অবিমৃষ্যকারিতা করেছিলেন,—এবার আর তা করলেন না। আইনজ্ঞের পরামর্শ নিলেন। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন ইংল্যাণ্ডের দুজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার।

আর্মি কাউন্সিলের কাছে সুদীর্ঘ লিখিত বিবৃতিতে ডায়ার অনেক নতুন যুক্তি দিলেন। আফগান আক্রমণ আর ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক প্রস্তুতির কথা ফলাও করে বললেন। ১০ই এপ্রিলের জনতা আর জালিয়ানওয়ালাবাগের জনতা যে একই ছিল,—একই রকম মারমুখী আর ধ্বংসকামী,—অল্প স্বল্প উপায়ে সেই জনতাকে শাসন করা যেত না, বরং কড়া না হলে বৃটিশ ও ভারতীয় আরো শান্তিকামী নরনারীকে তারা নির্বিচারে হত্যা করত, আগুন লাগিয়ে তাদের ছারখার করত,—তা তিনি বললেন। আরো বললেন যে, জালিয়ানওয়ালাবাগে তার বন্দুকধারী দেশী সৈন্যরা খুব অভিজ্ঞ ছিল না, জনতা তাঁর সৈন্যদলকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছিল,—সে অবস্থায় যেভাবে তিনি জনতাকে দমন করতে পেরেছিলেন তাতে তাঁর প্রশংসা পাওয়ার কথা। তাঁর কাজের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা তাঁর কাজের সুফল। জালিয়ানওয়ালাবাগ মৃদুতম সামরিক সংঘর্ষ। এর ফলে ভারতে বৃটিশ শাসনের টলায়মান বনিয়াদকে আবার তিনি সুদৃঢ় করেছেন।

আর্মি কাউনসিলের সিদ্ধান্ত বৃটিশ পার্লামেণ্টের সামনে উপস্থাপিত হোলো। তাঁরা ডায়ারের যুক্তি মানলেন না। হাণ্টার কমিটির রিপোর্টকে তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারত সরকার ও ভারতের সামরিক সর্বাধিনায়কের মতকে না মানার কোনো কারণ খুঁজে তারা পাননি। ভারতের সামরিক বিভাগ ডায়ারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। বৃটিশ সামরিক বিভাগেও তাঁকে ভবিষ্যতে কোনো পদ দেওয়া হবে না। অর্ধেক বেতনের পেনসন নিয়ে তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হবে।

রক্ষণশীল গোষ্ঠী ডায়ারের সমর্থনের জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। কিছু সংসদীয় দল সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন। আসলে কমনস্ সভায় ১২৯ জন সদস্য ডায়ারের পক্ষে ভোট দিলেন। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সরকারী নির্দেশ পাশ হোলো। লর্ডস্ সভায় অবশ্য ডায়ার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সম্বর্ধিত হলেন।

এবার জনসম্বর্ধনা। ডায়ার কর্তব্যনিষ্ঠ সৈনিক, ডায়ার অকুতোভয় বীর। তিনি বৃটিশ ভারতের পরিত্রাতা। বৃটিশ সরকার তাঁর উপর অবিচার করেছে,—সেই অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করুক বৃটিশ জনগণ! পুরস্কৃত করুক তাদের ভাগ্যহত পরিত্রাতাকে। সৃষ্টি হোলো ডায়ার তহবিল।

ভারত-ত্রাতার এই তহবিলে প্রথম দান করলেন সার মাইকেল ও-ডায়ার। বারো ঘণ্টার মধ্যে পাঁচশো পাউণ্ড জমা পড়ল। স্বনামে বেনামে হাজার হাজার লোক টাকা পাঠাতে লাগল,—আর হাজার হাজার সম্বর্ধনা আর সমবেদনাভরা চিঠি। বৃটেনবাসীরা ডায়ারকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিল,—এক মাসের মধ্যে তাঁর হাতে উপঢৌকন দিল ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ডের বেশি। এই সম্পদের স্বপ্নও কখনো ডায়ার দেখেননি।

আর অমৃতসরের সেই মিশনারী শিক্ষাব্রতিনী, মিস মারসেলা শেরউড,—কড়ে ওয়ালা গলিতে যিনি নিগৃহীত হয়েছিলেন,—ভারত সরকার তাঁকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছিলেন। সে অর্থ তিনি স্পর্শও করেননি। বলেছিলেন,—আমি জানি ভারতবাসী রাগ করে আমাকে মেরেছে, আবার ভারতবাসীই ভালবেসে আমাকে উদ্ধার করেছে।

ডায়ার দীর্ঘজীবী ছিলেন না। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে তিনি কর্মচ্যুত হন, তারপর সাত বছর তিনি জীবিত ছিলেন। ইংলণ্ডবাসের কয় বছরের মধ্যেই তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগকে ভুলতে পারেননি,—শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি ঠিকই করেছিলেন।

ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ডের চেকের সঙ্গে তহবিলের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন ডায়ার। চিঠিতে লেখা ছিল,—

আপনার দেশবাসীরা আপনার বীরত্বপূর্ণ কাজকে যে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছে তার প্রমাণস্বরূপ এই উপহার আপনাকে আমরা পাঠালাম। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে বৃটিশ সাম্রাজ্য আপনার কাছে যে-ঋণে ঋণী, অর্থ দিয়ে তার পরিশোধ হয় না।

ডায়ার উত্তর দিয়েছিলেন,—

আমার দেশবাসী এতো সংখ্যক নরনারী আমাকে সমর্থন করেছেন জেনে আমি প্রভূত গর্ববোধ করছি। আমার দৃঢ়:বিশ্বাস, এবং সে বিশ্বাস একটুও শিথিল হয়নি যে আমার যা কর্তব্য তাই আমি করেছিলাম। শুধু সামরিক অবস্থার প্রয়োজনে সে কর্তব্য আমি করিনি,—করেছিলাম শান্তির প্রয়োজনে, ব্যাপকভাবে জীবনরক্ষার প্রয়োজনে। যে নিরুপায় কঠোর কর্তব্য আমাকে করতে হয়েছিল, তা আমার পক্ষেও ভয়ানক,—কিন্তু আজ সহস্র দেশবাসীর সহানুভূতি ও সমর্থন আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করল ও ভাগ্যের এই গভীর বঞ্চনায় আমাকে সান্ত্বনা দিল।

তারপর সাত বছর অবসর জীবন। জীবনের এই বাকি সাতটি বছর তাঁর সচ্ছলতায় কেটেছিল,—কিন্তু শান্তিতে কাটেনি। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের কাহিনী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল, ধিক্কার উঠেছিল সারা পৃথিবী থেকে। সেই ধিক্কার তাঁর কানেও এসেছিল। দেহ তাঁর ব্যাধিগ্রস্ত, সেই ধিক্কারের নীরব প্রতিবাদে দিনে দিনে মন তাঁর অবসন্ন।

১৯২১ সালে তিনি এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। গ্লোব পত্রিকায় সেই প্রবন্ধ ছাপা হোলো।

প্রবন্ধের নাম—আত্মহত্যার পথে ভারত। এই প্রবন্ধে তিনি লিখলেন,—

সারা ভারত জুড়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করবার এক মহাচক্রান্ত চলেছে,—এই চক্রান্তের নায়ক গান্ধী আর তার দলবল। সাধারণ ভারতবাসী এখনো এই চক্রান্তের পথে পা বাড়ায়নি। তারা বৃটিশ রাজকে চায়। তারা মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে যে বৃটিশরাজ নিষ্কলঙ্ক, ন্যায়পরায়ণ ও শক্তিশালী। বৃটিশ অফিসার মাত্রকে তারা সাহেব বলে সম্মান করে,—যে সাহেব তাদের প্রতি কোনো অন্যায় করবে না বরং সকল বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করবে।

সেই বৃটিশরাজের ন্যায়বিধানকে যদি কথায় কথায় অমান্য বা অসম্মান করা হয়, আর তাতে যদি কর্তৃপক্ষ সায় দেন, তাহলে রাজশক্তি পঙ্গু হবে,—আর সেই সুযোগে যারা চরমপন্থী—তারা তাদের কাজ হাসিলের পথে এগোবে। আমাদের ধর্মে দশটি কম্যাণ্ডমেণ্ট আছে, একাদশ কম্যাণ্ডমেণ্ট ভারতে প্রয়োগ করা উচিত—তা হোলো, আন্দোলন করবে না। যারা আন্দোলন করতে চায়, তারা শাসন করতে জানে না। তারা ঝড়কে জাগাতে চায়, যে ঝড়কে নিয়ন্ত্রণ করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। এ আন্দোলনের ফলে যে রক্তপাত হবে তাতে প্রথমে ঐ আন্দোলনকারীরাই মরবে,—ঐ গান্ধী আর তার দলবল।

ভারতবাসীরা স্বরাজ চায় না, স্বরাজ বোঝে না। জন্মজন্ম ধরেও তারা স্বরাজের জন্যে উপযুক্ত হবেনা। তবু যদি তারা স্বরাজের জন্য আন্দোলন করে বৃটিশরাজকে রাগিয়ে তোলে, তাহলে রক্তের সমুদ্র বইবে। তা হবে ভারতবাসীর আত্মহত্যার নামান্তর। বিপথগামী রাজনৈতিক আন্দোলনকারী আর দুর্বল বৃটিশ অফিসার,—উভয়েই এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী হবে। তাই আজ সমস্ত বৃটেনবাসীকে কঠোর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে,—কোনো রাজনৈতিক অছিলায় ভারতের ছোট বড়ো শাসক-সাহেবদের যেন তারা দুর্বল না করে ফেলে।

এই প্রসঙ্গে ডায়ার ১৯১৯ সালের অমৃতসরের ঘটনা উল্লেখ করে লিখলেন,—

আমাদের মহাভাগ্য যে পাঞ্জাবে আমরা তখন দুর্বল হইনি। আমরা শক্ত হাতে কাজ করেছিলাম। বৃটিশরাজকে ধ্বংস করার সুপরিকল্পিত বিদ্রোহকে আমরা নির্দ্বিধায় দমন করতে পেরেছিলাম।

এই প্রবন্ধ থেকে লেখকের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে।

এই প্রবন্ধ রচনার কয়েক মাসের মধ্যেই ডায়ার সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হলেন ও পক্ষাঘাতে অচল হয়ে পড়লেন। ১৯২৪ সালে সার মাইকেল ও-ডায়ার ইংল্যাণ্ডে সার শঙ্করণ নায়ারের বিরুদ্ধে এক মানহানির মামলা করেন। সার শঙ্করণ নায়ার এক গ্রন্থে পাঞ্জাবে কুশাসনের জন্যে সার মাইকেল ও-ডায়ারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় লিখেছিলেন। সেই নিয়েই এই মামলা।

এই মামলার ব্যাপারে জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা ওঠে। বৃটিশ বিচারপতি তাঁর রায়ে উল্লেখ করেন যে জালিয়ানওয়ালাবাগে ডায়ার উচিত কাজই করেছিলেন,—এবং তাঁর মতে তাঁকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

এই রায়ের কথা ডায়ারকে শোনানো হয়। কিন্তু তখন তিনি কালব্যাধিগ্রস্ত। মনেহয় এই রায় শুনে তিনি হয়তো কিছুটা শান্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের ডায়ার-প্রেমিকরা উৎসাহিত হয়। বৃটিশ পার্লামেন্টে হৈ-চৈ ওঠে। বৃটিশ বিচারপতির মতের প্রতি সম্মান জানিয়ে ডায়ারের ব্যাপারটা আবার তদন্ত করা হোক ও তাঁর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তা ক্ষালন করা হোক। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় ভাষায় এই দাবীকে দমন করেন।

একজন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ঐতিহাসিক ডায়ারের বর্বরতাকে ক্ষালন করতে চেয়েছেন এই বলে যে, জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে বার হবার যে অন্য কোনো পথ ছিল না তা তিনি জানতেন না। একথা

জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে এসেই তিনি নাকি অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার মাইলস্ আরভিংকে বলেছিলেন।

ডেপুটি কমিশনার মাইলস্ আরভিং নিজে জালিয়ানওয়ালাবাগে ডায়ারের অভিযানের সঙ্গী হননি। কিন্তু অমৃতসর পুলিসের বড় কর্তারা ডায়ারের সঙ্গে গিয়েছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ তাঁদের অজানা ছিল না। তাঁরা যখন দেখেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের বদ্ধ খাঁচার মধ্যে পুরে নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিবর্ষণে ডায়ার শত শত প্রজাকে হত্যা করছেন, তখন কি তাঁরা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়েছিলেন? বন্দুকধারী সৈন্যদল আর সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে ডায়ার যখন জালিয়ানওয়ালাবাগে চলেছিলেন, তখন কি তাঁদের সঙ্গে ডায়ারের বাক্যালাপ বন্ধ ছিল? তাঁর এই চমৎকার অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে ডায়ার কি অমৃতসরের স্থানীয় পুলিশ ও সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো আলোচনাই করেননি?

বৃটিশ ঐতিহাসিকের মতে ডায়ারের ধারণা ছিল যে বাগ থেকে বার হবার অন্যান্য রাস্তা ছিল। তাই ডায়ার এতোক্ষণ ধরে গুলি চালিয়েছিলেন। জহরলাল নেহরু এই উক্তির সমালোচনা করে বলেছেন,—

ডায়ারের যদি এই ধারণা সত্য হোতো, আর সত্যিই যদি বাগ থেকে বার হবার আরো অনেক পথ থাকত, তাতেও ডায়ারের অপরাধ ও দায়িত্ব লাঘব হোতো না। তাছাড়া এমনি ধারণা কেমন করে ডায়ারের হয়েছিল, তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। বাগের সামনের উঁচু চাতালে, যেখান থেকে তিনি গুলিবর্ষণ করেছিলেন, সেখানে যে কেউ দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বাগটা তার চোখে পড়বে,—চারদিকে উঁচু উঁচু বাড়ি দিয়ে ঘেরা, কোথাও কোনো ফাঁক নেই—এক লহমাতেই সে তা দেখতে পাবে। একমাত্র একদিকে প্রায় একশো ফুট লম্বা একটা জায়গায় কোনো বাড়ি নেই,—তার বদলে পাঁচ ফুট উঁচু পাঁচিল আছে। গুলিবর্ষণে যখন লোক দলে দলে

মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল, তখন পালাবার কোনো পথ না পেয়ে হাজার হাজার ভয়ার্ত লোক সেই পাঁচিল টপকে পালাবার চেষ্টা করেছিল। তখন সেই পাঁচিল লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল যাতে লোক পাঁচিল পার হয়ে পালাতে না পারে। সেই পাঁচিলের গায়ে অসংখ্য গুলির দাগ এখনো রয়েছে। হত্যাকাণ্ড যখন শেষ হোলো তখন সেই পাঁচিলের এপারে ওপারে অসংখ্য মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে ছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে কংগ্রেস সাব-কমিটির রিপোর্ট ভরা। সেই রোমহর্ষক বিবরণ পড়লে আজও শরীর শিউরে ওঠে। বাগের মধ্যে সামনে পিছনে এপাশে ওপাশে শত শত হতাহত মানুষের দেহ। পিছনে পাঁচিলের গোড়ায় আর সামনে প্রবেশপথে মৃতদেহের পাহাড়। কূপটি নরদেহে ভর্তি। অন্তত কয়েকশত দেহ বাগের বাইরের গলিতে গড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে বয়স্ক আছে, বৃদ্ধ আছে, শিশুর সংখ্যাও শতশত। গুলির আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরেছে। গুলি লেগেছে মাথায়, মুখে, বুকে, পেটে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। এক এক জনের দেহ একাধিক গুলিতে ঝাঁঝরা। কোথাও আলিঙ্গনবদ্ধ দুটি দেহ,—বাপ আর সন্তান,—দুজনেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া। অনেকে তখনো মরেনি,—বাগের মধ্যে ছটফট করছে, বাগের বাইরের গলিতে কাতরাতে কাতরাতে বুকে হেঁটে এগোচ্ছে। সারা পল্লী আহত মুমূর্ষুর আর্তনাদে মুখর। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটছে। শেষ অঞ্জলির আশায় নালার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ঘা-খাওয়া আধমরা মানুষ।

দশ মিনিট মাত্র সময়,—তার মধ্যে কতো স্ত্রী হারালো তার স্বামী, কতো মাতা হারালো তার সন্তান, কতো লোক হারালো তার প্রিয় পরিজন। শুধু অমৃতসর শহরের অধিবাসী নয়,—আশপাশের গ্রাম থেকে এসেছিল কয়েক হাজার লোক। তারা এসেছিল অমৃতসরের

বৈশাখী মেলায়। নিষেধ-ঘোষণা তাদের কানে পৌঁছায়নি। তারা শহর-বাসীদের সঙ্গে দলে দলে এসেছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের সভায়,—পিঠে পুঁটুলি আর কাঁধে শিশুসন্তানকে নিয়ে। তাদের অনেকেই ফিরে গেল না তাদের গ্রামে, তাদের সংসারে,—এই জালিয়ানওয়াল-বাগের রক্তকাদাভরা মাটিতে জন্মের মতো তারা রয়ে গেল।

অমৃতসরের স্থানীয় কর্তা ছিলেন মাইলস্ আরভিং। তিনি সেখানকার ডেপুটি কমিশনার। স্থানীয় অধিবাসীদের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে তার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। গভর্ণর সার মাইকেল ও-ডায়ারের গোপন নির্দেশে মিথ্যা আমন্ত্রণে তিনিই ডাক্তার কিচলু ও ডাক্তার সত্যপালকে গ্রেপ্তার করে অমৃতসরে অশান্তির আগুন জ্বেলেছিলেন। অমৃতসরের প্রজা সম্বন্ধে হাণ্টার কমিটির সামনে তিনি স্বীকার করেছিলেন,—

লোকগুলোর কী মতলব ছিল তা আমি আগে থেকে বুঝতে পারিনি। তবে এ ধারণা আমার হয়েছিল যে আন্দোলনের নেতারা জনসাধারণকে এক সুশৃঙ্খল অহিংস আইন অমান্যের জন্যে প্রস্তুত করছিলেন যাতে সরকার অচল হয়ে পড়ে। তাঁরা আন্দোলনকে এমনভাবে পরিচালনা করতে চাইছিলেন যাতে সরকারের সঙ্গে এমন কোনো সংঘর্ষ না হয়, যার ফলে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ঘটে।

অথচ আতঙ্ক আর দুর্বলতার বশে সামরিক হস্তক্ষেপকে অভ্যর্থনা করেছিলেন আরভিং নিজেই। ডায়ারের মতো নরঘাতকের হাতে তিনি তাঁর কর্তৃত্বকে সমর্পণ করেছিলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে বার হবার একাধিক পথ ছিল কি ছিল না,—তা ডায়ারের চোখে পড়েনি। চোখে পড়বার কথাও নয়। মাইলস্ আরভিং যা ধারণা করেছিলেন,—ডায়ারও স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাই। জনতা আইন অমান্য করেছে,—তারা সরকারী হুকুম না মেনে সভা করতে এসেছে,—কিন্তু তারা অহিংস। ডাণ্ডাফৌজ

গড়বার জন্যে হাজার-হাজার লাঠি নাকি ট্রেনে করে অমৃতসরে চালান হয়েছিল,—কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের জনতার একজনেরও হাতে লাঠি নেই।

দশ মিনিট ধরে শান্ত মাথায় স্থির দৃষ্টিতে ডায়ার প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই ভয়াল নৃশংস হত্যালীলা যার তিনি নায়ক। তাঁর বন্দুকের নির্ঘোষকে ছাপিয়ে অপরাহ্ণের রক্তিম আকাশ ভরে উঠেছিল আর্তনাদে আর কান্নায়,—দুকান ভরে তিনি তা শুনেছিলেন। সেই দৃশ্য চোখ থেকে মোছেনি,—সেই আর্তনাদের প্রতিধ্বনি শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কানে বেজেছে। দেহ যখন পঙ্গু, মস্তিষ্ক যখন অনড়, চেতনা যখন বিভ্রান্ত,—তখনো ডায়ার বলে চলেছেন,—

আমি ঠিক করেছি, ঠিক করেছি।

এ না বলে তাঁর উপায় ছিল না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনুশোচনার সঙ্গে যুদ্ধ না করে তাঁর পরিত্রাণ নেই।

॥ ২০ ॥

গান্ধীজী বলেছেন,—

অমৃতসরেই আমি প্রথম কংগ্রেসে প্রবেশ করলাম।

১০ই মার্চ ১৯১৯ অমৃতসরে তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ পরীক্ষার রূঢ় পদস্খলন, তার তিন দিন পরে অমৃতসরে শাসকের ভয়াল সহিংস প্রতিশোধ।

গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—

১০ই মার্চের জন্যে পাঞ্জাব-গভর্ণর আমাকে দায়ী করেছেন,—১৩ই মার্চের জন্যে আমাকে দায়ী করেছে পাঞ্জাবের তরুণ সম্প্রদায়।

সত্যিই,—গান্ধীজীই তো দায়ী। হাণ্টার কমিটিও তো সেই কথাই বলেছেন। গান্ধীজী যদি সত্যাগ্রহের আহবান না দিতেন তাহলে জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটত না, পাঞ্জাবে সামরিক শাসন কায়েম হোতো না।

ব্যর্থতার চিহ্নমাত্র দেখার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করলেন। পিছিয়ে এলেন কাপুরুষের মতো। নিলর্জ্জের মতো স্বীকার করলেন যে হিমালয়সদৃশ ভুল তিনি করেছেন।

এ কি নেতার ব্যবহার, নেতৃত্বের লক্ষণ? নেতা কখনো ভুল করবেন না, কখনো ভুল স্বীকার করবেন না। ভুল স্বীকার দুর্বলতার পরিচায়ক, পশ্চাৎবর্ত্তিতার প্রতিচ্ছায়া। নেতার পক্ষে আত্মহত্যার নামান্তর।

গান্ধীজীর চরিত্রের এ এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। তিনি নিজেকে কখনো বড়ো ভাবেননি,—সমান বড়ো ভেবেছেন প্রতিপক্ষকে। তিনি নিজের ভুলকে বড়ো করে বলেছেন,—অপরের ভুলের দিকে আঙুল দেখাননি। নিজের দুর্বলতাকে গোপন করেননি,—মুখর হয়েছেন আত্মসমালোচনায়। গান্ধীজী সহজ গণতন্ত্রের সাধারণ মানুষ

হিসেবে থেকেছেন চিরদিন,—অমিতশক্তি অভ্রান্ত একনায়ক হতে কখনো চাননি।

কিন্তু এমনি চরিত্রের লোক কি নেতা হতে পারে? জনগণের উপর নৈতিক প্রভাব সে কেমন করে বিস্তার করবে, কেমন করে সে অর্জন করবে জনগণের নির্ভর ও আস্থা? কে তাকে বিশ্বাস করবে, কে তাকে মানবে?

অভ্রান্ত ছিলেন ডায়ার,—পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসী। তিনি সারা পাঞ্জাববাসীর মনে নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালিয়েছিলেন, অমৃতসরে তাণ্ডব শাসন প্রয়োগ করেছিলেন।

সেই অমৃতসরে গান্ধীজী এলেন,—বিভ্রান্ত পরাজিত বিপ্লবী,—হতোদ্যম হীনবল। বন্ধু নেই পাশে, সৈন্য নেই পিছনে,—ভয়ার্ত সন্দিগ্ধ জনতার কাছে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন।

মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠল। কে একজন অস্ফুটস্বরে বললে,—গান্ধীজী কি জয়!

মুহূর্ত মধ্যে শতশত লোকের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হোলো সেই জয়ধ্বনি,—

গান্ধীজী কি জয়!

সেই বছর শীতকালে কংগ্রেসের অধিবেশন হোলো অমৃতসরে। সর্বভারতের শ্রেষ্ঠ জননেতারা যোগ দিলেন এই অধিবেশনে। লোকমান্য তিলক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, মহম্মদ আলি জিন্না, বিপিনচন্দ্র পাল, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। সভাপতি মতিলাল নেহরু। নিখিল ভারত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরা এলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের কাহিনী সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন কজন?

সুদূর উত্তর-পশ্চিমের অমৃতসর শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় কিছুটা খোলা জমি,—এবড়ো খেবড়ো, নোংরা। অমৃতসরবাসীরাই অনেকে জানে না। অমৃতসরে একমাত্র দর্শনীয় স্বর্ণমন্দির।

সারা ভারতবর্ষের জনপ্রতিনিধিরা এবার গেলেন ঐ অখ্যাত অজ্ঞাত জালিয়ানওয়ালাবাগে,—শোকস্তব্ধ মুখে, নতশিরে, নগ্ন পদে। অশ্রু-সজল চোখে তাঁরা দেখলেন সেই ম্লান গম্ভীর শহীদ-তীর্থ—সেখানকার মাটিতে মাত্র ক-মাস আগে হিন্দু-মুসলমান-শিখ দেশবাসীর রক্ত এক হয়ে মিশেছে।

কতো রক্ত ঝরেছিল জালিয়ানওয়ালাবাগে? তার কোনো মাত্রা নেই। কতো লোক মরেছিল? তার কোনো হিসাব নেই।

ঘটনার প্রায় চার মাস পরে সরকার থেকে মৃত্যুসংখ্যার হিসাব করা হয়। সেই হিসাব অনুসারে মৃতের সংখ্যা ২৯০ জনের বেশি নয়। পাঞ্জাব বণিকসভার সহ-সভাপতি লালা গিরিধারীলাল এক পাশের বাড়ির ছাদ থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখেন। হত্যাকাণ্ড সমাধা হবার পর তিনিই প্রথম বাগের মধ্যে ঢোকেন। তাঁর মতে তখন অন্তত হাজার মৃতদেহ সেখানে পড়েছিল। এলাহাবাদ সোশ্যাল সারভিস লীগ অমৃতসরের পরিবারে পরিবারে খোঁজ করে ৩৭৯টি মৃত্যুর তালিকা প্রস্তুত করেন এবং এই তালিকা নির্ভরযোগ্য বলে হাণ্টার কমিটি গ্রহণ করেন। এই তালিকাকে সম্পূর্ণ না মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সেদিন গ্রামাঞ্চল থেকে বহু লোক বৈশাখী মেলা উপলক্ষে অমৃতসরে এসে জালিয়ানওয়ালাবাগের সভায় যোগ দিয়েছিল। তাদের মৃত্যুর পুরো হিসেব নেই।

মরেছিল নাম জানা আর নাম-না-জানা নিরীহ লোক। তাদের রক্ত দিয়ে তারা সেই ঊষর প্রান্তরে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত করে দিয়ে গেল। অমৃতসর কংগ্রেস উপলক্ষে সারা ভারতের জনপ্রতিনিধিরা সেই শহীদ ক্ষেত্রে এলেন,—শহীদদের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন।

অমৃতসর কংগ্রেসের সভাপতি হলেন মতিলাল নেহরু। তিনি পাঞ্জাবের হৃদয়ক্ষতের করুণ বর্ণনা দিলেন, কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিলেন বৃটিশ সরকারকে, ওজস্বিনী কণ্ঠে দেশের সমস্ত জাতীয়তাবাদীকে আহবান করলেন কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হবার জন্যে। পাঞ্জাবে সামরিক শাসনের সমালোচনা ও জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘৃণ্য বর্বরতার প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ,—কংগ্রেস অধিবেশন জুড়ে বিভিন্ন নেতার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হোলো।

আর এলেন গান্ধীজী। নেতারূপে নয়,—সাধারণ প্রতিনিধি হয়ে। কংগ্রেসের পূর্ববর্তী কয়েকটি বার্ষিক অধিবেশনে তিনি যেমন এসেছিলেন, এবারও তেমনিই এলেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে এতোদিন গান্ধীজীর কোন যোগ ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের কথা সর্বদা তাঁর মনে জেগে থাকত। আগেকার কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের কথাই বলতেন।

এখনো তিনি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় গোষ্ঠীর বাইরে। তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন কংগ্রেসের আন্দোলন নয়। এই আন্দোলনে তিনি কংগ্রেসের সমর্থন চাননি, কংগ্রেসকে ডাকেননি। তাছাড়া তিনি ব্যর্থ আন্দোলনের পরাজিত নেতা। নিজে থেকেই সে আন্দোলন তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন।

স্বভাবসুলভ বিনম্র স্তব্ধতার সঙ্গে গান্ধীজী অধিবেশনে যোগ দিলেন। সভ্যরা অনেক আগ্রহে উৎসাহে তাঁকে সম্বর্ধিত করলেন। প্রতিটি লোক তাঁর নামে জয়ধ্বনি করল। সেই ধ্বনি কংগ্রেস-প্রাঙ্গন থেকে উত্থিত হয়ে সারা ক্রমে ভারতে প্রতিধ্বনিত হোলো,—

গান্ধীজী কি জয়।

অমৃতসর অধিবেশনে কংগ্রেস জাতীয় নেতৃত্বে গান্ধীজীকে বরণ করে নিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার পর বৎসর রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ড ভ্রমণে যান। তখন বৃটিশ পার্লামেণ্টে জালিয়ানওয়ালাবাগ সম্বন্ধে আলোচনা চলেছে। বৃটিশ নরনারী ডায়ারকে সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা বলে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। আর এই ডায়ারের অমানুষিকতার প্রতিবাদেই বৃটিশ ভারতের শ্রেষ্ঠতম প্রজা নোবেলপুরস্কার-বিভূষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘৃণায় ও ধিক্কারে বৃটিশ সরকারের দেওয়া নাইট-পদবী পরিত্যাগ করেছেন।

বৃটিশ পার্লামেণ্টে ডায়ারের প্রশংসাসূচক যেসব আলোচনা হয়েছিল, লর্ডস সভা যে নির্লজ্জ অহমিকার সঙ্গে ডায়ারকে সমর্থন করেছিল তাতে প্রতিটি ভারতীয়ের মন তিক্ততায় ভরে গিয়েছিল। বৃটিশ ন্যায়বিচারের প্রতি এতো অবিশ্বাস ইতিপূর্বে এতো বাঙ্ময় কখনো হয়নি। রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন থেকে অ্যানড্রুজকে লিখলেন,—

ভারতের প্রতি এ দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের প্রকৃত মনোভাব নিদারুণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে পার্লামেণ্টের উভয় সভাতেই ডায়ার সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আলোচনা ও বিতর্কমূলে। এর থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এদেশে যাঁদের মধ্য থেকে আমাদের শাসনকর্তারা নির্বাচিত হন, তাঁদের কর্মকর্তারা আমাদের উপর যতো দানবীয় অত্যাচার করুক না কেন, তাতে তাঁদের মনে কোনো বিক্ষোভের সঞ্চার হয় না। তাঁদের বক্তৃতায় পাশবিকতা যে নির্লজ্জভাবে প্রশ্রয় পেয়েছে এবং সে পাশবিকতা তাঁদের পত্রপত্রিকায় যে ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা যেমন কুৎসিত তেমনি ভয়াবহ। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী স্পষ্টই প্রমাণ করেছে যে আমাদের সত্যিকার মুক্তি রয়েছে আমাদের আপন হাতে। অপরের কৃপণ হাতের তাচ্ছিল্যভরা মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে কোনো জাতির মাহাত্ম্যকে গড়ে তোলা যায় না। পরের দয়ার উপর নির্ভর করে জাতীয় সাধনার সুলভ সিদ্ধির সন্ধান অসম্ভব,—সেই সিদ্ধিকে আত্মত্যাগ, ক্ষতি ও দুঃখবরণের মধ্যে দিয়েই আমাদের লাভ করতে হবে।

ইংরেজ-সন্তান অ্যানড্রুজ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করলেন,—

সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীর পরমতম শত্রু, সাম্রাজ্যবাদ যীশুখৃষ্টের আদর্শের পরিপন্থী। যে হেতু আমি খৃষ্টান, সেই হেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আমার ধর্মবিশ্বাস। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা পেতেই হবে।

অ্যানড্রুজ আরো বললেন,—

কিন্তু কী করে ভারত স্বাধীনতা পাবে? পরের দয়া, দান আর দাক্ষিণ্যঘোষণার পথে স্বাধীনতা আসবে না। ভারতের মর্মস্থল থেকে এক বিপুল শক্তিকে উজ্জীবিত করতে হবে,—সেই শক্তিই ভারতকে তার আত্ম-উজ্জীবনে দীক্ষিত করবে।

ধর্মপ্রাণ অ্যানড্রুজ, ইংরেজ অ্যানড্রুজ। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন কোটি কোটি ভারতবাসীর মূক বঞ্চিত হৃদয়ের অনুৎসারিত দাবী,—

স্বাধীনতা পেতেই হবে।

কিন্তু কেমন করে স্বাধীনতা পাব? কে পথ দেখাবে? কে শোনাবে মন্ত্র? অনড় বন্দীপ্রাণের শৃঙ্খলমোচনের কে জোগাবে শক্তি?

সে মন্ত্রের নাম সত্যাগ্রহ। সেই শক্তির নাম অহিংসা। আত্ম-উজ্জীবনের মন্ত্রগুরু সত্যসন্ধ মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

অ্যানড্রুজ বলেছেন,—

ঐ আকাশের তারকাকুল যেমন সত্য, ঐ নিত্যস্থায়ী পর্বতমালা যেমন সত্য, তেমনি অবিনশ্বর চিরন্তন চিরনূতন সত্যের মূর্তপ্রকাশ মহাত্মা গান্ধী। গান্ধী খৃস্টপ্রেরণার চরম বিকাশ, খৃস্টোপম জীবনানুসরণের পরম প্রকাশ।

জুডিয়ার নির্মম বিচারক ক্রুসবিদ্ধ করেছিল যীশুখৃস্টকে। সেই খৃস্ট পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন জগতের পরিত্রাতা রূপে। জালিয়ানওয়ালা-বাগের রুক্ষ প্রান্তরে সেই খৃস্টকে আবার হত্যা করেছিলেন ডায়ার,—ভারতের পরিত্রাতা হবার জন্যে তিনি গান্ধীর রূপ পরিগ্রহ করে আবার এসেছিলেন।

গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী নেতা উইনস্‌টন চার্চিল তখন বৃটেনের সমর মন্ত্রী। তিনি স্বীকার না করে পারেননি যে জালিয়ানওয়ালাবাগ এক ভয়াবহ ঘটনা। তিনিই বৃটিশ পার্লামেণ্টে অমৃতসর সংক্রান্ত আলোচনা পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ডায়ারকে গুরু পাপে মৃদু দণ্ড দিয়ে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে ডায়ারের ধারণা ভ্রমাত্মক ছিল,— এইটুকু মাত্র অভিযোগ তাঁর সম্বন্ধে সরকারী ভাবে করা হয়েছিল,—ও অর্ধ পেনশনে তাঁকে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল। ডায়ারের অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য শেষ হয়েছিল।

তাই বলে জালিয়ানওয়ালাবাগকে কেউ ভোলেনি,—মুছে যায়নি তার স্মৃতি। জালিয়ানওয়ালাবাগ যদি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হোতো, —তাহলে হয়তো তা হোতো না। কিছু শোক—কিছু অশ্রু,—তারপর ধীরে ধীরে বিস্মৃতি। যে প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সারা ভারতের সাধারণ মানুষ যোগ দিয়েছিল,—একযোগে, এক প্রতিজ্ঞা নিয়ে,— জালিয়ানওয়ালাবাগ সেই আন্দোলনেরই এক রক্তাক্ত অধ্যায়। ভারতবর্ষের এমন কোনো শহর নেই এমন কোনো গ্রাম নেই,— যেখানে জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা ছড়িয়ে পড়েনি। এমন কোনো মানুষ নেই যে জালিয়ানওয়ালাবাগের যন্ত্রণাকে নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করে শিহরিত হয়নি।

সেই যন্ত্রণা-কাতর দৃষ্টি মেলে ভারতবাসী বৃটিশ জাতিকে দেখেছে। দেখেছে কী ভারতে কী বৃটেনে ডায়ারের কী সম্বর্ধনা! লজ্জা নেই, অনুশোচনা নেই, মানবতার সামান্যতম অভিব্যক্তি নেই। ডায়ারকে তারা সোনার সিংহাসনে বসিয়েছে,—ঘাতককে তারা দেবতা বলে পূজা করেছে।

বছর দুই পরে ভারত সরকারের নবগঠিত বিধান পরিষদ উদ্বোধন করতে ইংল্যাণ্ড থেকে সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে আসেন ডিউক অব কনট। তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন,—

অমৃতসরের দীর্ঘ ছায়ায় ভারতের সুন্দর মুখ মলিন হয়ে রয়েছে। এই পরিষদের সূচনাতেই এক সরকারী প্রস্তাবে পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর জন্যে গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল,—কয়েকজন অফিসারের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে ভারত শাসনের উদার নীতিবোধ কলঙ্কিত হয়েছে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল,—এমনি ঘটনা ভবিষ্যতে আর কখনো ঘটবে না।

কিন্তু এ শুধু কথার কথা। কথা দিয়ে অন্যায়ের ক্ষালন হয় না। কলঙ্কমোচন হয় না। কথা দিয়ে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না। জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে দেশবাসী শিক্ষা পেয়েছিল অন্য। শুধু কজন বৃটিশ অফিসার মানবতাবোধ হারিয়েছে তাই নয়,—পদানত জাতিকে শাসন করবার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে সমস্ত বৃটিশ জাতি।

তারা শ্বেতকায়, তারা প্রভু। যারা কৃষ্ণকায় তারা তাদের পদানত প্রজা। সেই প্রজা মানুষ নয়। তাদের আত্মা আত্মা নয়, তাদের প্রাণ প্রাণ নয়। অত্যাচারে তাদের দেহকে মাংসপিণ্ড করে পথে ছড়িয়ে দাও, অপমানে তাদের মাথাকে ধূলোয় লুটিয়ে দাও,—কিছু এসে যায় না। তাদের উপর যতো অমানুষিক বর্বরতা হোক, বর্ণবিদ্বেষী সামাজ্যবাদের যতো হিংসা বর্ষিত হোক,—তার জন্যে কোনো বেদনা নেই, কোনো ক্ষোভ নেই।

জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতবাসীকে এই শিক্ষা দিয়েছিল, যে এমনি অমানুষিক শাসকের হাত থেকে মুক্তি পেতেই হবে। সে মুক্তি শুধু ভারতবাসীর রাজনৈতিক মুক্তি নয়,—মানবতার নৈতিক মুক্তি।

কোন পথে সেই মুক্তি আসবে? কে হবে সেই মুক্তির দিশারী? গান্ধীজী বললেন,—

সমস্ত দেশবাসী যদি একদিন একযোগে শাসককে বলতে পারে, তোমাকে চাই না,—তাহলে কোথায় থাকবে শাসকের শাসন?

তোমার সঙ্গে আমার কোনো সহযোগ নেই, কোনো সম্পর্ক নেই,—তখন কেমন করে তুমি বজায় রাখবে তোমার শাসনের সম্পর্ক ? তোমাদের অস্ত্র আছে, সেই অস্ত্র তোমাদের শক্তি। আমাদের প্রতিজ্ঞা আছে,—সেই শক্তি মহত্তর। সুসংবদ্ধ হিংসার চেয়ে সুসংবদ্ধ অহিংসা বড়ো। তোমরা হিংসা দিয়ে ভয় দেখাবে,—অহিংসা দিয়ে সেই ভয়কে আমরা পরাস্ত করব।

ভয়কে জয় করবার মতো মানুষ ভারতবর্ষে ছিল বৈকি! নির্ভীকতায় তারা তুলনাহীন। শৃঙ্খলিতা দেশজননীর অবমাননায় আকুল হয়েছিল তাদের প্রাণ, উত্তাল হয়েছিল তাদের রক্ত। তারা সেই অবমাননার প্রতিশোধে উদ্দাম হয়েছিল। হিংসাকে তারা জয় করতে চেয়েছিল প্রতিহিংসার মন্ত্র দিয়ে। তারা কোনো বাধা মানেনি,—কোনো বিপদকে ডরায়নি। পরাধীন প্রজার তটস্থ সমাজ তাদের আশ্রয় দেয়নি,—তারা আশ্রয় নিয়েছিল অরণ্যে কান্তারে, হেঁটেছিল কণ্ঠকভরা দুর্গম পথে। জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে তারা এগিয়ে ছিল চরম উন্মাদনায়,—ফাঁসির মঞ্চে গেয়েছিল স্বাধীনতার জয় গান।

কিন্তু তারা মুষ্টিমেয়,—তারা সমস্ত জাতিকে নির্ভয়ের পথে অগ্রসর করতে পারেনি। তাদের বিপ্লববোধ গণতান্ত্রিক বিপ্লব চেতনার রূপ পায়নি।

গান্ধী ডেকেছিলেন সমস্ত জাতিকে। হিংসার গোপন অস্ত্র মুষ্টিমেয়ের হাতে,—অহিংসার প্রকাশ্য অস্ত্র প্রতিটি মানুষের অন্তরে। গান্ধীজী কোনো গোষ্ঠীকে ডাকেননি, কোনো দলকে ডাকেননি,—তিনি তাঁর ডাক পাঠিয়েছিলেন প্রতিটি মানুষের অন্তরে।

গান্ধীজী বলেছিলেন,—

কে বলে আমাদের অস্ত্র নেই, কে বলে আমাদের শক্তি নেই? প্রত্যেকে আমরা সশস্ত্র, প্রত্যেকে শক্তিমান। আমাদের অস্ত্র অহিংসা, আমাদের শক্তি অভয়। এই অভয়ের শক্তিতে আমরা অগ্রসর হব,—এই অহিংসার অস্ত্রে হিংসাকে আমরা জয় করব।

গান্ধীজী বলেছিলেন,—

বিপ্লব ছাড়া পরিবর্তন ঘটে না, বিপ্লব ছাড়া স্বাধীনতা আসে না। বিপ্লব ব্যষ্টির উন্মাদনা নয়,—সমষ্টির চেতনা। এই সমষ্টিকে অভয় মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে হবে, অহিংসা অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে, অসহযোগের অভিযানে আগুয়ান হতে হবে।

পরাধীন দেশ, পদানত জাতি, আশাহত সমাজ। সেই দেশকে স্বাধীন করতে হবে, সেই জাতিকে উন্নতশির করতে হবে, সেই সমাজকে কর্মের সত্যনির্ভয় পথে পরিচালিত করতে হবে।

গান্ধীজী দেখালেন বৈপ্লবিক পন্থা। এমনই পরমাশ্চর্য পন্থা,—যা কখনো কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রান্তরে আর্তনাদের ধ্বনি উঠেছিল। সেই ধ্বনি নিল এক নূতন বৈপ্লবিক সুর,—ছড়িয়ে গেল সারা ভারতের দিক দিগন্তে,—

গান্ধীজী কি জয়!

॥ ২১ ॥

জালিয়ানওয়ালাবাগ।

পরাধীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শহীদ-তীর্থ। আটাশ বছর অক্লান্ত সংগ্রামের পর যে পরাধীনতা ঘুচেছে। এই আটাশ বছর ধরে এই শহীদ-তীর্থ সারা পৃথিবীর কতো শান্তিব্রতী মানবতাপ্রেমী স্বাধীনতা-কামী মানুষকে আহ্বান করেছে। কতো লোক এসেছে এই জালিয়ানওয়ালাবাগে। কতো স্বদেশী, কতো বিদেশী, কতো ধনী, কতো দরিদ্র। পণ্ডিত এসেছে, সরল এসেছে, রাজনীতিক এসেছে, এসেছে দেশপ্রেমিক। নিপীড়িত মানবের রক্তপ্লুত এই মাটি স্পর্শ করে ধন্য হয়েছে।

শ্বেতকায় মানুষরা এখানে রেখে গিয়েছে অনুতাপ আর বেদনার অঞ্জলি। যারা কৃষ্ণকায় তারা এখান থেকে নিয়ে গিয়েছে আত্ম-উজ্জীবনের অঙ্গীকার। যারা স্বাধীন তারা এখানে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছে স্বাধীনতার মর্মার্থ,—যারা পরাধীন তারা লাভ করেছে নবীন চেতনা, পরম প্রত্যয়।

দিন কেটেছে, মাস কেটেছে, বৎসর কেটেছে। সেই জালিয়ান-ওয়ালাবাগ যেমন ছিল, তেমনি রয়েছে। সেই সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথ, সেই এবড়ো খেবড়ো তৃণহীন অনুর্বর জমি, একপাশে সেই সর্বনাশা কূপ। চারদিক ঘিরে সেই খাড়া খাড়া বাড়ির পিছনের দেয়ালের পাহারা। আর সেই দেয়ালে দেয়ালে বন্দুকের গুলির অসংখ্য ক্ষত-চিহ্ন।

কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগ,—এই নামটি দিনে দিনে অতিক্রম করেছে স্থান ও কালের সমস্ত পরিসীমা। জালিয়ানওয়ালাবাগ এক অমোঘ মন্ত্র,—বিশ্বপ্রাণের মণিকোঠার অমৃতধন, জালিয়ানওয়ালাবাগ এক অনির্বাণ জ্যোতি,—যে জ্যোতির প্রভায় সত্য, শান্তি ও বিশ্ব-মানবতার আদর্শ দীপ্যমান।

অমৃতসর কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল,—জালিয়ানওয়ালাবাগ জাতীয় স্মারকরূপে রক্ষিত হবে। এই কাজে অগ্রসর হলেন গান্ধীজী, মালব্যজী ও মতিলাল নেহরু। জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মারক কমিটির প্রথম সভাপতি গান্ধীজী। জালিয়ানওয়ালাবাগ ব্যক্তিগত সম্পত্তি,—তাকে জাতীয় সম্পত্তি করা প্রথম কাজ। জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতি-তহবিল খোলা হোলো,—দেশবাসীকে আহ্বান জানানো হোলো দানের জন্যে। সারা ভারতের সহস্র সহস্র লোক এই তহবিলে অর্থদান করতে লাগল। পাঁচলক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ব্যয়ে স্মারক কমিটি অচিরে এই বাগের সমস্ত জমি কিনে নিলেন। উত্তরদিকে প্রবেশপথের পাশেই একটি বাড়িতে বসল স্মারক কমিটির স্থানীয় দপ্তর।

তারপর পরাধীন ভারতে প্রতি বৎসর ১৩ই এপ্রিল তারিখে এই জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রান্তরে স্মারক-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা ভারতের জনপ্রতিনিধিরা এই সভায় যোগ দিয়েছেন। যোগ দিয়েছে সারা ভারতের জনতা। ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯-এর জানা-অজানা শহীদদের প্রতি স্মৃতি-তর্পণ করা হয়েছে প্রতি বৎসরের স্মৃতি-সভায়। প্রতিবৎসর ভারতবাসী এই পবিত্রভূমি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা নিয়ে গেছে স্বাধীনতার, শান্তির, অহিংসার। দশ বছর পরে অমৃতসরে আবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছে। সেই অধিবেশনে যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁরা সর্বপ্রথম জালিয়ানওয়ালাবাগে গিয়ে অমর শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এসেছেন।

আটাশ বছর ধরে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলেছে। সে সংগ্রামের ধারা কখনো তীব্র কখনো মন্থর,—নদীর স্রোতে যেমন কখনো জোয়ার কখনো ভাঁটা। স্রোতের অবশ্য ক্ষান্তি নেই,—শেষ লক্ষ্য সমুদ্র,—তেমনি জাতীয়তার স্রোতের ধ্রুব লক্ষ্য স্বাধীনতা। সারা ভারতের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রতিটি শপথের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগের নাম।

ভারতের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সংবেদনশীল কতো বিদেশী পরাধীন ভারতে এসেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কতো পর্যটক এসেছেন ভারতভ্রমণে, কতো পণ্ডিত ও ছাত্র এসেছেন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যয়নে। যুগ যুগ ধরে সারা পৃথিবীর বহু শিক্ষার্থী ভারতবর্ষে এসেছেন,—সাহিত্য, দর্শনে, শিল্পে ভারতের কাছ থেকে অনেক শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন।

আড়াই হাজার বছর আগে সভ্যতার আদিম প্রত্যূষে সারা বিশ্ব মানবতার মহান্ শিক্ষালাভ করেছিল বুদ্ধের বাণীতে। আর এ যুগে সভ্যতার অন্ধকার সঙ্কট-মুহূর্তে বিশ্ববাসীকে মানবতার পরম শিক্ষা দিয়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগ। জালিয়ানওয়ালাবাগের অফিসে একটি অর্ধছিন্ন খাতা আছে। সেই খাতার পাতায় পাতায় উল্লিখিত আছে মানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার শ্রদ্ধানম্র অসংখ্য স্বীকৃতি।

সেই খাতাটির আয়ু পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশি। ফুলস্ক্যাপ সাইজ,—পাতাগুলি লালচে হয়ে গিয়েছে,—শীতপত্রের মতো ভঙ্গুর। প্রথমদিকের কালির লেখাগুলি ম্লান হয়েছে, মুছে গিয়েছে অনেক স্বাক্ষর, অনেক বাক্য কষ্ট করে পাঠোদ্ধার করতে হয়। এই খাতাটি জালিয়ানওয়ালাবাগের ভিজিটরস্ বুক।

এই পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে পৃথিবীর ইতিহাসে আশা-হতাশাভরা অধ্যায়ের পর অধ্যায়! কতো যুদ্ধ, কতো হানাহানি, কতো হিংসা, কতো দুর্ভিক্ষ! কতো শোষণ আর অত্যাচার, কতো বিপ্লব আর প্রতি-বিপ্লব! এই পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বুদ্ধ আর গান্ধীর জন্মভূমি ভারতবর্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগে যতো মানবপ্রেমিক এসেছেন তাঁরা এই জীর্ণ ভিজিটরস্ বুকে রেখে গেছেন তাঁদের স্বাক্ষর। এই খাতাটি বিশ্বমানবতার এক অদ্বিতীয় দলিল।

পৃথিবীর পঞ্চমহাদেশ থেকে তীর্থযাত্রী এসেছেন জালিয়ান-ওয়ালাবাগে। এসেছেন ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে,

অষ্ট্রেলিয়ার ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, ইয়ুরোপ ও প্রাচ্যভূমির অধিকাংশ দেশ থেকে।

একজন হল্যাণ্ডবাসী মানবপ্রেমিক ১৯২৫ সালে এই ভিজিটরস্ বুকে লিখে গেছেন,—

এখানে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হয়েছিল তা যখন মনে করি তখন নিজেকে সুসভ্য ইয়ুরোপীয় বলে ভাবতে আমার লজ্জাবোধ হয়। মনে হয় এই যদি সভ্যতা হয়,—তাহলে অসভ্যতা অনেক বেশি গৌরবময়।

বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য এন্ এইচ রাদারফোর্ড ১৯২৬ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ দর্শনে এসেছিলেন। তাঁর লেখা,—

ইতিহাসের ভয়ালতম হত্যাকাণ্ড আমার দেশবাসীরা যেখানে করেছিল সেই স্থানটি আজ আমি দেখে গেলাম। আমার সমস্ত মন আতঙ্কে লজ্জায় ও ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে গেল। আমি জানি সাম্রাজ্যবাদের বিষময় ফল এই হত্যাকাণ্ড। আমি এও আশা করি এই সাম্রাজ্যবাদ ভারত থেকে অচিরে দূর হবে, ভারতে ভারতবাসীর প্রতি মঙ্গলময় ভারতীয়দের নিজের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৯৩০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লী ও জেসি মেরিওয়েদার জালিয়ানওয়ালাবাগে এসে মন্তব্য করে গেছেন,—

আমরা গভীর উৎসাহ নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু যখন ভাবলাম কী করুণ-ভয়াল ঘটনা এখানে ঘটেছিল তখন আমাদের মন গভীরতর বিষাদে ভরে গেল। মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিকতা সংখ্যাহীন মানুষের অশ্রুপাতের কারণ হয়। ঈশ্বর সেই দিন ত্বরিত করুন যেদিন মানুষে মানুষে ভাই-ভাই হবে,—ঘৃণায় তারা সরবে না, প্রেমে তারা কাছে আসবে।

ভারত-প্রেমিক ও গান্ধীভক্ত লিওনার্ড শীফের ১৯৩১ সালের উক্তি,—

অবর্ণনীয় আর্তি ও বেদনার সঙ্গে এই হত্যাক্ষেত্র আমি দেখে গেলাম। যেহেতু আমি ইংরেজ সেইজন্যে আমি এখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলাম,—তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন।

গান্ধীসেবিকা মুরিয়েল লেস্টার জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখতে প্রথমবার এসেছিলেন ১৯৩৬ সালে। ভিজিটরস্ বুকে তাঁর লেখা,—

হৃদয়হীন নৃশংসতার এই ভয়াল ক্ষেত্র স্বচক্ষে দেখে আমার সমস্ত অন্তর অনুশোচনায় ভরে গেল। আমি স্বীকার করছি এই মনোভাব শুধু আমার একলার নয়। অমৃতসর—এই নামটি শোনামাত্র আমার দেশে লক্ষ লক্ষ লোকের মন লজ্জায় ভরে যায়। এইখানে এসে আমার জাতির হয়ে নীরব প্রায়শ্চিত্ত আমি করে গেলাম।

তিন বছর পরে মুরিফেল লেস্টার আবার জালিয়ানওয়ালাবাগে আসেন। এবারও তিনি লেখেন,—

এ আমার প্রায়শ্চিত্তের তীর্থযাত্রা।

১৯৩৬ সালে মুরিয়েল লেস্টারের সঙ্গে আর একজন ইংরেজ সমাজ-সেবিকা এই তীর্থে আসেন। তাঁর নাম গ্ল্যাডিজ ওয়েন। তাঁর লেখা,—

অমৃতসর—এই নামটি যখনই আমি স্মরণ করি, আমার হৃদয় লজ্জা ও বেদনায় মুহ্যমান হয়। বৃটিশ বন্দুকের গুলিতে অসংখ্য নিরীহ ভারতবাসী যেখানে মরেছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইছি,—সেই সঙ্গে ভারতবাসীদের কাছেও নিবেদন করছি,—তাঁরা আমাদের ক্ষমা করুন।

আর এক অনুতপ্ত ইংরেজ এখানে এসেছিলেন ১৯৩৮ সালে। তাঁর নাম ডোনাল্ড কানিংহাম। সুতীক্ষ্ণ ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছেন,—

এখানে এসে আমার কেবলই মনে হচ্ছে রাস্তার প্রতিটি ভারতবাসী আমার শাদা চামড়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে নীরব ধিক্কারে মনে মনে বলছে,—ছাখো ছাখো, খুনীর জাতের ঐ একটা মানুষ

চলেছে। আমার একমাত্র আশা যে এই ভয়ংকর বলিদান ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদের বিনাশকে ত্বরান্বিত করবে।

ভারত থেকে সাম্রাজ্যবাদের রাহু অস্তমিত হবার বছর দেড়েক আগে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য রেজিন্যাল্ড সোরেনসেন জালিয়ানওয়ালাবাগে আসেন। তাঁর উক্তি উল্লেখযোগ্য,—

আমি তীর্থদর্শনের জন্যে এই শহীদ-ক্ষেত্রে এসেছি। আমি প্রার্থনা করি, যে বিক্ষোভ বেদনা ও আত্মদানের পথে ভারত এতোদিন অগ্রসর হয়েছে, অচিরে সেই পথের শেষ হবে। স্বাধীনতা উন্নতি ও সৌন্দর্যের শতদল প্রস্ফুটিত হতে আর দেরি নেই। আমার মনে হচ্ছে, দীর্ঘকাল ভারত যে দুঃসহ বেদনা সহ্য করেছে, সেই বেদনার পুণ্যতীর্থে আমি আজ এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে মানবভাগ্যে পাপ ও কুশ্রীতার থেকে পুণ্য ও সৌন্দর্য মহত্তর,—আমি বিশ্বাস করি বেদনার চরম অবসানে সৌম্য পরিপূর্ণতার আবাহন হবেই।

স্বাধীনতার পর ১৯৫৩ সালে ভারতে আসেন বৃটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা হ্যারি পলিট। তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ যেতে ভোলেননি ও সেখানে লিখে আসেন,—

এই স্মৃতিক্ষেত্র পরিদর্শন করতে এসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমার স্মরণ হচ্ছে ১৯১৯ সালে এপ্রিল মাসের কথা যখন অমৃতসরের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী জেনে কী আতঙ্ক ও ঘৃণা আমি মনের মধ্যে অনুভব করেছিলাম। সেইদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলিত সমস্ত ঔপনিবেশিক জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনে সাহায্য করাই হবে আমার জীবনের ব্রত।

সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণা, মানবতার প্রতি বিশ্বাস, অনুতাপ আর প্রায়শ্চিত্ত,—জালিয়ানওয়ালাবাগের অমূল্য ভিজিটরস্ বুকটির প্রতিটি

পাতায় পাতায়। খাতার পাতাগুলি এতো জীর্ণ হয়ে এসেছে যে তার মহার্ঘ মন্তব্য ও স্বাক্ষরগুলি আর বেশি দিন থাকবে না। স্মৃতির এক অমূল্য মণিসঞ্চয় হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে।

চল্লিশ বছরের অধিককাল ধরে এই পত্রগুচ্ছকে যিনি সযত্নে রক্ষা করে এসেছিলেন, তাঁর নাম ডাক্তার ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। ১৯১৯ সাল থেকে তিনি ছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ শহীদ-ক্ষেত্রের দ্বাররক্ষক। তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মারকসমিতির আদি সম্পাদক।

পৈত্রিক নিবাস হুগলী জেলার দশঘরা গ্রামে। প্রথম যৌবনেই প্রবাসী। এলাহাবাদে মতিলাল নেহরুর সংস্পর্শে আসেন। তারপর অন্যান্য জাতীয় নেতাদের। জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার সময়ে পাঞ্জাবে। জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মারকসমিতির প্রথম সভাপতি গান্ধীজী তাঁকে ডাকেন। সমিতির স্থানীয় সম্পাদকের দায়িত্বভার তাঁর উপর ন্যস্ত করেন।

এই চিরপ্রবাসী বাঙালী দেশপ্রেমিক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগ আঁকড়ে পড়েছিলেন। বাগের উত্তরদিকে দক্ষিণমুখী ছোট বাড়িটি। সামনে ছোট একটি বারান্দা, তারপর একটি অল্পপরিসর অফিসঘর। দোতলায় বাসস্থান। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের দ্বাররক্ষক হয়ে তিনি এখানে কাটিয়েছেন সারা জীবন। গান্ধীজীর পর স্মারকসমিতির সভাপতি হয়েছেন বল্লভভাই প্যাটেল। প্যাটেলের পর জহরলাল নেহেরু। ষষ্ঠীচরণ থেকেছেন তাঁর নীরব কর্তব্য নিয়ে। দর্শকদের আহ্বান করেছেন,—তাদের নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। আর সারাজীবন ধরে স্বপ্ন দেখেছেন স্বাধীনতার।

গান্ধীজীর আবেদনে করুণার ঘট পূর্ণ হয়েছিল,—লক্ষ লক্ষ টাকা জমা পড়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতি-তহবিলে। কিন্তু পরাধীনতার শেষ আটাশ বছরের মধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি কী ভাবে

সংরক্ষিত হবে তা স্থির করা যায়নি,—গৃহীত হয়নি কোনো চূড়ান্ত পরিকল্পনা। শহীদ-কূপের উপর একটি পাকা ছাদ নির্মিত হয়েছিল,—সেইটুক মাত্র।

আত্মজীবনীতে গান্ধীজী লিখছেন,—

অমৃতসর কংগ্রেসের পর দুটি কাজে আমি আগ্রহান্বিত হই। প্রথম কাজ,—জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মরণী। স্মৃতি-তহবিলের অন্যতম অছি আমি হই। ভিক্ষার্থীরাজ বলে পণ্ডিত মালব্যজীর খ্যাতি। সাধারণের কাজে তহবিল সংগ্রহে তিনি অদ্বিতীয়। এ কাজে আমিও খুব পিছনে পড়িনে,—দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে দেখেছিলাম এমনি অর্থসংগ্রহের কাজে আমিও কতো তৎপর। তবে মালব্যজী রাজা-মহারাজাদের কাছ থেকে যে আশ্চর্য মন্ত্রবলে রাজকীয় দান সংগ্রহ করতে পারতেন সে মন্ত্র অবশ্য আমার জানা নেই। তাছাড়া জালিয়ানওয়ালাবাগ বীভৎসতার স্মৃতিরক্ষার জন্যে দেশীয় রাজাদের কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না।···স্মারকসমিতির বেশ কিছু টাকা এখন ব্যাংকে জমা আছে। কিন্তু আজ দেশের সামনে সমস্যা যে মহান্ ভূমিতে হিন্দু-মুসলমান-শিখের দেহের রক্ত একসঙ্গে মিশেছিল,—সেই ভূমির উপযুক্ত স্মারক কী হবে। আজ দেখা যাচ্ছে এই তিনটি সম্প্রদায় প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। স্মৃতি-তহবিলের যোগ্য ব্যবহার কী ভাবে হবে তাও ঠিক করতে পারা যাচ্ছে না।

সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্যতম অবদান সাম্প্রদায়িকতা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের বুকে অতি সুকৌশলে এই সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছিল।

জাতীয়তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেশনের অস্ত্র বহু প্রকারের। শুধু বন্দুক আর মেশিনগান নয়, বে-আইনি আইন আর কারাশৃঙ্খল নয়। কুটিলতম অস্ত্র সাম্প্রদায়িকতা।

সেই সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র দিয়ে বিদেশী শাসক জাতীয় চেতনার

বুকে নির্মম প্রহার শুরু করল। ধর্মে ধর্মে ভেদ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ, হিন্দু-মুসলমানে হানাহানি। তখন জালিয়ানওয়ালাবাগের মানবতীর্থে স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের অধিকার কার ?

পরাধীন ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথও কোনো উৎসাহ দিলেন না। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি বৃটিশের দেওয়া সম্মান ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে জালিয়ান-ওয়ালাবাগে স্মারক-নির্মাণের সমর্থন তিনি করবেন কী করে ? তিনি বললেন,—

জালিয়ানওয়ালাবাগ আমাদের কাছে কোনো গৌরবস্মৃতি নয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ শক্তিহীন পরপদানত দুর্বল জাতির কলঙ্ক-চিহ্ন।

তাই জাতির সমস্ত পরাধীন যুগ ধরে জালিয়ানওয়ালাবাগ যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল।

সেই রক্তঝরা এবড়ো খেবড়ো তৃণহীন রুক্ষ প্রান্তর, গুলিবর্ষণের সেই উঁচু চাতাল,—দেয়ালে দেয়ালে সেই গুলির চিহ্ন।

সেই বিশীর্ণ কয়েকটি গাছ,—প্রতি বসন্তে যার শীর্ণ কাণ্ডে সবুজের ম্লান ইসারা জাগল,—যার শুষ্ক পাতাগুলি আবার ঝরে গেল শীতের প্রারম্ভে।

॥ ২২ ॥

ডায়ার আর ও-ডায়ার।

একই ছন্দের দুই নাম,—একই মারণযজ্ঞের দুই হোতা।

নাম দুটির মধ্যে এতো মিল,—যে কে ডায়ার আর কে ও-ডায়ার সাধারণত মনেই থাকে না। যেমন নাম,—চরিত্রও তেমনি একই রকম। চেহারায় না হলেও চরিত্রে যমজ,—যমজাত চরিত্র।

১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই তারিখে ডায়ার মারা গিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে কয়েক বছর তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তবে শয্যাতে শুয়েই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

ও-ডায়ারের ভাগ্য কিন্তু অন্য। ডায়ারের মৃত্যুর তেরো বছর পরে তাঁর অপঘাত মৃত্যু হয়েছিল। ১৯৪০ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে লণ্ডনের এক সভায় গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান। গুলি করেছিল উধম সিং নামে এক পাঞ্জাবী। এই গুলি জালিয়ানওয়ালাবাগের গুলিবর্ষণের শেষ প্রতিধ্বনি। ১৯১৯ সালে অমৃতসরবাসী উধম সিং-এর বয়েস ছিল ষোলো। জালিয়ানওয়ালাবাগকে সে ভোলেনি।

ডায়ার ও-ডায়ার কেউই আজ নেই। বৃটিশরাজও আর নেই। শাদা চামড়ার শাসকরা বিদায় হয়েছে ভারতবর্ষ থেকে। একদা জালিয়ানওয়ালাবাগের আর্তনাদ সারা পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। আজ ভারতের বাইরে জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা কজনই বা মনে রাখে? জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে বীভৎসতর অমানুষিকতা, হীনতর জাতিবৈরিতা, ব্যাপকতর নরহত্যা ঘটে গেছে লিডিচে, হিরোশিমায়, শার্পভিলে।

লর্ডস চেমসফোর্ড ভেবেছিলেন রাওলাট আইন দিয়ে অবনত ভারতের গণচেতনাকে তিনি রোধ করেছেন। ডায়ার ও-ডায়ার ভেবেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যালীলায় গণবিক্ষোভকে তাঁরা

চূর্ণ করেছেন। লর্ড মনটেগু ভেবেছিলেন তাঁর শাসন-সংস্কার দিয়ে তিনি পদানত প্রজার জর্জরিত হৃদয়ে প্রলেপ দিয়েছেন।

ব্যর্থ হয়েছিল তাঁদের আশা। রাওলাট আইনের চেয়ে কঠোরতর আইন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে ভারতবাসীর উপর প্রয়োগ করতে হয়েছিল। শাসকের অমানুষিক বর্বরতা জালিয়ানওয়ালাবাগের সংকীর্ণ পরিসীমা অতিক্রম করে সারা ভারতের কোণে কোণে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। শাসন-সংস্কারের উদারতর স্তোক দিয়ে প্রজাবিনোদনের অনেক চেষ্টা হয়েছিল পরবর্তী আটাশ বছর ধরে।

পরাধীন ভারতের এই আটাশ বছরের ইতিহাস স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।

স্বাধীনতা এল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট রাজধানীর প্রাসাদ থেকে নামল বিদেশী শাসকের পতাকা। উড়ল স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ নিশান। বন্দরে তরী ছিল। সেই তরীতে উঠল বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদীর সামরিক ও বেসামরিক শেষ প্রতিভূরা।

এতোদিন ধরে জালিয়ানওয়ালাবাগের শুষ্ক প্রাণ স্বপ্ন দেখছিল। এতো মানুষের এতো রক্ত একদিন যেখানে ঝরেছিল,—সে মাটি এখনো অনুর্বর তৃণহীন। দেয়ালে দেয়ালে এখনো সেই গুলির দাগ,—সেই পতিহারা রতন দেবী এখনো বেঁচে।

এই আটাশ বছর ধরে বছরের একটি দিন জালিয়ানওয়ালাবাগের সমস্ত ক্ষেত্র ভরে যায়,—সেই ১৯১৯এ একদিন যেমন ভরেছিল। ১৩ই এপ্রিল,—সেই একই দিন। প্রতি বছর এই ১৩ই এপ্রিল তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রান্তরে স্মৃতিসভা আহ্বান করা হয়। ডায়ারের গুলিতে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয় দেশবাসী।

মাঝে মাঝে দর্শকরা আসে,—স্বদেশী, বিদেশী। তারা কিছুক্ষণ দাঁড়ায়,—ঘুরে ঘুরে দেখে। সেই উঁচু চাতাল,—যেখান থেকে গুলি

বর্ষিত হয়েছিল, সেই ধূসর মাঠ যেখানে ঢলে পড়েছিল দু-হাজার নিরীহ মানুষের দেহ, সেই সর্বনাশা কূপ যার গহ্বর আর্ত মানুষের দেহে ভরে গিয়েছিল। সেই দেয়াল আর পাঁচিল,—যার গায়ে অসংখ্য গুলির ক্ষতচিহ্ন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের জমি ব্যক্তিগত মালিকের কাছ থেকে কিনে নেওয়া হয়েছিল,—কিন্তু তার বেশি কিছু হয়নি এতোদিন। গান্ধীজী পারেননি, রবীন্দ্রনাথও চাননি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নিষ্কলঙ্ক নয়। শুধু শৃঙ্খলমুক্তি আমরা চাইনি,—সেই সঙ্গে করেছি কতো হীন স্বার্থপূরণের কুটিল প্রয়াস। দল গড়েছি, ফন্দি এঁটেছি, ধর্ম নিয়ে হানাহানি করেছি। দীর্ঘতর হয়েছে পরাধীনতা,—ক্লিন্নতর হয়েছে পরাধীনতার বেদনা।

গান্ধীজী বলেছিলেন সারা দেশে যখন দল নিয়ে সম্প্রদায় নিয়ে ধর্ম নিয়ে এতো বিদ্বেষ এতো হিংস্রতা তখন জালিওয়ানওয়ালাবাগে মানবতার স্মৃতিক্ষেত্র রচনা করবে কে? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের যথেচ্ছ স্বৈরাচারের নিদর্শন, পরপদানত জাতির দুর্বলতা ও হীনতার কলঙ্ক-প্রতীক,—এখানে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের কী সার্থকতা?

এতোদিনে সময় হোলো, সার্থকতা এল। এতোদিনে ভারতবাসী স্বাধীন,—ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন মহারাষ্ট্র। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাবেদীকে স্বাধীনতার মর্মবেদীরূপে বরণ করবার অধিকার অর্জন করল ভারতবাসী। তারপর জালিয়ানওয়ালাবাগে আরো দুটি বিশেষ বার্ষিক দিবস উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে। ১৫ই আগস্ট,—স্বাধীনতা দিবস। আর ৩০শে জানুয়ারী,—শহীদ দিবস।

১৯৫১ সাল। স্বাধীন ভারতের পার্লামেণ্টে জনপ্রতিনিধিরা জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরুর প্রস্তাব অনুসারে জালিয়ানওয়ালাবাগ জাতীয়

স্মারক আইন পাশ হোলো। ১৯৫১ সালের ভারত পার্লামেণ্টের ২৫ সংখ্যক আইন।

প্রস্তাবিত হোলো যে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল যারা প্রাণোৎসর্গ করেছিল তাদের স্মৃতিকে অক্ষয় করবার জন্যে একটি জাতীয় স্মরণীর প্রতিষ্ঠা হবে। এই স্মরণীর প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থার জন্য এই আইন।

এই আইন অনুসারে এক নূতন অছি কমিটি গঠিত হোলো। অছি কমিটি নিলেন নিম্নলিখিত দায়িত্বভার,—

জালিওয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁরা বাগের জমিতে উপযুক্ত গৃহাদি নির্মাণ করবেন ও উদ্যান রচনা করবেন,

এই স্মৃতিরক্ষার কাজে তাঁরা জমি, গৃহ ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করবেন,

এই স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজনে তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করবেন,

এই স্মরণীর সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তাঁরা যথোপযুক্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন ও একটি ব্যবস্থাপক কমিটি নিয়োগ করবেন।

অছি কমিটির সদস্য নজন। তিনজন আজীবন সদস্য। আর তিনজন সদস্য পদাধিকার বলে,—যথা, জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি, পাঞ্জাবের গভর্ণর ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। আর তিনজন সদস্য মনোনীত। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের মনোনয়ন করবেন। পুনর্মনোনয়ন সাপেক্ষে তাঁরা পাঁচ বছর অছি পদে নিযুক্ত থাকবেন।

নবগঠিত অছি সমিতির তিনজন আজীবন সদস্য হলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও ডাক্তার সইফুদ্দিন কিচলু। সভাপতি প্রধানমন্ত্রী জহরলাল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ভূমি ও এতোদিনের সঞ্চিত সমস্ত স্মৃতি-তহবিল নূতন অছি কমিটির হাতে ন্যস্ত হোলো। তহবিলে যে টাকা সঞ্চিত ছিল তা কম নয়,—প্রায় চার লক্ষ। নূতন দানে এই তহবিল বৃহত্তর হতে লাগল।

তারপর আরম্ভ হোলো জালিয়ানাওয়ালাবাগে স্মরণী নির্মাণের কাজ। স্বাধীন ভারতের মহান্ আনন্দকর্ম। দেশী বিদেশী স্থাপত্যবিদরা এই কাজে নিয়োজিত হলেন। কাজ চলল দশ বছর ধরে। সমস্ত রুক্ষ মাটিকে কর্ষণ করে উর্বর করা হোলো,—সৃজিত হোলো এক অনুপম উদ্যান। বিস্তৃর্ণ সবুজ তৃণক্ষেত্র, যেন নরম ঘন কার্পেট। চারদিক ঘিরে গেরুয়া রঙের রাস্তা। মনোরম আলোক সজ্জা। সেই চাতাল যেখানে দাঁড়িয়ে সৈন্যরা গুলিবর্ষণ করেছিল,—তা গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে বাগের সমস্ত উত্তর দিক জুড়ে অর্ধবৃত্তাকার উদার বারান্দা। লাল পাথরের বারান্দা, লাল পাথরের বেদী, লাল পাথরের চওড়া সিঁড়ি। লাল পাথরের ফোয়ারা।

আর বাগের ঠিক মাঝখানে বিরাট এক লাল পাথরের স্তম্ভ। তার মাথা গিয়ে ছুঁয়েছে নীল আকাশ,—তার গায়ে শিখারূপী ভাস্কর্য-লেখ।

জালিয়ানওয়ালাবাগের দুঃখ-অপমান আর মৃত্যুর দাহ রূপান্তরিত হয়েছে স্বাধীনতার জ্যোতিতে। এই স্তম্ভ স্বাধীনতার জ্যোতিস্তম্ভ,—স্বতন্ত্রতা-কি-জ্যোতি।

শহীদ-কূপের উপরে একটি স্মৃতিমন্দির আগেই নির্মিত হয়েছিল। ইঁটের তৈরি,—শাদা চুণকাম করা। এতোদিন এরই সামনে বিভিন্ন সভা হোতো। ১৯১৩ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগের নবসৃজিত স্মৃতি-উদ্যানের উদ্বোধন হোলো। মহতীতম সভায় স্বতন্ত্রতা-কি-জ্যোতির পাদমূলে দাঁড়িয়ে এই স্মরণীর উদ্বোধন করলেন স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল। পৌরোহিত্য করলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

আর সেই লোকটি। গান্ধীজী যার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন পাহারা। ১৯১৯ থেকে এ পর্যন্ত যে জালিয়ানওয়ালাবাগকে আঁকড়ে পড়েছিল। সারা জীবন ধরে সেই শহীদক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে সে স্বপ্ন দেখেছিল,—একদিন স্বাধীনতা আসবে, এই জালিয়ানওয়ালাবাগ একদিন স্বাধীন ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হবে। জালিয়ানওয়ালা-

বাগ স্মারক সমিতির সেই প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ডাক্তার ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়।

সভা শেষ হয়েছে,—লক্ষ লোকের ভিড় এখনো সরেনি। আকাশ জয়ধ্বনিতে মুখর।

বয়স প্রায় নব্বই,—ক্ষীণ দেহ, দুর্বল ইন্দ্রিয়। এতোদিনে চরিতার্থ হয়েছে স্বপ্ন—সার্থক হয়েছে জীবন। জ্যোতিহীন চোখ তুলে তিনি ঐ আকাশের দিকে তাকালেন। প্রাণভরে দেখলেন স্বতন্ত্রতা-কি-জ্যোতি,—দিনান্তবেলার সূর্যরশ্মির আলোয় চকচক করছে তার চূড়া। সেই দীপ্ত জ্যোতির দিকে তাকিয়ে ষষ্ঠীচরণের দুচোখ জলে ভরে গেল।

নশ্বর মানুষের জীবন,—অবিনশ্বর জাতির সঞ্চয়।

ডায়ার নেই, ও-ডায়ার নেই, গান্ধীজী নেই, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রত্যক্ষ-সম্পর্কিত কোনো লোকই জীবিত নেই আজ।

কিন্তু ভারতের স্বতন্ত্রতা-কি-জ্যোতি আছে। থাকবে চিরদিন। স্বাধীনতার ও মানবতার পরম তীর্থরূপে জালিয়ানওয়ালাবাগ আছে। থাকবে চিরদিন।

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পাতায় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কাহিনী কয়েকটি মাত্র লাইন। স্বাধীন ভারত নূতন ইতিহাস গড়ে চলেছে,—পরাধীন ভারতের অনেক কাহিনীই অকিঞ্চিৎকর হয়ে আসছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের কাহিনীও ম্লান থেকে ম্লানতর হবে। আগামী যুগের ছাত্রদের এ কাহিনী না পড়লেও চলবে,—পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এ বিষয় থাকবে না।

কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগ থাকবে অক্ষয় জাতীয় তীর্থরূপে,—অনির্বাণ জাতীয় প্রতিজ্ঞারূপে থাকবে স্বতন্ত্রতা-কি-জ্যোতি। জাতির অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এই চিরজাগ্রত তীর্থের চির-উদ্ভাসিত প্রভায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

ইতিহাসের সেই ঘটনা থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে পূর্ব ভারতের এক তীর্থযাত্রী পথে বার হবে। বড়ো শুভ বৎসরে তার এই তীর্থপ্রয়াস। এ বৎসরে জাতির জনক গান্ধীজীর জন্মশতবার্ষিকী। সুউচ্চ তার সংকল্প। সেবাগ্রাম আর উরুলীকাঞ্চন দেখবে, দেখবে সাবরমতী আর রাজকোট। রাজধানীর ৩০শে জানুয়ারী শড়ক দিয়ে সে হাঁটবে,—পূজার্ঘ্য দেবে রাজঘাটে।

হয়তো কিছুই হবেনা, ব্যর্থ হবে তার অভীপ্সা। কম কথা নয়। বাংলা থেকে মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র থেকে গুজরাট, গুজরাট থেকে দিল্লী। সংকীর্ণ তার অবসর, স্বল্প তার পাথেয়। সাধ আছে অনেক,—কিন্তু সাধ্য নেই।

কিন্তু মনস্কামনা করে পথে যে বার হয়েছে, সে ভ্রষ্টকাম হয়ে ঘরে ফিরে আসে কেমন করে? তাই বেশি সে আর ভাববে না, বেশি করে কড়ির হিসেব করবে না। পূর্ব সীমান্তের সে লোক—সোজা পাড়ি দেবে পশ্চিম সীমান্ত অভিমুখে। সেখানেই আছে গান্ধীজয়ন্তীর সর্বতীর্থসার।

সেই অমৃতসর,—সেখানেই জালিয়ানওয়ালাবাগ।

স্টেশন থেকে নেমে সে শহরের মধ্যে ঢুকবে। সেই হল গেট যার সামনে প্রথম রক্ত ঝরেছিল। সেই পুরোনো নাম কিন্তু মুছে গেছে,—তার নাম এখন গান্ধী মহাদ্বার। দূরে গোবিন্দগড় কেল্লার চূড়া তার চোখে পড়বে,—সেই চূড়ায় স্বাধীন ভারতের পতাকা।

বড়ো রাস্তা দিয়ে সে এগোবে। দুপাশে তেমনি বড়ো বড়ো দোকান, ব্যাংক—তারপর স্কুল, পোস্ট অফিস, হাসপাতাল। কিন্তু কোনো শ্বেতকায় বিদেশী বসে নেই তাদের মালিক, পরিচালক বা কর্মকর্তা হয়ে। মিউনিসিপাল অফিস আর কোতোয়ালী,—পুলিস আর অফিসার সবাই স্বদেশের লোক।

এবার সে পুরোনো মহল্লার মধ্যে ঢুকবে। খুঁজবে পঞ্চাশ

বছর আগেকার বীভৎস স্মৃতিচিহ্নগুলি। বাঁকের মুখে এই তো বিরাট বাড়িটা। এই তো জমাদার-কি-হাবেলী। রাস্তা থেকে চাতালে সিঁড়ি উঠে গেছে। চওড়া উন্মুক্ত চাতাল। এই চাতালে বেত্রবেদী করা হয়েছিল। নিরপরাধ লোককে বেঁধে এনে এই চাতালে বেত মারা হোতো। ঐ সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ত তাদের রক্ত। ম্লান মূক মুখে বিনা প্রতিবাদে সেই নৃশংস দৃশ্য দেখত ভয়ার্ত অধিবাসীরা। ভাই-এর পিঠে সেই বেতের যন্ত্রণা নিজের পিঠে অনুভব করে নীরবে চোখের জল ফেলত।

কোনো চিহ্ন নেই সেই বীভৎসতার, সিঁড়ির ধাপে ধারে এখন কলরব-মুখর শিশুরা খেলা করছে। চাতালের যে কোণে বেত্রবেদীর খুঁটি পোঁতা হয়েছিল,—সেখানে রকমারি খেলনা সাজিয়ে বসেছে এক ফেরিওয়ালা।

পুরোনো মহল্লার গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সে চলতে থাকবে। পাশের লোককে ডেকে ডেকে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করবে বিশেষ একটি রাস্তার নাম। কোনো উদাসীন পথচারী তাকে দূর থেকে চিনিয়ে দেবে। সেই গলিটির মুখে এসে সে দাঁড়াবে।

সেই ঘৃণ্যতম হামাগুড়ি হুকুম,—মানবতাহীন পাশবিকতম অত্যাচার। সেই অত্যাচার যেখানে ঘটেছিল,—কড়েঁওয়ালা গলি। সেই সংকীর্ণ গলি, ছুধারে কাঁচা নালি, ছুপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি। এই গলির মাঝখানে ছ-জন নিরপরাধ তরুণকে এনে মিথ্যা অভিযোগে বেত মেরে আধমরা করা হয়েছিল। এ গলিতে যে পা দিয়েছে তাকে বুকে হেঁটে যেতে হয়েছিল। গলির শেষ মুখে একটি জলকূপ ছিল। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে গেলেও সেই কূপ থেকে কেউ জল আনতে পারেনি।

সেই কড়েঁওয়ালাগলির এপার থেকে ওপার পথিক পায়ে পায়ে হাঁটছে। কোনো নিদর্শন নেই,—চিহ্নমাত্র নেই পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই ভয়াল বীভৎসতার। পদচারীর ঠাসাঠাসি ভিড়,—তার মাঝে

আবার সাইকেল রিকসার হুড়োহুড়ি। সেই কূপটি আছে,—তাকে ঘিরে হাস্যমুখী জলার্থিনীদের ভিড়।

বেলা পড়ে আসছে,—দীর্ঘতর হয়ে আসছে ছায়া। এখনো আসল দেখা বাকি। তাড়াতাড়ি হাঁটবে সে সাঠেওয়ালা বাজারের অভিমুখে।

মোড়ের পানের দোকানদারকে সে জিজ্ঞাসা করবে,—

এই গলি ?

হাঁ ভাইসাব—এই গলি।

দুধারে দুই দোতলা বাড়ি। মাঝখানে হাত পাঁচেক চওড়া ফাঁক। দুধারে দেয়ালে নানা বিজ্ঞাপন। গলির ঠিক সামনে মাথার উপরে ছোট অর্ধবৃত্তাকার খিলান। সেই খিলানে আধমোছা হরফে লেখা—জালিয়ানওয়ালাবাগ। পাথর বাঁধানো গলিপথে কয়েক পা এগিয়ে ছোট একটি গেট। সেই গেট পার হয়ে গলি গিয়ে পৌছেছে জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রান্তরে। গলির ডানধারের বাড়ির খাড়া দেয়াল,—বাঁধারের দেয়াল ফুটিয়ে পাশের বাড়ির কটি দরজা-জানালা।

এই সংকীর্ণ গলির মধ্যে পাশাপাশি চারজন মানুষই হাঁটতে পারে না,—কোনো গাড়ি ঢোকা তো অসম্ভব। তাই ডায়ার বাগের মধ্যে তাঁর সাঁজোয়া গাড়ি ঢোকাতে পারেননি। পাশাপাশি দুজন দুজন ফাইল করে তাঁর সৈন্যরা বাগে ঢুকেছিল। ডায়ার এগিয়েছিলেন তাদের অগ্রবর্তী হয়ে। বাঁদিকেই উঁচু চাতাল। সেই চাতালে উঠে তাড়াতাড়ি সৈন্য সাজিয়েছিলেন তিনি। তারপর হুকুম দিয়েছিলেন,—

ফায়ার !

সেই সংকীর্ণ গলির মুখে সেই খোলা গেটের সামনে ক্ষণকাল দাঁড়াবে পথিক। সম্পূর্ণ হয়েছে তার যাত্রা,—অভিলষিত তীর্থের সম্মুখে সে পৌছেছে। পঞ্চাশ বছর আগেকার যে ঘটনার কাহিনী সে শুনে এসেছিল, সেই ঘটনার স্থানকে এবার সে প্রত্যক্ষ করবে। সেই পবিত্রভূমি,—হিন্দু মুসলমান শিখের রক্ত যেখানে একসঙ্গে মিশেছিল, সেই ভূমিকে সে স্পর্শ করবে। স্পর্শ করে ধন্য হবে।

পায়ে পায়ে সে এগিয়ে যাবে। গলি পার হয়ে দাঁড়াবে জালিয়ানওয়ালাবাগ ক্ষেত্রের মুখোমুখি।

এক লহমায় সামনের দৃশ্য দেখে সে অবাক হয়ে যাবে। কে বলে জালিয়ানওয়ালাবাগ দুঃখের স্মারক, বেদনার স্মৃতিভূমি? এতো সৌন্দর্য, এতো মাধুর্য, এতো আনন্দ! এতো ফুল, এতো রঙ, এতো হাসি!

তুলনাহীন স্থাপত্য। সুকুমারী লতা যেমন সমর্থ কাণ্ডকে মধুর আশ্লেষে জড়িয়ে থাকে তেমনি স্থাপত্যের উদার ললিত ছন্দরেখাকে জড়িয়ে আছে কোমল-হরিৎ উদ্ভিদরাজি। কতো তরুলতা,—কুসুম-সুষমার কী বিচিত্র সম্ভার! সারা বাগিচা আলোয় আলো হয়ে আছে ফুলে ফুলে। শত শত ফুলের টবই শুধু,—বাগিচার প্রবেশক্ষেত্রে আর নানা শোভন অংশে থরে থরে সাজানো। মৌসুমী ফুল সব,—কতো তাদের রূপ, কতো তাদের রঙ, কতো বিচিত্র তাদের নাম। শুধু ফুলের দিকে চেয়ে চেয়ে মাতাল হয়ে যায় মন।

বিরাট দুটি ফোয়ারা। তার বিশাল বৃত্তের অসংখ্য মুখ দিয়ে তীব্র জলধারা নির্গত হয়ে নীল আকাশের গায়ে রৌপ্যজাল রচনা করছে।

নিঃসঙ্গ পথিক অবাক হয়ে ভাববে সে যেন এক উৎসবক্ষেত্রে এসেছে। সভা নয়, সম্মেলন নয়,—তবু ভিড়ের শেষ নেই। কতো বৃদ্ধ আর শিশু, কতো তরুণ আর তরুণী। বৃদ্ধেরা বেড়াচ্ছে, শিশুরা ছুটোছুটি করে খেলছে, ঘাসের উপর মুখোমুখি হয়ে গল্প করছে তরুণ-তরুণী। ফুলে ভরা শাখায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে এক সুমুখী সুন্দরী,—ক্যামেরা হাতে সামনে দাঁড়িয়ে তার নানা ভঙ্গীর ফোটো তুলছে একটি সুদর্শন যুবক। একটি বিদেশী ভ্রমণকারী দল এসেছে,—তারা নোট বই হাতে নিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখছে। আর এতো আনন্দ-কোলাহলের অদূরে এক নিভৃত ছায়ায় মুখোমুখি বসে আছে এক প্রেমিক-প্রেমিকা। হাতে হাত চোখে চোখ রেখে

জগৎ-সংসার তারা ভুলে গেছে,—এই কাননে বসে স্বর্গকাননের স্বপ্ন বুঝি তারা দেখছে।

এই জালিয়ানওয়ালাবাগ। অপরূপ মায়াকানন। পঞ্চাশ বছর আগেকার স্মৃতিচিহ্নগুলি ম্লান। বাগের মুখে কয়েকটি সাইনবোর্ড,—তাতে লাল অক্ষরে সেই বীভৎস ঘটনার সংক্ষিপ্ততম বিবরণ। নয়নাভিরাম স্মৃতি-মন্দিরের অন্তঃপুরে সেই শহীদ-কূপ। দেয়ালে কয়েকটি গুলির দাগ। আরো আছে। বাগের ঠিক মাঝখানে। সেই আকাশ-ছোঁয়া স্বতন্ত্রতা-কি-জ্যোতি। সেই জ্যোতিস্তম্ভকে ঘিরে এতো সৌন্দর্যসজ্জা,—এতো স্বাধীন আনন্দিত মানুষের জটলা।

দিন শেষ হয়ে আসছে। সূর্য হেলেছে পশ্চিম দিকে। জ্যোতি-স্তম্ভের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে শ্যামল উদ্যানে। স্তম্ভের নিচে সেই ছায়ায় সে স্তব্ধ হয়ে বসবে। একলা পথিক একমনে ভাববে। দিনান্তের আসন্ন ছায়ার মতো তার মনে ঘনিয়ে আসবে বিষাদের ধূসরতা। কেমন এক বিভ্রান্তিতে দুলবে তার হৃদয়।

এ কী হোলো? জাতির জনক গান্ধীজীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দু-হাজার মাইল অতিক্রম করে জাতির শ্রেষ্ঠ শহীদ-তীর্থে সে এসেছে। কোথায় সে শহীদ-তীর্থ? কোথায় সেই শোকস্তব্ধ শ্মশান?

এখানে শোক নেই, বেদনা নেই, স্মৃতি নেই। শুধু উজ্জ্বলতা, শুধু নবীনতা, শুধু কোলাহল! এতো লোক তো এখানে এসেছে! এসে সুখে তারা মত্ত! ১৯১৯-এর ১৩ই এপ্রিল সেই যে দুহাজার মানুষ এখানে হতাহত হয়েছিল,—এক মুহূর্তের জন্যেও কে তাদের স্মরণ করছে!

হতাশ পথিক ঐ জ্যোতিস্তম্ভের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকবে। একে একে সবাই চলে যাবে। ফুলগুলি চোখ বন্ধ করবে। ছায়াবিলীন অন্ধকারে তাব চোখের সামনে ভাসবে ধূসররেখ স্বতন্ত্রতা-কি-জ্যোতি। তখন এক গোপন গভীর রহস্যবাণী তার প্রাণে বাজবে।

আরো আটাশ বছরের সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের মহানায়ক

গান্ধীজী। তিনি আমাদের ব্রাত্য হৃদয়ে দিয়েছেন সত্যাগ্রহের মন্ত্র, নিরস্ত্র ক্ষীণ হাতে তুলে দিয়েছেন অহিংসার অমোঘ প্রহরণ। হিন্দু-অহিন্দু, ছুৎ-অচ্ছুৎ, ধনী-দরিদ্র, সমস্ত ভারতবাসীর প্রাণে তিনি করেছেন স্বাধীনতার সঞ্চার। বিভ্রান্ত বিফল দুর্বল জনতাকে তিনি এক বলিষ্ঠ স্বতন্ত্র মহাজাতিতে রূপান্তরিত করেছেন।

সেই নবীন স্বতন্ত্র মহাজাতির আকাশচুম্বী প্রতিজ্ঞা স্বতন্ত্রতা-কি-জ্যোতি। জালিয়ানওয়ালাবাগ শুধু মৃত্যুর স্মারক নয়, বিফলতার আর্তনাদ নয়,—জালিয়ানওয়ালাবাগ সিদ্ধির অঙ্গীকার, নবজীবনের আনন্দগান। জালিয়ানওয়ালাবাগ শুধু পরাধীন ভারতের শহীদদের স্মরণ করবে না,—আহবান করবে স্বাধীন জাতির উত্তরপুরুষকে।

ইতিহাসের আদিকাল থেকে ঐ উত্তর-পশ্চিম থেকে বারে বারে হানা দিয়েছে নিষ্ঠুর বিদেশী বিধর্মী অভিযাত্রী। বারে বারে ভারতের আলো তারা নিবিয়ে দিয়েছে। সেই সীমান্তে আজ কঠিন উত্তুঙ্গ পাহারা—জালিয়ানওয়ালাবাগের স্বতন্ত্রতা-কি-জ্যোতি। তাকে ঘিরে অর্ধশতাব্দী আগেকার সেই অমর শহীদদের আত্মা।

এই অন্ধকারে তাদের কথা শোনা যাচ্ছে। তারা বলছে,—

একদিন রক্তরাঙা ইন্ধন দিয়ে ঐ জ্যোতিকে আমরা জ্বেলেছিলাম। তোমরা স্বাধীন, তোমরা আনন্দিত, তোমরা আমাদের নিহিত বাসনার প্রতিভূ।

মনে রেখো,—আহ্বান যদি আসে, আমাদের মতো তোমরাও দেবে,—রক্ত দেবে, প্রাণ দেবে, সব দেবে।

ক্ষণেকের জন্যে যেন না নেবে, বারেকও যেন না ম্লান হয়—স্বতন্ত্রতা-কি-জ্যোতি।